প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬৭

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩।
মুদ্রাকর : হরিপদ পাত্র, সত্যনারায়ণ প্রেস
১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলিকাতা ৭০০০০৬।

প্রস্তাবনা : ১

পারফর্মিং আর্ট বা প্রয়োগশিল্পের পঙ্‌ক্তিতে আবৃত্তি মর্যাদার আসন পেয়েছে ; আবৃত্তিহীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইদানীং বড় একটা চোখেই পড়ে না। উপরন্তু, আবৃত্তি পেশাদারী শিল্পের স্বীকৃতিও অর্জন করেছে। প্রথম সারির খ্যাতিমান আবৃত্তিকারেরা ভদ্রস্থ সম্মানদক্ষিণার বিনিময়ে প্রায়ই সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে থাকেন। পেশাদার সংগীতশিল্পীর গান বা বাজনাই যেমন একমাত্র জীবিকা, আবৃত্তি এখনো পর্যন্ত সেরকম হয়ে উঠতে পারেনি বটে তবে সেদিন খুব বেশি দূরেও নয়। অথচ, আমাদের কালে, আমার শৈশব বা কৈশোরে তো নয়ই, এমন কী প্রথম যৌবনেও, একালের মতো আবৃত্তির এত বিপুল সমাদর ছিল না। তখন বৎসরান্তে একবার স্কুলের পারিতোষিক বিতরণী অনুষ্ঠানে কিংবা কলেজের পুনর্মিলন উৎসবে আবৃত্তির জন্য দু'একজনের ডাক পড়তো। অভিভাবকের সেরকম দাপট থাকলে পাড়ার ক্লাবের রবীন্দ্র-নজরুল জন্মোৎসবে আবৃত্তির বাড়তি সুযোগ অযাচিতভাবেই জুটে যেতো। সুকান্ত ভট্টাচার্য তখনও কবিখ্যাতি পাননি। তাই ঐসব অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গুটিকয়েক কবিতাই ঘুরে ফিরে নানান জনের কণ্ঠ বদল করতো। বাস, ঐ পর্যন্তই! এইভাবেই নিভৃতচারিতায় আবৃত্তির দিন বয়ে যাচ্ছিল।

তারপর একালে আবৃত্তিকে ঘিরে অকস্মাৎ উদ্দামতার জোয়ার এলো ; আর এই উদ্দামতার কেন্দ্রবিন্দুতে যাঁর অধিষ্ঠান তিনি হলেন কাজী সব্যসাচী। অনস্বীকার্য যে, সাধারণ মানুষের কাছে আবৃত্তিকে হৃদয়গ্রাহী ক'রে তোলার কৃতিত্বের সিংহভাগের দাবিদার কাজী সব্যসাচী এবং আবৃত্তি যে আজ পুরোপুরি পেশাদারী শিল্প হয়ে উঠেছে তারও পথপ্রদর্শক তিনিই। আগে আবৃত্তি ছিল নিতান্ত শৌখীন বা আধা-শৌখীন সংস্কৃতিচর্চা। বস্তুতপক্ষে, ১৯৬০ সালে আকাশবাণীর ঘোষকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সব্যসাচী যদি আবৃত্তিকে জীবিকার সঙ্গে একসূত্রে গেঁথে না নিতেন তাহলে পেশাদারী প্রয়োগশিল্প হিসেবে আবৃত্তির বাড়বাড়ন্তের এই শুভদিন আসতে আরো কত-যে বিলম্ব হতো তা কে জানে! দীর্ঘ ঋজু বলিষ্ঠ চেহারায় প্রবল ব্যক্তিত্ব, মঞ্চাবতরণে জড়তাহীন স্বাচ্ছন্দ, সাবলীল পরিবেশনশৈলী, উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর, আকাশবাণীর ঘোষক হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তা এবং বিদ্রোহী-

কবি কাজী নজরুল ইসলামের পুত্রপরিচয়—এই সব কিছু মিলিয়ে সব্যসাচীর যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল তাতে তিনি অনায়াসেই শ্রোতৃচিত্ত জয় করতে পেরেছিলেন এবং অচিরেই আবৃত্তিকার হিসেবে একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা ও রাজাজোড়া খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। কাজী সব্যসাচীর তড়িৎসাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে হুবহু তাঁরই অনুকারী কয়েকজন তরুণ আবৃত্তির আসরে নেমে পড়লেন, তাঁদের ঘিরে ভক্ত ও অনুরাগীর সংখ্যাও দেখতে দেখতে স্ফীত হয়ে উঠলো। আবৃত্তিচর্চার কয়েকটি সংগঠনও এখানে-ওখানে গড়ে উঠল। কোনোটি-বা আজও টিকে আছে, কোনোটি-বা একাধিক সংগঠনের জন্ম দিয়ে অকালমৃত হয়েছে। বোধ হয়, হাওড়ার 'ছন্দনীড়' আবৃত্তিচর্চার প্রাচীনতম সংগঠন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আজও ওঁরা পরিশ্রমী, ওঁদের আবৃত্তিপত্রিকাটি আজও প্রকাশমান। শুধু কলকাতাতেই নয়, মফস্বল শহরে এমনকি গ্রামে গঞ্জেও আজকাল আবৃত্তির পূর্ণাঙ্গ আসর বসছে, শ্রোতারাও প্রবেশদক্ষিণা দিয়ে এইসব আসরে গিয়ে দু'তিন ঘণ্টা ধরে আবৃত্তি শুনছেন। এসবই নিঃসন্দেহে অতীব সুলক্ষণ। কিন্তু কিছু দুর্লক্ষণও কালক্রমে প্রকট হয়ে পড়লো, কিছু আবিলতাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। প্রয়োগশিল্প হিসেবে আবৃত্তির শক্ত বনিয়াদ গড়ে উঠতে না-উঠতেই প্রকৃত আবৃত্তিকারের সংজ্ঞা ও কুলশীলগোত্র নির্ধারণের ভেদবুদ্ধিতে কেউ কেউ আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। পূর্বসূরীদের অবদানের যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও মর্যাদা না দিয়ে কাজী সব্যসাচীকেই আদি আবৃত্তিকার হিসেবে চিহ্নিত ক'রে তাঁকে সামনে রেখে আত্মগরিমা প্রচারে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একথা ঠিক যে, সাধারণ শ্রোতার কাছে আবৃত্তিকে প্রেয় ক'রে তোলায় কাজী সব্যসাচীর ভূমিকা অতুলনীয়, কিন্তু আবৃত্তির শৈল্পিক উদ্ভাবণ ও উত্তরণের ইতিহাস তাঁকে পেছনে ফেলে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত।

গানের অনুষঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং কবিতার অবয়ব ও বিষয়বস্তুর অন্বয়ী আবেগ-অভিব্যক্তিতে সমৃদ্ধ আবৃত্তির স্বতন্ত্র রীতির সূচনা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্রমপ্রসারের যুগে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত শুধু যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ, প্রহসন এবং চতুর্দশপদী কবিতা ও সেই সঙ্গে 'চতুর্দশপদী' নামটিই আমাদের প্রথম উপহার দিয়েছিলেন তাই নয়, আবৃত্তিযোগ্য কবিতা ও আবৃত্তির আধুনিক রীতির আদি রূপটির সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনিই। কাব্যরচনায় মধুসূদনের আবৃত্তিনির্ভরতা সুবিদিত। পর্যায়ক্রমে একাধিক কাব্যাংশ ও নাট্যাংশ তিনি অনর্গল আবৃত্তি করে যেতেন লিপিকর পণ্ডিতেরা শুনে শুনে লিখে নিতেন। কোনো শব্দের ধ্বনিঝংকার যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রুতিসুখকর মনে না

হতো ততক্ষণ ক্রমাগত তিনি শব্দ বদল করতেন। আবৃত্তিই ছিল তাঁর কাব্যসৃষ্টির বাহন। আবৃত্তি-অনুরাগী কবি মধুসূদনের পরিচয় মিলবে তাঁর চিঠিপত্রে। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রকাশিত হওয়ার পর রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন, 'Let your friends guide their voices by the pause (as in English Blank verse)···My advice is Read, Read, Read. Teach your ears the new tune···' ঐ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন, 'The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank verse sounds like English Prose—retaining at the same time a sweet musical impression ..' 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'র পরে পরেই লিখলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'। আবৃত্তিযোগ্যতা ও সুখ-শ্রাব্যতাকেই যে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন তার প্রমাণ মিলবে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা আর একখানি পত্রে। তিনি লিখেছেন, 'The name is "বরুণানী", but I have turned out one syllable. To my ears this word is not half so musical as বারুণী, and I don't know why I should bother myself about Sanskrit rules.' আর একটি পত্রে তাঁকে লিখেছেন, 'Some days ago I had occasion to go to the Chinabazar. I saw a man seated in a shop and deeply poring over Meghanad. I stepped in and asked him what he was reading. He said in very good English, "I am reading a new poem, Sir!" "A poem" I said "I thought there was no poetry in your language." He replied "why, sir, here is poetry that would make any nation proud." I said, "well, read and let me know."···He read out···How beautifully the young fellow read···I took the Poem from him and read out a few passages to the infinite astonishment of my new friend···"

ড. অরুণকুমার বসুর প্রবন্ধটি এ বিষয়ে নানা তথ্যে সমৃদ্ধ। তাঁর প্রবন্ধ পড়বার সময়ে অসতর্ক পাঠকের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা যেন প্রশ্রয় না পায় যে, মধুসূদন হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন। মধুসূদন যে সময়ে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন, ডিরোজিওকে তার আগেই ঐ কলেজ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। মধুসূদন হিন্দু কলেজে পেয়েছিলেন কাপ্তেন রিচার্ডসনের সাক্ষাৎসান্নিধ্য। তবে হিন্দু

কলেজের ছাত্রমহল ডিরোজিওর প্রভাব তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

মধুসূদন দত্তের পরে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পরিপ্লুত করে এল রবীন্দ্রনাথের কাল। রবীন্দ্রনাথের কবিতাসৃষ্টিও যে আবৃত্তিনির্ভর সেকথা তিনি নিজেই জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি কিন্তু কবিতা রচনার সময় আবৃত্তি করতে করতেই লিখি; এমন কি কোনো গদ্য রচনাও যখন ভালো করে লিখব মনে করি তখন গদ্য লিখতে লিখতেও আবৃত্তি করি। কারণ রচনার ধ্বনিসংগতি ঠিক হল কিনা তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে কান।'

মধুসূদন কেমন আবৃত্তি করতেন তা জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তাঁর কবিতা-আবৃত্তির কয়েকখানি রেকর্ডের উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি। তখন রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ, রেকর্ডিং যন্ত্রের শৈশব তখনও অনতিক্রান্ত; বয়সের ভারে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ নিস্তেজ, অবং যন্ত্র সেই ক্ষীণ কণ্ঠেরও সবটুকু প্রতিদায় করতে তখনও অপারগ। তাই রেকর্ডে আমরা রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তিকে বা আবৃত্তিকার রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণরূপে পাই না। তা হোক, তবুও যা পাই তাই ঢের। পরিশীলিত উচ্চারণ, স্বরগ্রামের স্বচ্ছন্দ আরোহন-অবরোহন, সংযত আবেগ, আত্মগত ভঙ্গি এবং বোধসমৃদ্ধ পরিবেশনায় সাজিয়ে রবীন্দ্রনাথই যে প্রথম আবৃত্তিকে শিল্পগুণান্বিত করে তোলেন তাঁর রেকর্ডগুলি তারই প্রামাণিক সাক্ষ্য-বাহক। তাছাড়া, গ্রামোফোন রেকর্ডে আবৃত্তির ব্যবসায়িক প্রচার—তারও তো শুরু রবীন্দ্রনাথ থেকেই। কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে তাঁর কবিতা আবৃত্তির একটিমাত্র রেকর্ডই পাওয়া গেছে। বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে তাঁর যে তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠের আবৃত্তির স্মৃতি শুনি, ঐ রেকর্ডে তার হদিশ মেলে না।

রবীন্দ্রনাথের কালেই কবি নন এমন কেউ কেউ আবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এঁরা সকলেই তখনকার কালের মঞ্চাভিনেতা। এঁদের মধ্যে আছেন শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ীর মতো দিকপাল অভিনেতা। স্বর-প্রক্ষেপণে অধিবিত্ত, প্রস্বর-ছন্দ-যতি প্রকরণের ব্যবহারিক প্রয়োগে কুশলী এবং অর্থবহ অভিব্যক্তিতে নিপুণ এই সব অভিনেতা সেকালে মাঝেসাঝে জনসমক্ষে কবিতা আবৃত্তি করতেন, তাতে তাঁরা নিজেরা যেমন শিল্পনির্মিতির আনন্দ পেতেন তেমনি প্রয়োগশিল্পের এই নতুন উপকরণটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে কৌতূহল ও আগ্রহ জাগিয়ে তুলতেন। এঁদের সমকালে না হলেও অনতিকাল পরেই আবৃত্তির আসরে পেয়েছি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে। মঞ্চাভিনেতা না হলেও তিনিও অভিনেতা, বেতার-অভিনেতা। আবৃত্তির শিল্পকাঠামোকে সমৃদ্ধ করে তোলার কোনো সচেতন প্রয়াস এঁদের মধ্যে একমাত্র শিশির ভাদুড়ী ছাড়া

আর কারো ছিল বলে মনে হয় না। আবৃত্তি করতে ভালোলাগতো তাই অবরে সবরে আবৃত্তি করতেন, এই আর কী। এর বেশি কিছু নয়।

এঁদের পরে শম্ভু মিত্রই প্রথম উপলব্ধি করলেন গণসংযোগের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে আবৃত্তির উপযোগিতা। রাজনৈতিক পরিসরে তাকে কাজেও লাগালেন। একটা সময়ে একাদিক্রমে বহু বছর তিনি শহরে-গ্রামে গঞ্জে মাঠে-ময়দানে গণনাট্য আন্দোলনের সামিয়ানায় মার্ক্সবাদী রাজনীতির মঞ্চে কবিতা আবৃত্তি করেছেন অক্লান্তভাবে। তারপর বেশ কিছুকাল আনুষ্ঠানিক আবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন নি, নাট্যচর্চায় পুরোপুরি নিয়োজিত থেকেছেন। পরে নাট্য-নির্দেশনা ও অভিনয়েও ক্ষান্তি দিয়েছেন, সেও হলো কতো কাল। ফলে আমাদের উত্তরকালের প্রজন্মের তরুণতরুণীদের পক্ষে শম্ভু মিত্রকে তাঁর সৃষ্টিকর্মের মাঝখানে স্বরাট হিসেবে দেখা সম্ভব হয়নি। তাঁদের কাছে শম্ভু মিত্র শুধুই এক বিশাল ব্যক্তিত্ব, মোটা হরফের একটি নাম মাত্র। সে বোধহয় ইংরেজী উনপঞ্চাশ কী পঞ্চাশ সালের কথা। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সংশ্রবে আসার পর, একদিন এক অনুষ্ঠানে সেই প্রথম শম্ভু মিত্রের আবৃত্তি শুনলাম, শুনে চমকে উঠলাম। সে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি আর অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতার উত্তেজনা নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলাম। তার আগেও কারো কারো আবৃত্তি শুনেছি, তবে বিশেষভাবে নাম উল্লেখ করতে চাই কবি আবুল কাশেম রহিমুদ্দিনের। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন আমার কালে আবৃত্তিকার হয়ে ওঠার স্বপ্নবিলাসের প্রেরণাদাতা। তিনিও শম্ভু মিত্রের কাছাকাছি সময়েই আবৃত্তি শুরু করেছিলেন। কাজী সব্যসাচীর আবির্ভাব তার অনেক পরে, এমনকি আমি যে সময়ে আবৃত্তির আসরে আনাগোনা শুরু করেছি তারও অনেক পরে। আবুল কাশেম রহিমুদ্দিন ছিলেন পাড়ায়-পাড়ায় অলিতে-গলিতে ছোটো-খাটো যেকোনো অনুষ্ঠানে দীন-হীন সম্মানদাক্ষিণ্যর বিনিময়ে সহজলভ্য আধা-শৌখীন আধা-পেশাদার আবৃত্তিকার। তাঁর উচ্চারণ ছিল আঞ্চলিকতাদুষ্ট, তথাপি তাঁর আবৃত্তি শুনতে খুব ভালো লাগতো। ভালো লাগতো তার কারণ তাঁর অভিব্যক্তিতে ছিল সেই কাঙ্ক্ষিত আবেগ যা শ্রোতার অন্তর স্পর্শ করে। আবৃত্তিঅনুরাগী ছেলেমেয়েদের তালিম দেওয়ার কাজও তিনিই প্রথম শুরু করেছিলেন। জানি না এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন। শম্ভু মিত্রের পরে আবৃত্তির আসরে এলেন সবিতাব্রত দত্ত, অল্প দিন পরেই চলে গেলেন গানের আসরে। অবশ্য এখনো সংগীত পরিবেশনের শেষে শ্রোতাদের অনুরোধে কখনো-সখনো দু'একটা কবিতা আবৃত্তি করেন, তবে সে সবই তাঁর পুরোনো পুঁজি থেকে। অধ্যাপক সুবন্ধু ভট্টাচার্যের মুখে শুনেছি,

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজে তাঁর সহপাঠীদের নিয়ে আবৃত্তিচর্চার একটি দল গড়েছিলেন। সমবেত কণ্ঠে আবৃত্তির ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। নানা অনুষ্ঠানে তাঁরা দল বেঁধে আবৃত্তি পরিবেশনও করতেন। তাঁর সে দল 'খসড়া সংস্কৃতি পরিষদ' দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবে তিনি নিজে তাঁর জীবদ্দশায় যখন যেমন সময় সুযোগ পেয়েছেন আবৃত্তির অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। আরও কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রীকে নানান উপলক্ষে কলকাতার সাংস্কৃতিক মঞ্চে কিংবা কলকাতা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে কোনো-না-কোনো সময়ে আবৃত্তি করতে দেখেছি বা শুনেছি। এঁদের মধ্যে অরুন্ধতী গুপ্তা, বনানী চৌধুরী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, তৃপ্তি মিত্র, বিকাশ রায়, নির্মলকুমার, উৎপল দত্ত, শমিতা বিশ্বাস, কুমার রায়, বসন্ত চৌধুরী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম মনে পড়ছে। একালে প্রয়োগ-শিল্পের মর্যাদায় ও আভিজাত্যে আবৃত্তির নবাভিষেকের পর, এঁদের মধ্য থেকে তৃপ্তি মিত্র, বিকাশ রায় ও সৌমিত্রবাবুকে আবৃত্তির আসরে ফিরে পেয়েছি। নবাগতদের মধ্যে আছেন শাঁওলি মিত্র, অপর্ণা সেন প্রমুখ অভিনেত্রী। সুতরাং একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুসূদন আবৃত্তির যে আধুনিক ধারার গোড়াপত্তন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে শিল্পগুণান্বিত করে তুলেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের কালেই কয়েকজন যশস্বী অভিনেতা তাঁদের আবৃত্তি-অনুরাগের মধ্য দিয়ে সেই নবজাত শিল্পটিকে সযত্নে লালন করেছিলেন বলেই সে আত্মমান হতে পেরেছে এবং পরবর্তীকালে জনচিত্তজয়ী প্রয়োগশিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। একালেও কয়েকজন দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রী আবৃত্তিশিল্পকে ভালোবেসে এই শিল্পের সঙ্গে নিষ্ঠাভরে নিজেদের সম্পৃক্ত রেখেছেন। যে যাই বলুন, আমি কিন্তু এটাকে তাঁদের অনধিকার চর্চা বলে মনে করি না বা আবৃত্তির আসরে তাঁদের অবাঞ্ছিত বলে গণ্য করি না। বরং আমি মনে করি, অভিনেতা অভিনেত্রীরা ভালো আবৃত্তি করবেন—এটাই তো স্বাভাবিক। সত্যি কথা বলতে কী, পরিপাটি করে গুছিয়ে কথা বলা বা বাকপটুতা একটা মস্ত বড় আর্ট। আমি একে বলি বাকশিল্প আর এই বাকশিল্পেরই নানা শাখা-প্রশাখা, ধারা-উপধারা হলো ঘোষণা, বক্তৃতা, সংবাদপাঠ, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদি, ইত্যাদি। অভিনয়ে পারদর্শী হতে হলে অবশ্যই আবৃত্তি শেখা দরকার। কারণ নিয়মিত আবৃত্তিচর্চার ফলে অনেক উপকার হয়,—উচ্চারণে জড়তা দূর হয়, অর্থবহ যতি বিভাজনের বিচারবুদ্ধিতে বিচক্ষণতা আসে এবং কণ্ঠস্বরের উচ্চাবচতা ও দম বাড়ে। তবে একজন সফল আবৃত্তিকার যে একজন সুঅভিনেতা হবেনই একথা জোর গলায় বলা যায় না, কেননা, অভিনয় আলাদা ধরনের কিছু নৈপুণ্য

দাবি করে। অভিনয়ের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক যে কয়েকজনের আবৃত্তি শুনেছি তাঁদের মধ্যে আছেন ড. নীহাররঞ্জন রায়, প্রবোধকুমার সান্যাল এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

আমাদের অনেকেরই মস্ত দোষ, আমরা বানানসচেতন নই, বানানের রীতিনীতি ও নিয়মশৃঙ্খলার ধার ধারি না, কলমের ডগায় যখন যে বানান এসে পড়ে—শুদ্ধ হোক অশুদ্ধ হোক—নির্দ্বিধায় তাই লিখে ফেলি। বানানের ক্ষেত্রে এই ঔদাসিন্যপ্রসূত নৈরাজ্যকে যতদূর সম্ভব শৃঙ্খলার শাসনে আনার চেষ্টা করেছি। তবে প্রবীণ প্রাজ্ঞ শ্রদ্ধাস্পদ লেখক ও প্রবন্ধকারের ব্যবহৃত বানানের ওপর কোনোরকম খবরদারি করবার ধৃষ্টতা দেখাই নি, তাঁরা যে বানান লিখেছেন সসম্ভ্রমে অবিকল সেই বানানই রেখে দিয়েছি।

আবৃত্তির বিবিধ তত্ত্ব তথ্য ও প্রয়োগপদ্ধতিগত বিষয়ে নানা প্রবন্ধ ছাড়াও, আবৃত্তিকারদের আবৃত্তিশৈলীর বিচারবিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে কোনো রসগ্রাহী শ্রোতার একটি প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেছিলাম। অজিত বসু সে অভাব পূরণ করেছেন। অজিতবাবুই প্রথম কলকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে আবৃত্তি বিষয়ে একটি তথ্যসমৃদ্ধ 'বিচিত্রা' প্রযোজনা করেছিলেন। তাঁর সব বক্তব্যই আমি নির্বিবাদে সমর্থন করছি না। কারো কারো আবৃত্তিশৈলী সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের সঙ্গে আমি সর্বৈব একমত নই। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, তাঁর মতামত একান্তভাবে তাঁরই নিজস্ব মতামত এবং এই প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন অন্তত বছর তিনেক আগে, যখন এই গ্রন্থ প্রকাশের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করি। তিন বছর সময় যে কোনো শিল্পীকেই অনেকখানি পরিণত ক'রে তোলে। অজিতবাবুর প্রবন্ধে তরুণ আবৃত্তিকারের তালিকায় রজত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও থাকলে খুশী হতাম। মুরারি সেনগুপ্ত বলতে তিনি হয়তো মুরারি চক্রবর্তীকেই বোঝাতে চেয়েছেন।

পাঠ আর আবৃত্তির মধ্যে প্রভেদ কতখানি—এই বিতর্কিত বিষয় নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করেছেন সুজন চন্দ। বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়ে গেলো। সাধারণত বই দেখে কবিতা বললে তাকে বলা হয় পাঠ আর বই না দেখে মুখস্থ বললে তাকে বলা হয় আবৃত্তি। এই প্রচলিত ধারণা আজকের দিনে কতখানি গ্রহণযোগ্য সে তর্কে না গিয়ে শুধু এইটুকু বলবো যে, কবিতা যতই মুখস্থ থাকুক, স্মৃতিশক্তি যতই প্রখর থাকুক আবৃত্তি করার সময় বইটি খুলে কবিতার পাতাটি কোলের কাছে মেলে রাখা ভালো, কোনো কারণে স্মৃতিভ্রষ্ট হলে অকূল পাথারে পড়তে হবে না। আমি দেখেছি, যাঁরা ঝাড়া-হাতে আবৃত্তি করেন

তাঁরা অনেক সময় ভুল বলেন, স্মৃতিস্খলিত শব্দের শূন্যস্থান মন-গড়া শব্দ দিয়ে পূরণ করে নেন। সেটা করা কি উচিত? আমার মনে হয়, ভুল বলার চেয়ে বই দেখে বলা কিংবা প্রয়োজন মতো বইয়ের আশ্রয় নেওয়ার জন্য তৈরি থাকাই শ্রেয়।

চন্দননগর সংস্থার অন্যতম কর্ণধার উৎপল কুণ্ডু তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোনো প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণের অবাধ অনুমতি দিয়ে তাঁর ঔদার্যে আমাকে মুগ্ধ করেছেন। শ্রদ্ধেয় সনৎ মিত্র উত্তর কলকাতার প্রাচীন গ্রন্থাগার Boys' Own Library-র একটি স্মারকপুস্তিকা থেকে ড. সুকুমার সেনের মূল্যবান প্রবন্ধটি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন। প্রয়াত জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের প্রবন্ধটি 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে সংগৃহীত। শ্রদ্ধেয় শম্ভু মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের অনুলিখিত বিবরণ প্রকাশের অনুমতি দিয়ে রসকলি সংস্থা যে উপকার করেছেন তার জন্য তাঁদের কাছে চিরঋণী রইলাম। পরিশিষ্টের যে অংশে ছন্দ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেই অংশটি বিশেষ ক'রে নবাগত আবৃত্তিকারদের কথা মনে রেখেই সংযোজিত হয়েছে। 'ছন্দ ও আবৃত্তি' শিরোনামের এই অংশটি রচনা ক'রে দিয়েছেন দে'জ পাবলিশিং-এর সম্পাদনা বিভাগ মূলত আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনকে অনুসরণ ক'রে। এই গ্রন্থের মুখ দেখার জন্য আমাদের মতোই অস্থির হয়ে আছেন বন্ধুবর সুবীর চট্টোপাধ্যায়। অধিকাংশ ছবিই তাঁর শিল্পকৃতি এবং প্রীতি উপহার। রাজা সরকার, সমরজিৎ ও সমীরণ নন্দীও ফোটো দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছেও ঋণী রইলাম। আরও কয়েকজনের সাহায্য পেয়েছি, চাওয়া মাত্র। বিশেষভাবে উল্লেখ করছি আমার অনুজপ্রতিম সৌমিত্র মিত্র ও দীপংকর মজুমদারের নাম। এখানেই শেষ করছি। জরুরী কিছু কথা তবু বাকী রয়ে গেলো। সেই না-বলা কথাগুলোর উদ্দেশ মিলবে বন্ধু ও সহযোগী সম্পাদক অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে।

প্রস্তাবনা : ২

বৈদিক যুগে উদাত্ত উচ্চারণে সংস্কৃত কবিতা ছিল আবৃত্তিধার্য। সেই সুদূর কাল থেকেই কথকতায় এই রম্য শিল্পটি কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ ক'রে আসছে। অতীতের কবিকণ্ঠে বৈশম্পায়নের মহাভারত অথবা বাল্মীকির রামায়ণ-আবৃত্তির রূপনির্ঝর হাজার শ্রোতাকে আপ্লুত করেছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেও আবৃত্তি যুগে যুগে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে এমন কি রাজদরবারেও। হিন্দু যুগে রাজা হর্ষবর্ধন, গুপ্ত সাম্রাজ্যে সমুদ্রগুপ্ত এবং মহাকবি কালিদাসের কালেও আবৃত্তি আদৃত হয়েছে প্রকৃত শিল্পমূল্যে। আধুনিককালের শ্রোতাদের কাছেও এই শিল্প যথাযোগ্য শর্তে সমাদৃত। অবশ্য কবিতার অবয়ব এখন অন্যতর হয়েছে, কালের ধারায় যেমন সব শিল্পের প্রকাশ-কৌশল বদলায়। ভাষার প্রবহমান গতিরূপ তো প্রতিনিয়ত পরিবর্তনপ্রিয়। আধুনিকতার পশ্চাৎপটকে গ্রহণ করেই আবৃত্তির আধুনিক রীতিতে শ্রোতার স্বাভাবিকধর্মী মেজাজ এবং পরিশীলিত মননকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে।

আবৃত্তি বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ প্রামাণিক গ্রন্থের প্রয়োজন আমরা দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করেছি। সেই অনুভবের তাগিদেই 'বিষয় : আবৃত্তি' গ্রন্থাকারে প্রকাশ সম্ভব হলো। যাঁদের রচনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে তাঁরা সকলেই এই বিশেষ শিল্পটিকে তাঁদের নিজস্ব অনুশীলিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন অথবা ভেবেছেন। কাজেই আবৃত্তির কোনো অঙ্গই এই গ্রন্থে বাদ পড়েনি। প্রতিটি নিবন্ধই চরিত্রগতভাবে আলাদা।

এই গ্রন্থে আবৃত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনা এবং নিবন্ধ বিষয়পরম্পরায় সন্নিবেশিত হয়েছে। বিশিষ্ট লেখকদের এইসব রচনা থেকে আবৃত্তি নামক শিল্পটির সম্যক পরিচয় পেতে প্রতিষ্ঠিত অথবা নবীন যে-কোনো আবৃত্তিকারেরই যেমন সুবিধা হবে তেমনি যাঁরা আবৃত্তিকার নন অথচ এই শিল্পটির ব্যাপারে আগ্রহী তাঁরাও সংগ্রহ করে নিতে পারবেন প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্যাদি।

এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দিয়েছেন দে'জ পাবলিশিং-এর অন্যতম কর্ণধার শ্রীসুধাংশুশেখর দে। আমাদের পরিকল্পনার কথা শুনে তিনি সোৎসাহে এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেন। এই গ্রন্থের প্রাথমিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে প্রকাশনার একেবারে প্রায় শেষ পর্যায় পর্যন্ত শ্রীসুবীর

ভট্টাচার্যের সাহায্য সহযোগিতা ও পরামর্শে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা অনেক দিনের। কিন্তু একটি সার্বিক রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে সময় একটু বেশি লাগল। কারণ, একটি পূর্ণাঙ্গ এবং প্রামাণিক আবৃত্তি-গ্রন্থের স্থান বর্তমান গ্রন্থটি যাতে পূরণ করতে পারে তার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং যথেষ্ট সময় নিয়েই সে কাজ সমাধা করেছি। আবৃত্তিকার, শিক্ষার্থী অথবা আবৃত্তিপ্রেমীদের কাছে এই গ্রন্থ সমাদৃত হলে সেটাই হবে আমাদের পরিশ্রমের পুরস্কার।

সূচীপত্র ঃ

প্রস্তাবনা ঃ ১		৩
প্রস্তাবনা ঃ ২		১১
আবৃত্তির মূল্য	॥ সুকুমার সেন	১৭
স্বরান্বিতা	॥ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র	১৯
প্রসঙ্গ ঃ আবৃত্তি ও ছন্দ	॥ প্রবোধচন্দ্র সেন	২৩
আবৃত্তি	॥ রাজ্যেশ্বর মিত্র	৩৩
আবৃত্তির লৌকিক ধারা	॥ অরবিন্দ পালিত	৩৫
বাংলার প্রথম আবৃত্তিকার কবি	॥ অরুণকুমার বসু	৪৩
আবৃত্তি প্রসঙ্গে শ্রীশম্ভু মিত্র ঃ একটি সাক্ষাৎকার		৪৮
কবিতা পাঠ কবিতা আবৃত্তি	॥ অরুণ মিত্র	৬৩
আবৃত্তি—কী পাই কী চাই	॥ সন্তোষকুমার ঘোষ	৭১
আবৃত্তির কথা	॥ দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫
আবৃত্তি ঃ সৌন্দর্যময় নির্মাণ	॥ অমিয় চট্টোপাধ্যায়	৭৮
পাঠ, আবৃত্তি ঃ কিছু ভাবনা, কিছু কথা	॥ প্রদীপ ঘোষ	৮৫
কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে	॥ পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯৭
প্রসঙ্গ ঃ আবৃত্তি	॥ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৩
কবিতার শরীর ছুঁতে পারলেও আবৃত্তি কী শিল্প ?	॥ দিলীপ ঘোষ	১০৬
আবৃত্তি ও শিল্প	॥ পবিত্র মুখোপাধ্যায়	১০৯
শিল্পিত কবিতা	॥ অজিত বসু	১১৩
শিল্পে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও আবৃত্তি	॥ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৪
আবৃত্তি— প্রয়োগ ঃ প্রথম ধাপ	॥ উৎপল কুণ্ডু	১৩৯
আবৃত্তি ও পাঠ	॥ সুজন চন্দ	১৪৫
আবৃত্তির বিভিন্ন দিক	॥ কলহন	১৪৯

আবৃত্তি : কথা ও সুর ॥ শঙ্খ ঘোষ ১৫৩
কবির চোখে আবৃত্তি ॥ কবিতা সিংহ ১৫৮
আবৃত্তি বনাম কবিতা ॥ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ১৬১
কবিতা পড়া কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি ॥ অমিতাভ দাশগুপ্ত ১৬৬
বাংলা আবৃত্তির উচ্চারণ ॥ দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৯
আবৃত্তি : সংশ্লিষ্ট একজনের চোখে ॥ বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ ১৭৭
এসো আবৃত্তি করি ॥ দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮০
পরিশিষ্ট : ১
বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি ও সংস্কার ॥ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৮৭
পরিশিষ্ট : ২
বাক্-প্রত্যঙ্গ ॥ মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯১
পরিশিষ্ট : ৩
ছন্দ ও আবৃত্তি ২০১
পরিশিষ্ট : ৪
কবিতা সংকলন
প্রথম স্তবক : অনুশীলনের জন্য ২১৬
দ্বিতীয় স্তবক : আবৃত্তির জন্য ২৪১
পরিশিষ্টে সংযোজিত কবিতার সূচীপত্র ৩৮০

বিষয় : আবৃত্তি

আবৃত্তির মূল্য

সুকুমার সেন

আমাদের দেশে খুব প্রাচীনকালে, আজ থেকে অন্তত তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার বছর আগে, খুব ভালো সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। সে সাহিত্য এতই ভালো যে, আজ পর্যন্ত তা আমাদের অধ্যাত্মজ্ঞানের চরম প্রকাশ ব'লে গণ্য হয়ে এসেছে। সে হ'ল ঋগ্‌বেদ ও অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থ। বৈদিক সাহিত্য যখন রচিত হয়, তখন লেখবার পদ্ধতি আমাদের জানা ছিল না। বৈদিক ঋষি কবিরা রচনা করতেন মুখে মুখে এবং সে রচনা কাগজে লিখে রাখার মতোই ধরে রাখতেন মুখে মুখে, আবৃত্তির সাহায্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে যে কাজ এখন লেখার ও ছাপার দ্বারা সাধিত হচ্ছে, তা একদা আবৃত্তির দ্বারা সাধিত হ'ত।

লেখার পদ্ধতি চালু হবার পরেও ঋগ্‌বেদের কবিতা লিপিবদ্ধ হয়নি। তা আবৃত্তির দ্বারা মুখে মুখে বাহিত হ'ত। এর একটা বড় কারণ আছে। সে হ'ল লেখাপড়ার চেয়ে আবৃত্তির উৎকর্ষ। লেখাতে ভাষার সবটুকু ধরা পড়ে না। না কণ্ঠস্বর, না সুরের টান (Pitch), না ঝোঁক (accent)। কিন্তু আবৃত্তিতে এ সবই যথাযথ বজায় থাকে। প্রধানতঃ এই কারণেই, প্রায় দু' হাজার বছর পর্যন্ত বেদের কবিতা কাগজে কলমে বিধৃত হয়নি, কণ্ঠে কণ্ঠে প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

আবৃত্তির এতটা মূল্যের জন্যেই বেদের সময় থেকে আবৃত্তি বৈদিক শিক্ষার একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ব'লে স্বীকৃত হয়েছিল। যাতে একটি অক্ষরও প'ড়ে না যায় আর বিকৃত না হয়, তার জন্যে বেদের কবিতা নানান ছাঁদে আবৃত্তি করা হ'ত। এই সব ছাঁদের নাম ছিল 'পাঠ'।

সবচেয়ে সহজ আবৃত্তিকে বলা হ'ত 'পদপাঠ'। এ আবৃত্তিতে প্রত্যেক পদ আলাদা আলাদা ক'রে সন্ধি-সমাস বিচ্ছিন্ন ক'রে পড়তে হ'ত। যেমন, সাধারণভাবে লেখা এই ঋকটি :

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥

পদপাঠে আবৃত্ত হ'ত এইভাবে—

অগ্নিঃ। পূর্ব্বেভিঃ। ঋষি-ভিঃ। ঈড্যঃ। নূতনৈঃ। উত।

সঃ। দেবান্। আ। ইহ। বক্ষতি॥

আরও দু'তিন রকম পাঠ বা আবৃত্তি-রীতি ছিল। যেমন 'ক্রমপাঠ' ও 'জটাপাঠ'। ক্রমপাঠে আবৃত্তির রীতি ছিল অনেকটা এই রকম: ১ ২ ২ ৩ ৩ ৪ ৪ ৫ ৫ ৬ ইত্যাদি। আদি অর্থাৎ দ্বিতীয় পদটি আবৃত্ত ক'রে তার পর তৃতীয় পদ পড়া হ'ত। জটাপাঠে আবৃত্ত হ'ত উল্টোপাল্টা ক'রে। যেমন: ১ ১২ ২১ ২৩১ ১২৩ ২৩৪ ৪৩২ এই ধরণে।

পরবর্তীকালে লেখার পুঁথির প্রচলন যথেষ্ট হ'লেও আবৃত্তির মর্যাদাভ্রংশ কখনোই ঘটেনি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহলে এই শ্লোকার্ধটি বহুকাল ধরে সমাদৃত হয়ে এসেছে:

আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদ্ অপি গরীয়সী॥

মানে, সকল শাস্ত্রেই আবৃত্তি ভাবার্থ গ্রহণ শক্তির উর্দ্ধে।

স্বরান্বিতা

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

স্বর-সজ্জায় সজ্জিতা ধ্বনি-বর্ণময়ী শ্রীমতী কাব্যলক্ষ্মীকেই এই নামে ডাকি। কাব্যই উচ্চারিত স্বর-ব্যঞ্জনায়। নানা অলংকার ঝকমকিয়ে ওঠে কাব্যশরীরে। কাব্যের প্রথম যুগ ছিল তাই ধ্বনি-চিত্রেরই যুগ। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির তাত্ত্বিক আবেদন প্রাগৈতিহাসিক কবিদের মনে দিয়েছিল দোলা। তাদের চৈতন্যসমুদ্র মন্থন করে উঠে এলো প্রথম প্রকাশের উচ্চারণ, গানে, নৃত্যছন্দে, স্তোত্রে। মনে হয় তাদের প্রথম বৃত্তিই ছিল বিস্ময়ের, আশ্চর্যের। ক্রমে ক্রমে অনেক কিছুই জমতে থাকে তাদের মনের থলিতে। অনুভূতির দুই উৎসের সঙ্গমে স্নাতকের পর্যায়ে পৌঁছলো মানুষ। এর একটি ধারা দৃশ্য আর একটি ধারা শ্রাব্য। কাব্য-প্রেরণার এই দুই উৎস-মূল মিললো সাহিত্যের ঐক্যতত্ত্বে।

পরের যুগে লেখনী ও মুদ্রাঙ্কনের রেখাজালে বাঁধা পড়তে লাগলো কাব্য-শরীর। সে শরীর হয়ে উঠতে লাগলো সংহত, সংকলিত ও সভ্য। আদিম সমাজে যা ছিল সর্বজনবেদ্য, সর্বজনভোগ্য, যা ছিল সম্মেলক উচ্চারণের মন্ত্র, তাই হয়ে উঠলো ব্যক্তিগত সাধ্য-সাধনার বিষয়। কাব্যের দিক থেকে তাই মানব সভ্যতার পথ, জনমানসের অভিব্যক্তির পথ, ক্রমবিবর্তনের পথ। পদে পদে ইতিহাস তার সাক্ষী রয়ে গেছে। এই যুগ-যুগান্ত-প্রসারী পথেই কাব্যলক্ষ্মী community living-এর সংসার থেকে individual living-এর সংসারে ক্রমে এসে পড়েছেন। প্রসঙ্গত আসে দেশজ ক্ষেত্রের কথা, যে মাটিতে কাব্যকানন মঞ্জরিত হয়ে ওঠে, তার কথা। লোক-মানসের প্রসঙ্গে এই মাটির অর্থাৎ ক্ষেত্রজ উপাদানের ব্যাপারটি অত্যন্ত গভীরভাবে চারিয়ে গেছে সমস্ত সমাজ-শরীরে অশথ গাছের শিকড়ের মত। অন্যান্য শিল্পের মত কাব্যও উদ্ভিদ শ্রেণীর। এর মূল আছে মাটির গভীরে, চৈতন্যের গহনলোকে। এর মূল ইতিহাসের বিবর্তনে, সমাজের সংগ্রামে, বিপ্লবে-সংস্কারে, কুসংস্কারে। এর পাথেয়ের

মধ্যে আছে প্রত্যয়, সংস্কার, ঐতিহ্য। কারণ পথ-চলতি সমস্ত প্রত্যক্ষ বস্তু-সংঘাতই রূপান্তরিত অভিজ্ঞাত স্মরণে। এই স্মরণ পথেই কল্পনায় আসা-যাওয়া। এবং দেখা যায় একটা বিশেষ জাতির বা সমাজের জীবনেতিহাসে এই কল্পলোকেরও পরিবর্তন বিবর্তন ঘটে। এই বিবর্তনের টানে একটি স্বরের উচ্চারণও বদলায়। প্রথম গোষ্ঠীজীবনে যা ছিল ধ্বনি-ধর্মী, যা ছিল মুদ্রাময় ইঙ্গিত, তা লিপি-ধর্মী হয়ে ওঠে। এই বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে এলো পুরোহিত, রাজা, রাজ্য, রাষ্ট্র, সমাজ ও বাণিজ্য। আদিম পাহাড়ে-প্রান্তরে পশুপালকের সম্ভাষণের "ও-ও-হো-ই-ই" ডাক, যা পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ভিন্-পাহাড়ের কোনো একটি মনকে হয়ত দোলা দিয়ে যেত, চমকে উঠে কান খাড়া করে ফিরে তাকাত হরিণের পাল—সেই ডাক সভ্য ও সংক্ষিপ্ত হয়ে দেখা দিল "এই…ওই…বা…ঐ" ডাকে। প্রথম বিস্ময়ের বা আনন্দের আ-কার বন্ধুবিষম পাথরের এবড়ো-খেবড়ো চাই থেকে সুষম রূপ নিল ভদ্র-রুচির ভাস্কর্যের ঘায়ে। সেই প্রথম সম্ভাষণের উচ্চারণ থেকে আধুনিকতম সম্ভাষণ-আপ্যায়নের মসৃণ রূপায়ণ পর্যন্ত এই পথ প্রসারিত। বড় মনোজ্ঞ ও বিচিত্র এই পথ।

যাই হোক এই পথকে বিচিত্র ও মনোজ্ঞ বলে সসম্ভ্রম দূরত্ব থেকে নমস্কার না করে, এই পথেই নেমে পড়া যাক, অনেক তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান মিলবে এবং আমার মূল প্রস্তাবেও এসে পড়ব। অতি-প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায়—ঐতিহাসিক বা নৃতাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ জল্পনা-কল্পনায় রত না থেকে আমার মূল প্রস্তাবেই এসে পড়ি। চর্যাপদের প্রায় অপ্রচলিত ও অধুনা বিস্মৃত পদগুলি বাদ দিয়ে বাংলা পদ্যের গত পাঁচশত বৎসরের ধারাই অধুনা বিচার্য। কীর্তন-পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, ছড়া-ব্রতকথা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলার লোকমানসের যে বিচিত্র বিন্যাস দেখতে পাই তা মূলত গীত-ধর্মী। কিছু গানের মধ্য দিয়ে, কিছুটা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে এবং লোক-গাথা বহুবার শুনে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি বোধ করেছি—এই ধারাটির উৎস আর্যেতর গণমানসে। বাংলার লোকশিল্পের প্রাকৃত স্বভাব একে করে তুলেছিল লোকায়ত। মনে পড়ে কিশোর বয়সে পল্লীগ্রামের 'মনসার ভাসান' গানের আসর শ্রাবণ মাসটা জুড়ে প্রায় সারারাত ধরে চলতো। এক রাত্রে চুপি চুপি অভিভাবক-সঙ্কুল জীবনের বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে হাজির হয়েছিলাম সেই ভাসান-গানের আসরে; 'দুলে বাগ্‌দীদের পাড়ায়। ধারা-শ্রাবণে ভেজা সেই রাত্রির ভাসান-গান আজও কানে লেগে আছে। তারপর আছে বীরভূমের বক্রেশ্বরের মেলায় বা'মালদহের রামকেলীর মেলায় আউল-বাউল-সাঁই প্রভৃতি সম্প্রদায়ের

দেহ-তত্ত্বের গান। গ্রামের চড়কের মেলায় গাজনের গানেও দেখেছি তাই। মৈমনসিংহ-ত্রিপুরা অঞ্চলের ময়নামতীর গানেও উচ্চারণ ভেদে একই স্বর-শ্রুতির প্রয়োগ দেখতে পাই। অনেক সময় কতক কতক গানের স্বর-লিপি করবার প্রয়াসও পেয়েছি। এ সবই বাংলার প্রাক্তন ঐতিহ্য-ধারা-স্রোতে ভেসে আসা, আধুনিক কালের ঘাটে লাগা রসসামগ্রী। এ ধারা অবশ্য অধুনা ম্রিয়মান ও মৃত-প্রায়। তখন অবশ্য নিজেদের দায়েই গান ও কাব্য ছিল অনেকটা একান্নবর্তী। এর প্রয়োগ ও প্রয়োজন ছিল লোকসেবায়। প্রেরণা ছিল দেব-দেবীর বিচিত্র লোক-পুরাণে, রূপকথায়, ব্রত-পালা-পার্বণে। অনেক সময় তদানীন্তন ঘটনা-রটনাও প্রভাবান্বিত করত এর উপকরণকে। এই সূত্রের শেষ পর্বে ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তকে মনে পড়ে বেশী।

তারপর এলো উনিশ শতকের ইঙ্গ-বঙ্গ সভ্যতার প্রচণ্ড বেগ। এ বেগে অনেক কিছুই পরিবর্তিত হল, সমূলে উৎপাটিত হল অনেক কিছু, আবার নতুন সমৃদ্ধিও এনে দিল অনেক। সমস্যারও উদ্ভব হল; যার এখনও সম্পূর্ণ সমাধান মেলেনি। রোমান্টিক ভাব-বিলাসের সূক্ষ্ম পেলব আঙ্গিকের চর্চা হল শুরু। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নিরালায় আত্ম-সাধনের পালা শুরু হল। বহু পরীক্ষণ নিরীক্ষণ চলতে লাগলো কাব্যের আঙ্গিক নিয়ে। মাইকেল বিহারীলাল থেকে শুরু করে এর চরমোৎকর্ষ মিললো রবীন্দ্রনাথে। কিন্তু দেখা গেল এতদিনে কবিতা ও গান আলাদা হেঁশেলে অন্নগ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে, রবীন্দ্রনাথে এর ব্যতিক্রম কিছুটা দেখা গেলেও। কাব্যের রসবস্তুর পরিধি বহুল পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করলেও কবি-মানস ক্রমশ গজদন্ত-মিনারেই কল্প-বাস করতে লাগলো। কাব্য, আবৃত্তির সহজ লোকায়ত সম্বোধন থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো।

সমস্যাটা ভালোভাবেই জমে উঠলো রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-সাধনায়। নূতন নূতন স্বর-প্রয়োগে বিচিত্র বাগ্‌বিন্যাসের পশ্চিমী কায়দায়, কবিদের হাত আশ্চর্য পেকে উঠলো। কিন্তু সে পাকা হাতের ফল প্রাকৃতজনের আস্বাদনের বস্তু হল না। বিশেষ করে আমাদের দেশের অর্ধশিক্ষিত নিরক্ষর জনসাধারণের নাগালের বাইরে সৌখিন বাবুদের কাব্য-কাননের মাকালফলের মতই তা ঝুলে রইল। এই ভাব-সমাধি অবশ্য কিছু পরিমাণে ঘা খেলো গত দশ বারো বছরের প্রগতি-আন্দোলনের ঢক্কা নিনাদে। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিবাদী ও মার্কসমন্ত্র ভাবধারার চাপেও এই সংকট থেকে ত্রাণের উপায় পাওয়া গেল না। মূল সমস্যা সমস্যাই থেকে গেল। এর প্রধান কারণ অবশ্য কাব্যবোধের বিচার ও উৎস-লুপ্তি।

এই উৎসের সন্ধানে অনেক expeditir n-এর দল বেরিয়ে পড়ল নানা দিকে। আমিও এদের কোনো একটি দলের সঙ্গী হিসাবে নানা জায়গায় ঘুরেছি তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধানে। এবং সে সন্ধান একেবারে নিষ্ফল হয়নি। অবশ্য আমি সে সমস্যার সমাধান দিতে পারি সে গুরুত্ব বা যোগ্যতা আমার নেই, তবে ঘরোয়া-ভাবে খোলাখুলি আলোচনায় আমাদের, বিশেষ করে যারা কবি-কর্মী তাদের, উপকারই হবে বলে মনে করি। এ সমাধানের পথ, সুষ্ঠু সমন্বয়েরই পথ। যা কিছু সুস্থ ও সময়ানুগ অগ্রস্থিতি, পুরোপুরিভাবে বজায় রেখে ফিরিয়ে আনতে হবে সেই হারিয়ে যাওয়া প্রত্যাখ্যাত স্বরগুলিকে, আবৃত্তির লোকায়ত সম্বোধনকে। ধ্বনি-কাব্যের আঙ্গিক-সর্বস্ব অতিমাত্রিক আলঙ্কারিক দিকগুলিকে বর্জন করে কাব্যে অঙ্গীকৃত করতে হবে অপেক্ষাকৃত সহজ ও direct আবেদনের বর্ণাঢ্য ভাষা। এতে ইঙ্গিতময়তা নষ্ট হয় বলে আমার মনে হয় না। আপাতত সে শৈলী আমাদের আয়ত্তে নেই। কিন্তু তা আয়ত্তের মধ্যে আনতে হবে। অধুনা চিত্রকল্পের ধুয়া ধরে অনেকেই কাব্য-বিচার করে থাকেন।

যথাযথ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই "চিত্র-কল্প" নামক বস্তুটি নিছক ব্যক্তিগত ভাবরসে পুষ্ট এক বিচিত্র বস্তু, যা আবৃত্তি করে শোনালে অনেক সময় একটা বিশুদ্ধ ইয়ার্কির মত শোনায়। কাব্যের মহৎ সাধনা এই ব্যক্তি-চিত্রকল্প থেকে লোক-চিত্রকল্পের সাধারণ্যে উত্তরণ। এতে অবশ্য তৃপ্তি আত্ম-প্রসাদের নয়, আত্ম-ব্যাপ্তির, আত্ম-ত্যাগের। আমার মনে হয় আবৃত্তির মানদণ্ডে ফেললে এর যথার্থ রূপ প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ধ্বনিই এর একমাত্র পথ-নির্দেশক ও রক্ষক। তা নইলে মনের গহনতর কোণের নিরালায় নিমজ্জমান অবাক কবিকে রক্ষা করবে কে?

প্রসঙ্গ : আবৃত্তি ও ছন্দ

প্রবোধচন্দ্র সেন

প্রশ্নটা ছিল, আমরা আবৃত্তিকে শিল্প হিসাবে গ্রহণ করতে চাই। আবৃত্তি একটা প্রয়োগ শিল্প। এরূপ আবৃত্তিকে শিল্প হিসাবে গ্রহণ করার কোন প্রাচীন ইতিহাস কি পাওয়া যায় ?

উত্তরের আগেই অভিযোগ করলেন (প্রবোধচন্দ্র সেন), এখন তো আবৃত্তি বলতে সবই গদ্যপাঠ। যে কোন কবিতা যে ছন্দেই লেখা থাক সবই গদ্যের মতন করে বলে। আমি অবশ্য এখানেই থাকি, বেতারে যতটুকু শুনি, অন্য কোথাও তো যাই না। কিন্তু এই কথাটা মনে হয়, আগে আবৃত্তিতে ছন্দ থাকত, সুর থাকত। এখন এরা যে এরকম করে বলে তার একটা যুক্তিও আছে, এরা বলতে চায় যে, ছন্দ অত প্রকট হবে না, প্রচ্ছন্ন থাকবে। লোকে মনে মনে বুঝে নেবে। কিন্তু কবিতার ছন্দ তো সেজন্য নয়, তা হলে ছন্দে লেখা কেন ? গানের সুরটা যদি সুর করে না বলি, কথাগুলোই বলে যাই আর লোকে মনে মনে সুরটা বুঝে নেবে, তা হলে তো আর গান থাকে না। কবিতার ছন্দও সেই রকম।

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের কবিতাও তো এখন সবাই বলে, তাদের আবৃত্তি সম্বন্ধে কি মনে হয় ?

উত্তর : কবিতার ভাবের ব্যাপারটা তো যে যার নিজের মতন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও বলে গেছেন, কবিতাকে যে যার রুচি, বুদ্ধি, অনুসারে বুঝবে। তাই আবৃত্তিতে ভাবটা নিজের নিজের মতন হয়, হবেই। কিন্তু কবিতার একটা শব্দ তো বদলে দেওয়া উচিত নয়। কবির গড়া ছন্দ যদি না মানি, ভুল পড়ি বা ইচ্ছে করে গদ্য করে পড়ি, সে তো শব্দ বদলে দেওয়ারই সামিল। রবীন্দ্রনাথ এটা চাইতেন না। একবার দিলীপকুমার রায় কবির একটা গান শুনিয়েছিলেন। ভাষাটা কবির, সুরটা তাঁর নিজের। কবি বলেছিলেন, তোমার সুরটা

খুবই ভালো, কিন্তু আমার গানটা আমার সুরে গাইলেই ভালো লাগে বেশী। কবিতার ছন্দ সম্বন্ধেও একই কথা খাটে।

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথ নিজে আবৃত্তি করার সময় যেমন ছন্দ রেখে পড়তেন, তাঁর সময়ে যাঁরা তাঁর কবিতা আবৃত্তি করেছেন, শিশির ভাদুড়ী বা অন্যান্যরা, তাঁরা কি তাঁর মতই পড়তেন ?

উত্তর : ঠিক তাঁর মতই হয়ত হত না। কিন্তু তাঁরা যেটা যেমন ছন্দ, হাতে তাল রেখে সেই রকম বলতে চাইতেন। শ্রোতারাও সেটা বুঝতে পারতেন।

প্রশ্ন : আপনি দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রজীবনের প্রায় ৪০ বছরের সঙ্গে আপনার যোগ ছিল, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ নানাভাবে বদলেছে। সেই সঙ্গে তাঁর আবৃত্তির ঢঙ-ও কি বদলেছে ?

উত্তর : না, তাঁর বাচনভঙ্গির পরিবর্তন হবে কেন ? কি পরিবর্তন হবে ?

প্রশ্ন : আমি বলতে চাইছি, কড়ি ও কোমল, খেয়া এবং ক্ষণিকা এবং পরে বলাকা বা তার পরে পুনশ্চর গদ্যছন্দ একটার সঙ্গে আর একটার তো দুস্তর ব্যবধান, এই ছন্দের সঙ্গে আবৃত্তির কি কিছু পার্থক্য রবীন্দ্রনাথের গলায় শোনা যেত ?

উত্তর : হাঁ, সেটা যে ছন্দ যে রকম সেই রকম করে বলতেন। তালের, ঝোঁকের, যতি বা বিরামের জন্য যা তফাৎ সেটা হতো।

[এই প্রসঙ্গে, তিনি তাঁর "বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান," "ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ" ও তাঁর সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের "ছন্দ" (তৃতীয় পর্ব) গ্রন্থ তিনটি অনুসরণ করতে বলেন।]

প্রশ্ন। কিছু প্রাচীন বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করব। বেদের স্তোত্র পাঠের জন্য স্বরের উত্থান পতন চিহ্নযোগে নির্দিষ্ট ছিল। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত তিনটি স্তরে ওঠা নামা হত স্বরের। ফলে সেই চিহ্নগুলি কি স্বরলিপির কাজ করত ?

উত্তর : হাঁ, অবশ্যই। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত হল তিনটে ধাপ। পরে যেমন সাতটি ধাপ হয়েছে। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। কিন্তু এগুলো তো এমনি অকারণ ছিল না। এই উচ্চাবচতার সঙ্গে অর্থের যোগ ছিল। এখনও আছে। ধর, 'তার' মানে কি ?

তাহার। সর্বনাম।

আবার তার (wire) মানে আলাদা। তুইয়ের উচ্চারণ, বলার কায়দা কি একই হয় ? এই বাচনিক কায়দাটা সে যুগের উচ্চারণে খুব নির্দিষ্ট ছিল।

প্রশ্ন : সংস্কৃতে যে হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের নিয়ম তাতে স্বরের lateral সংকোচন প্রসারণ হয়। vertical উত্থান-পতন সম্বন্ধে পরবর্তী সময়ে বেদের মতন কিছু নির্দিষ্ট ছিল কি ?

উত্তর : না, ওই হ্রস্ব-দীর্ঘর সঙ্গেই উচ্চাবচতা কাজ করত।

প্রশ্ন : এই হ্রস্ব-দীর্ঘর নিয়ম কখন থেকে চালু হল। উপনিষদে তো এ নিদর্শন পাই। বেদেও কি ছিল ?

উত্তর : হ্যাঁ, বেদেও ছিল।

প্রশ্ন : আমাদের পয়ারের যে পাঠের সুরটি, এটা কোথা থেকে উৎপন্ন হল ?

উত্তর : এটা এসেছে "পাদাকুলক" ছন্দ থেকে।

প্রশ্ন : বাংলা রামায়ণ, পাঁচালী এসব যে পড়া হত, একে কি গান বলব, না আবৃত্তি ?

উত্তর : সুরে পড়া হত।

একটা কথা, একটু গুছিয়ে বলি, ছাখো, বাণী আর বীণা, দুইই সরস্বতীর। সরস্বতীরই নাম বাণী, তাঁরই নাম বীণাপাণি। এই যা কিছু সবই এক সূত্রে উৎপন্ন।

বেদের সময়ে 'সাম' বলে যে ভাগ ছিল তা গানই। আর ঋক্, যজু, পাঠ হত। ক্রমে ক্রমে কাব্যবিভাগ আর সংগীতের বিভাগ আলাদা হয়ে গেল। সংগীতের তাল, মান, রাগ, লয় কত বিচিত্র বিকাশ। আর কাব্যেরও পরবর্তী সংস্কৃত সময়ে কত ধরণের ছন্দ। মন্দাক্রান্তা, রুচিরা,……নানা রকম।

গান আর পাঠ বা আবৃত্তি মিলেমিশেই ছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দমে দেখবে কিছু অংশ পাঠ করার "মেঘমেদুরম্বরম্……" আবার কিছু অংশ তাল সহযোগে গান করার।

বাংলা পাঁচালী, রামায়ণ, মঙ্গলকাব্য এগুলো সুরের প্রাধান্ত ছেড়ে আবৃত্তি বা কথকতার দিকে অনেকটা চলে এসেছে। আসলে তখন তো যে সব লোকে লেখাপড়া জানতো না, তাদের সামনে এগুলো বলা হত, বা তখন ছাপাখানার আবিষ্কারের প্রভাব পৌঁছায়নি। লোকের যাতে ভালো লাগে, মনে থাকে, তাই, একটু

বেশী সুর দিয়ে, তাল দিয়ে বলা হত।

ছাপাখানার কাজ চালু হলে ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকে কবিতা ছাপা হল। পাঠ্য হল। তখন ছন্দ বুঝবার জন্য ছন্দবিভাগ করে দেখানোর দরকার আরও বেশী হল। আগে তো যিনি লিখতেন তিনি কণ্ঠেই বলে বলে দেখাতে পারতেন।

তারপর রবীন্দ্রনাথ এই তিন রীতির পড়বার পৃথক পৃথক রাস্তা করলেন। তিন ধরণের ছন্দ তাঁর রচনাতে স্পষ্ট হতে থাকল।

প্রশ্ন: Stress Accent তো বাংলায় বা সংস্কৃতে ছিল না, মধুসূদন Blank Verse অনুসরণে তা আনলেন, তার ফলে আমাদের পঠনরীতির তো কিছু পরিবর্তন হল ?

উত্তর: এ সম্পর্কে আমি "ছন্দ-সমীক্ষা" (গবেষণা পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) গ্রন্থে কিছু বলেছি।

তিনি প্রসঙ্গক্রমে ছন্দ-শিক্ষার জন্য তাঁর নবতম গ্রন্থটির কথা বললেন। ছোটদের জন্য নয়, কিন্তু প্রাথমিক ছন্দ চর্চা যারা শুরু করবেন তাদের জন্য যথাসম্ভব সহজ ও সংক্ষেপ করে "ছন্দ-সোপান" লিখেছেন।

[এই প্রসঙ্গে, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের তিনটি গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল। উদ্ধৃতির শেষে গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হল।]

বাংলা ছন্দ চিন্তার ক্রমবিকাশ

…ঋক্‌মন্ত্রগুলিরই অপর নাম 'ছন্দ'। মন্ত্রগুলি ছন্দোবদ্ধ রচনা বলেই এই নাম। পক্ষান্তরে এ কথাও জানি যে, ঋক্‌মন্ত্রগুলি সুর দিয়ে গান করলেই তা সামে পরিণত হয়। …ছন্দ বাঁচিয়ে পড়লে বা আবৃত্তি করলে যা হয় আবৃত্তি বা কবিতা, সুরে-লয়ে গীত হয় বলে তাই আবার স্থান পেয়েছে গীতবিতানে। (৪)

…দৈশিক ভাষায় ছন্দরচনার কোন বাঁধা নিয়ম নেই, কানের অভিরুচির উপরে নির্ভর করে লিখে গেলেই হল এবং পড়বার সময় কানের অভিরুচির সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে দীর্ঘবর্ণকে লঘু আর কোথাও দ্রুত, কোথাও মন্থর উচ্চারণ করে ছন্দ রক্ষা করলেই হল। অর্থাৎ দায়টা ছন্দ-রচয়িতার নয়, পাঠক বা আবৃত্তিকারের। ছন্দ বাঁচিয়ে রচনার দায় নেই, পাঠ বা আবৃত্তি করেই ছন্দ বাঁচাতে হবে। (১৭)

ছড়াই হক বা অন্য যে-কোনো পদ্যাকার রচনাই হক, সকলেরই প্রাণ ওই রিদম্‌ বা তাল। সেকালেও সর্ববিধ পদ্যাকার রচনার লক্ষ্য ছিল এই তাল

উৎপাদন। আর গায়কের, আবৃত্তিকারের বা পাঠকের কণ্ঠে কখনও তালস্খলন ঘটত না। আধুনিক কালেও পুরাণ-পাঠকের বা কবির লড়াইয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কণ্ঠে অতি অমার্জিত পদ্য রচনাও কিভাবে সুনিয়ত তালে উচ্চারিত হয় তা সকলেই জানেন। সেকালে পদ্যরচনা হয় সুরে তালে গীত হত কিংবা পাঠক-ঠাকুরের কণ্ঠে গীতভঙ্গিতে আবৃত্তি হত তালস্খলন ঘটত না। (২৫-২৬)

·· আজকালকার পাঠে বা আবৃত্তিতে ওরকম পর্বাদ্য সুস্পষ্ট বা প্রবল ঝোঁক থাকে না, তাই এ জাতীয় শব্দচ্ছেদও হয় না। তা ছাড়া, শব্দের, বিশেষত তৎসম শব্দের আদ্য ও মধ্য রুদ্ধদলের যথেচ্ছ প্রসারণ চলে না, আর অন্ত্য রুদ্ধদলের সংকোচন অচল হয়ে গেছে। (২৮)

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের চিত্তপ্রকৃতি আপন সার্থকতা লাভের উপায়স্বরূপ সৌন্দর্যের ধ্বনি-রূপকেই প্রধানত আশ্রয় করেছে। তাঁর সহজাত রূপনৈপুণ্যের স্পর্শ পেয়ে সৌন্দর্যের ধ্বনিরূপ যে বিচিত্র ও অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। ধ্বনিশিল্পীরূপে তিনি বাংলা ভাষায় যে মায়ার সৃষ্টি করেছেন তার তুলনা নেই।···রূপস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ছন্দ ও সংগীত, ধ্বনির এই উভয় প্রকাশকেই অবলীলাক্রমে যুগপৎ রূপসৃষ্টির কার্যে নিয়োগ করেছেন। ছন্দ ও সংগীত ধ্বনি-শিল্পের অঙ্গ। (১-২)

ছন্দ একটি ধ্বনিশিল্প, সুতরাং ছন্দের গোড়ার কথাই হচ্ছে ধ্বনির তত্ত্ব। ধ্বনির বাহন কাল, ছন্দ বস্তুত এই ধ্বনিবাহী কালের উপরই নির্ভর করে, লিখিত অক্ষর সংখ্যার উপর নয়। (৭)

মধ্যযুগের পদাবলী রচয়িতা কবিগণ সংস্কৃত ও প্রাকৃত রীতির, বিশেষত জয়দেবের রীতির, অনুবর্তন করে বাংলা ছন্দেও দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা বজায় রাখতে প্রাণপণে প্রয়াস করেছেন। কিন্তু বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের বিরুদ্ধতা করে কৃত্রিমভাবে দীর্ঘস্বরের গুরুত্ব রক্ষার প্রয়াস সফল হয়নি। প্রাচীন কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের রচনাই এ বিষয়ে অনেকটা সফল হয়েছে বলা যায়। উনবিংশ শতকেও এ প্রয়াসে বিরাম ঘটেনি। মধুসূদনের "পদ্মাবতী" নাটকের চতুর্থ অঙ্ক থেকে উদাত্ত ধ্বনির মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

সৈন্যসকল সমরকুশল, নিরখি ভীত অরিদলবল,
কম্পিত হয় ধরণীতল, বাসুকি নত লাজে।

এ ধরণের দীর্ঘস্বরময় মাত্রাবৃত্ত ছন্দরচনায় প্রাচীন পদ্ধতিকে আমরা প্রত্নরীতি নামে অভিহিত করব। আর রবীন্দ্র প্রবর্তিত মাত্রাবৃত্ত রচনার আধুনিক পদ্ধতিকে বলব 'নব্য' রীতি।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু নব্যরীতির প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, তা নয়। প্রত্নরীতির ছন্দ রচনাতেও তিনি সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। "ভারতলক্ষ্মী" ও 'ভুবনেশ্বর হে/মোচন কর।' বলা প্রয়োজন যে, পাঠ বা আবৃত্তিযোগ্য কোন কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এ রকম প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ব্যবহার করেননি, যদিও তাঁর পূর্ববর্তী ও সমকালবর্তী অনেকে তা করেছেন। প্রত্নরীতিতে রচিত কবিতার ধ্বনিগত কৃত্রিমতা পাঠ বা আবৃত্তির পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। (১৬—১৭)

ভারতচন্দ্রের পূর্বেও এই লৌকিক ছন্দ (স্বরবৃত্ত) কবি সমাজে অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু নেহাৎ লৌকিক বলেই এটি সব সময়েই অল্পবিস্তর অবজ্ঞাত ছিল। তথাপি এ ছন্দের তৎকালীন রূপের কিছু * নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। সেকালে এ ছন্দটি ধামালি ছন্দ নামে পরিচিত ছিল। ধামালি শব্দের অর্থ হচ্ছে ধাবমান, দ্রুত গতিশীল; গৌণার্থে, অশান্ত বা দুরন্ত। এই লৌকিক ছন্দটির গতি-প্রকৃতির প্রতি একটু লক্ষ্য করলে অনায়াসেই টের পাওয়া যাবে যে, এটি হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুত লয়ের ছন্দ; এর চালে একটা অশান্ত বেগ সহজেই অনুভব করা যায়। (৩২)

এ ছন্দটি (অক্ষরবৃত্ত) মূলে মাত্রাসংখ্যাত না ধ্বনিসংখ্যাত, এর পর্বগঠন কিরূপ হবে, প্রতি পঙক্তিতে ক'টি অক্ষর থাকবে, যতি স্থাপনের বিধি কিরূপ, এর প্রকারভেদ কি উপায়ে উৎপন্ন করা হয় ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই প্রাচীন কবিদের মনে সর্বদাই সংশয় ছিল। তাই প্রাচীন কাব্যগুলিতে দেখতে পাই, এ ছন্দ কোথাও মাত্রিক প্রকৃতির, কোথাও স্বরসংখ্যক। এর পর্বগঠন ও যতিস্থাপন অনিয়মিত, প্রতি পঙক্তির অক্ষর সংখ্যা অনির্দিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে একদিকে সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব ও অক্ষর গোণার প্রয়াস, অন্যদিকে মাত্রা ও স্বরসংখ্যক নির্দিষ্ট করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তার উপরে সমস্ত ছন্দই সুর করে গানের ভঙ্গিতে আবৃত্তি করার প্রথা, এই সমস্ত বিভিন্ন প্রভাবের ফলে এ ছন্দটি একটি সুনির্দিষ্ট আকার লাভের সুযোগ পাননি। (৩৩)

তিনি জানতেন ছন্দ-শাস্ত্র, দর্শন-শাস্ত্র নয় সেটি হচ্ছে শ্রৌতশাস্ত্র। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই এই যৌগিক ছন্দটিকে দৃশ্যমান অক্ষর সংখ্যার সংকীর্ণ খাঁচা থেকে শ্রূয়মান ধ্বনির আকারে মুক্তি দিয়েছেন। (৩৭—৩৮)

---

* মূল গ্রন্থের পাদটীকা বর্তমান সংকলনে বর্জিত।—স.

. তিনিই শতাধিক বৎসরের আকস্মিক সংস্কারকে ছিন্ন করে যৌগিক ছন্দকে বিশুদ্ধ ধ্বনিভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, আকস্মিক ছন্দ বলে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিংবা অন্য কোন ভাষাতেই চলতে পারে না। (৫২)

আমাদের লোকসাহিত্যে পঞ্চমাত্রপর্বিক ছন্দের দৃষ্টান্ত আছে। যথা— "খোকা ঘুমাল............' কিন্তু স্বভাবতই ছড়া-সাহিত্যে কোন ছন্দেরই আদর্শ সর্বত্র সমানভাবে অনুসৃত হয় না; ঘন ঘন ছন্দের রূপ বদল হয়, নানা আদর্শের মিশ্রণ ঘটে, ধ্বনিসন্নিবেশে ত্রুটি ঘটে এবং আবৃত্তির ভঙ্গিতে সে ত্রুটিকে মার্জনা করা হয়।

"জলের উপর রোদ পড়েছে.........হাঁসের ছায়া"। এ রকম ছড়াসুলভ বিবিধ ছন্দোরীতির মিশ্রণ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের রচনায় দেখা যায় না। বস্তুত "কড়ি ও কোমল" এর পরে তিনি আর কখনও ছড়ার লৌকিক আদর্শে কবিতা রচনা করেছেন বলে মনে হচ্ছে না। ছড়ার ছন্দকে তিনি বহুল পরিমাণেই কাজে লাগিয়েছেন; কিন্তু ঐ ছন্দকে তেমনি বহুল পরিমাণেই তিনি সংস্কারও করেছিলেন.........। বস্তুত এটি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দান এবং এ ছন্দ উদ্ভাবনের সমস্ত কৃতিত্বটুকু একা তাঁর প্রাপ্য। (৬৭—৭০)

রবীন্দ্রনাথ লৌকিক ছন্দের ষন্মাত্রপর্বিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ও ছন্দ রচনা করেছেন। এবং তিনিই সর্বপ্রথমে ও ছন্দের ষন্মাত্রপর্বিকতার কথা বিশদভাবে বুঝিয়েছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত স্বরবৃত্ত অর্থাৎ লৌকিক ছন্দের স্বরূপ বুঝতে হলে ও ছন্দের ষন্মাত্রপর্বিকতার বিষয়ে সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। স্বরবৃত্ত ছন্দের পর্বে আপাতদৃষ্টিতে ছয় মাত্রা লক্ষিত হয় না; কিন্তু কানকে সজাগ রেখে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে তা ধরা পড়ে। যথা:

ভারতভূমির | সব ঠিকানাই | ভুলি—যদি— | দৈবে
যোগীন্দাদার | ভুগোল গোলা— | গল্প মনে— | রইবে।

যথাযথ ভাবে আবৃত্তি করে গেলেই টের পাওয়া যাবে যে, যে সব পর্বে ছয় মাত্রার স্থান প্রত্যক্ষভাবে ভরতি করা হয়নি সে সব স্থলে একটি বা দুটি মাত্রার ফাঁক আমাদের স্বাভাবিক আবৃত্তির ঝোঁকে অনায়াসেই ভরতি হয়ে যায়। ওসব স্থলে স্বভাবতই একটু স্বরের টান এসে যায়। কিন্তু সে টান এত সামান্য যে বিশেষভাবে লক্ষ্য না করলে টের পাওয়া যায় না। এক পর্বে এক মাত্রার বেশি টান না থাকলেই সুশ্রাব্য হয়। (৯০)

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, গিরিশচন্দ্রের ছন্দ আর রবীন্দ্রনাথের মুক্তক ছন্দ ঠিক সমজাতীয় নয়। ছন্দের পদবিভাগে ও যতিস্থাপনে ও দুই ছন্দের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে; তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের ছন্দে প্রবহমানতার দিকে ঝোঁক বেশি এবং গিরিশ ছন্দ অপেক্ষাকৃত কম প্রবহমান। অনেক স্থলেই অনেক কাটা-কাটা গোছের। এই পার্থক্যের কারণও সুস্পষ্ট; পঠিতব্য কবিতা ও অভিনেতব্য নাট্যের প্রয়োজনেই এই ছন্দ দু'জনের হাতে দুইরূপ ধারণ করেছে। (১২৪)

কাব্যের সুনিয়মিত ধ্বনিবিন্যাসরীতিকেই বলে ছন্দ এবং ওরকম ছন্দোবদ্ধ রচনাকেই বলা হয় পদ্য। আর যে রচনায় ওই সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনিবিন্যাসকে স্বীকার করা হয় না তারই নাম গদ্য। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে গদ্যকাব্য অসংকোচে স্বীকৃত হলেও সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে গদ্যরচনার ছন্দ নিরূপণের কোন প্রয়াস দেখিনে। উপনিষদের কাব্য লক্ষণাক্রান্ত গদ্যরচনার কিংবা কাদম্বরী প্রভৃতি সর্বস্বীকৃত গদ্যকাব্যের ছন্দ নির্দেশ কেউ করেছেন বলে জানি না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গদ্যের ছন্দ হচ্ছে ভাবের ছন্দ বা ভাবছন্দ। এই উক্তিটিও হেঁয়ালির মতো বোধ হয়। কেননা ছন্দ কথার সর্বস্বীকৃত ও চিরন্তন অর্থ হচ্ছে কাব্যের ধ্বনিবিন্যাসরীতি। কাজেই ভাববিন্যাস প্রণালীকেও' যদি ছন্দ বলে অভিহিত করা হয়, তাহলে ও শব্দটির অকারণ অর্থসম্প্রসারণ ঘটে এবং সংজ্ঞার্থ নিরূপণ কঠিন হয়ে পড়ে। শুধু যে অকারণে জটিলতা সৃষ্টিই হয় তা নয়; মনের মধ্যে এই সংশয়ও উপস্থিত হয় যে, গদ্য কবিতার ছন্দ যদি বস্তুত ভাব ছন্দই হয় তাহলে কি ওসব কবিতার রচনাভঙ্গিতে ধ্বনিসুষমা একেবারেই নেই। আমাদের মন যদিও বা ভাবছন্দের অনুকূলে রায় দেয়, কান কিন্তু তাতে সায় দেয় না। কেননা আমাদের কানে গদ্য কবিতার রচনাতেও একরকম ধ্বনিসৌষম্য ধরা পড়ে, একথা স্বীকার করব।···

প্রথমেই বলা দরকার যে, যথাযথরূপে ভাবের অনুবর্তন করে ওই কবিতাগুলি সুস্পষ্ট আবৃত্তি করে গেলে আমাদের কান যেন স্বতই প্রসন্ন হয়ে ওঠে, তাতেই বোঝা যায় গদ্য কবিতা একেবারে ধ্বনিরূপহীন নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি গদ্য কবিতার একটা ধ্বনিরূপ আছে বলে অনুভব না করতেন, তাহলে কবি কখনও ওই গদ্যরচনার কথাগুলিকে গাঁটে গাঁটে বিভক্ত করে স্তবকে স্তবকে সাজিয়ে দিতেন না।······তৃতীয়তঃ, অবনীন্দ্রনাথের রচিত কতকগুলি গদ্য কবিতা সম্বন্ধে কবিগুরু মন্তব্য করেছেন, "তার লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষা-বাহুল্যের জন্তে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয়নি।" এর থেকে বোঝা যাচ্ছে গদ্য

কবিতাতেও ভাষাগত অর্থাৎ ধ্বনিগত খানিকটা পরিমাণ রক্ষা হওয়া চাই। অর্থাৎ গদ্য কবিতার ধ্বনিবিন্যাস পদ্যের মত না হলেও একেবারে অপরিমিত নয়। রবীন্দ্রনাথের একটি গদ্য কবিতাতেই ও শ্রেণীর কবিতার ধ্বনিস্বরূপের কথা নিঃসংশয়রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

ওকে আমার কবিতা শোনাবার দাবি সকলের আগে।
আমি বললেম, "সুরসিকে, খুশি হবে না,
এ গদ্যকাব্য।"
কপালে ভ্রূকুঞ্চনের ঢেউ খেলিয়ে
বললে, "আচ্ছা তাই সই।"
সঙ্গে একটু স্তুতিবাক্য দিলে মিলিয়ে;
বললে, "তোমার কণ্ঠস্বরে
গদ্যে রঙ ধরে পদ্যের।"

"ময়ূরের দৃষ্টি"—আকাশপ্রদীপ

ওই যে সুষ্ঠু আবৃত্তিভঙ্গিতে গদ্যেও পদ্যের রঙ ধরানো, অর্থাৎ ছন্দের আভাষ ফুটিয়ে তোলা, ওখানেই গদ্য কবিতার ধ্বনিসৌষ্ঠবগত সার্থকতা (১৭২)

ছন্দ এমন একটা বিষয় যাতে সকলে একমত হতে পারে না। তোমার সঙ্গে একমত হতে পারব এমন আশা করা যায় না। ছন্দ হচ্ছে কানের জিনিস; একেক জনের কান একেক রকম ধ্বনি পছন্দ করে। তাই আবৃত্তির ভঙ্গির মধ্যে এতটা পার্থক্য ঘটে, আমি দেখেছি কেউ কেউ খুব বেশী টেনে টেনে আবৃত্তি করে, আবার কেউ কেউ আবৃত্তি করে খুব তাড়াতাড়ি। কানেরও একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে; আর আবৃত্তি করারও অভ্যাস থাকা চাই। আমি কিন্তু কবিতা রচনার সময় আবৃত্তি করতে করতেই লিখি; এমন কি কোনো গদ্য রচনাও যখন ভালো করে লিখব মনে করি তখনও গদ্য লিখতে লিখতেও আবৃত্তি করি। কারণ রচনার ধ্বনিসংগতি ঠিক হল কিনা তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে কান।

—রবীন্দ্রনাথ (১৭৩)

ছন্দ জিজ্ঞাসা

পয়ার ছন্দের দুর্বলতাই এই যে, ও-ছন্দে প্রতি পংক্তির অন্তে পূর্ণযতি স্থাপন করতেই হবে এবং দুটি মাত্র পংক্তির মধ্যেই একটি ভাবকে সমাপ্ত করা চাই। তাই মধুসূদনের বিদ্রোহী মন পয়ারের এই সংকীর্ণ গণ্ডির বিরুদ্ধে উদ্যত হয়ে

কবির ভাবকে পংক্তির পর পংক্তিতে ছড়িয়ে দিল।...ভাব ও ছন্দের এই প্রবহমানতা (enjamtement)-ই মধুসূদনের বিশেষ দান।...Blank verse-এর বাংলা নাম অমিত্রাক্ষর হতে পারে; কিন্তু অমিত্রাক্ষরতা blank verse-এরও মূল কথা নয়। সুতরাং মধুসূদনের প্রবর্তিত ছন্দের যদি কোনো নাম দিতে হয় তবে তাকে বলা উচিত "প্রবহমান পয়ার" ছন্দ। (১৫০)

তবে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে, তালমানলয়যোগে সুরের ক্ষেত্রে এ ছন্দের লীলা ও মহিমার পূর্ণ প্রকাশ হলেও ছন্দোময় কণ্ঠের আবৃত্তিতেও এর লীলামাধুর্য সম্পূর্ণ অপ্রকাশ থাকে না। তবে সে ক্ষেত্রে ছন্দের পূর্ববিভাগ বাক্-পর্বের অনুযায়ী হওয়া চাই। নতুবা ছন্দের প্রাণবস্তুটাই মারা পড়ে। গানের তাল ছন্দপর্ব বা বাক্‌পর্ব অনুযায়ী না হলেও চলে। য়ুরোপে কোনো জনসভায় একবার একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেছিলেন আমাদের জাতীয় সংগীত "জনগণমন" রচনাটি। কবে কোথায় এখন মনে নেই। এখানে রবীন্দ্রভবনে তার সবাক্ চলচ্চিত্রটি রক্ষিত আছে। তার থেকে আমি কবিকণ্ঠে 'জনগণমন' রচনার আবৃত্তি শুনেছি এবং লক্ষ্য করেছি যে, তাঁর অভিজ্ঞ ও অভ্যস্ত কণ্ঠের আবৃত্তিতে ওই রচনাটির প্রত্যাশিত ছন্দোমাধুর্য অতি সুন্দরভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। আমি অনুভব করেছি যে, অনুরূপভাবে রবীন্দ্রনাথের হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, দেশ দেশ নন্দিত করি, মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন, দ্বিজেন্দ্রলালের পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে প্রভৃতি বহু রচনাই সুনিয়ন্ত্রিত কণ্ঠের আবৃত্তিতে জয়দেবী ছন্দের লীলামাধুর্যে স্বতোবিলসিত হয়ে ওঠে। আমি গীতরসমুগ্ধ শ্রোতা, কিন্তু আমার কণ্ঠে সুর নেই। তাই ছেলেবেলা থেকেই শ্রুতি-সুখের প্রেরণায় আমি ওসব রচনা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করে নিজের কানের রায় নিয়েছি। সে রায় সর্বদাই আবৃত্তির অনুকূলে গিয়েছে। অর্থাৎ ওসব রচনার গীতরসের ন্যায় আবৃত্তিরসেও আমি মুগ্ধ। কিন্তু শুধু ভাবগ্রহণের জন্য এসব রচনা নীরবে পড়া যায় না। ওরকম নীরব পাঠ বীণাযন্ত্রের ঝংকার না শুনে তার রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার মতোই নিরর্থক। কেন না এসব রচনার ভাবরস ও ছন্দোরস বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ (৪৪৫-৭৪৬)।

আবৃত্তি

রাজ্যেশ্বর মিত্র

বহু প্রাচীনকালে আর্যযুগে চৌষট্টি কলার মধ্যে দুটি কলার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে, একটি "সংপাঠ্য" অপরটি "মানসী কাব্যক্রিয়া"। সংপাঠ্য শব্দের অর্থ এমন বিষয় যা সম্যগ্‌ভাবে পাঠ করবার উপযুক্ত। এর সোজাসুজি মানে করলে বর্তমান আবৃত্তি বা Recitation বোঝায়। লোকের মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষভাবে বারবার পাঠ অথবা জ্ঞাপনের জন্য উদ্দেশ্যপূর্ণ পাঠ—এই দুটিই এই শব্দে সূচিত হয়। আবার এর অর্থ সম্মিলিত বা দুজনে মিলে পঠনক্রিয়াও হতে পারে। 'কামসূত্র' নামক গ্রন্থের টীকাকার যশোধর বলছেন—পূর্বনির্ধারিত এক ব্যক্তি একটি গ্রন্থ পাঠ করবে এবং তার সঙ্গে আর একজন ঠিক সেইভাবে সহযোগিতা করবে। "কাব্যক্রিয়া" বলে আরও একটি আর্ট ছিল যাতে উত্তম কাব্যপাঠ বোঝাত। সংস্কৃত টীকায় এই শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে মাত্রা, সন্ধি, সংযোগ, অসংযোগ, ছন্দ, বিন্যাস প্রভৃতি ঠিকভাবে অনুসরণ করে পাঠ করা হলে সেটিকে কাব্যক্রিয়া বলে অভিহিত করা যাবে। শুধু এগুলিই নয়, সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষাকেও এই পঠনের মাধ্যমে স্পষ্ট করে তুলতে হবে। আবৃত্তির ক্ষেত্রে ছন্দ একটি প্রধান বস্তু ; অতএব "ছন্দোজ্ঞান"-ও একটি কলার মধ্যে পরিগণিত হত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আবৃত্তি বস্তুটি আজকের নয়, বহু পূর্ব থেকেই আমাদের দেশে এর প্রচলন ছিল এবং এর প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হত। প্রকৃত পক্ষে "অভিনয়" বস্তুটির মধ্যে আবৃত্তি বিশেষভাবে জড়িয়ে থাকলেও অভিনয় আর আবৃত্তি এক জিনিস নয়। এই দুটি আর্টের মধ্যে প্রভেদ কোথায় সেটি আমাদের বুঝে দেখতে হবে। অভিনেতারাই যে আবৃত্তি-কলার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এমন ধারণা না থাকাই ভাল ; তবে ভাল হবার সুযোগ তাঁদের মধ্যে যে খুব বেশী পরিমাণে আছে তাকে অস্বীকার করবারও উপায় নেই।

অভিনেতাদের কাজ হচ্ছে একটা আখ্যানভাগে কেবলমাত্র তাঁদের অংশটুকু গ্রহণ করা। সেখানে তাঁদের বক্তব্যে যে রসটি নিহিত আছে তাকে গোচর করতে পারলেই তাঁদের কাজের সার্থকতা সিদ্ধ হল। মঞ্চে আরও অনেকে উপস্থিত থাকেন তাঁর পরিপূরক হিসাবে, তাঁরা তাঁদের বক্তব্যগুলি স্থাপন করে একটি দৃশ্যকে কার্যকর করে তোলেন। অতএব অভিনয় একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা যাতে অনেকের সহযোগিতায় একটি বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা হয়। অভিনয়ের মধ্যে অভিনেতার স্থান সঙ্কীর্ণ, কেবল তাঁর অংশটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই কারণে অভিনেতারা সাধারণত এক একটি রসে বিশেষ পারঙ্গম হন। যিনি ভালবাসার অভিনয়ে নিপুণ তাঁকে রোমান্টিক চরিত্রে নিয়োজিত করা হয়, যিনি কুটীল প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে পারদর্শী তাঁকে Villain-এর ভূমিকা দেওয়া হয়। এর ফলে অভিনেতারা এক একজন এক একটি রসে specialise করে থাকেন। তাঁরা যখন আবৃত্তি করেন তখন যদি কাব্যাংশ তাঁদের অভিজ্ঞতার আয়ত্তনে এসে পড়ে তাহলে তাঁরা বিশেষভাবে কৃতকার্য হন, নতুবা তাঁরা আবৃত্তিতে রসসঞ্চার করতে অক্ষম হন। আবৃত্তির টেকনিক সম্পূর্ণ ভিন্ন, এখানে আবৃত্তিকারকে সমগ্র কাব্যটি সবদিক দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে কারণ কাব্যে যতগুলি রস প্রস্ফুটিত হয়েছে সেই সবগুলিকেই তাঁর একক প্রচেষ্টায় ফুটিয়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে এক ব্যক্তির উপর একাধিক অভিনেতার দায়িত্ব এসে পড়ছে। এর পর কাব্যাংশের একটি সামগ্রিক effect আছে যা তাঁকে নিপুণভাবে শ্রোতাদের হৃদয়ে গোচর করতে হবে। অভিনয়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সংলাপগুলি সংযোজিত হয়ে বিষয়-বস্তুকে সম্পূর্ণ করছে। সুতরাং একজন অভিনেতার দায়িত্ব শুধু তাঁর সংলাপটিকে পরিব্যক্ত করা। আবৃত্তিতে এরও অধিক কিছু সংযোজিত থাকতে পারে যা কাব্যের গ্রন্থন কার্যটিকে নির্বহ করে চলেছে। পঠনকার্য যদি সুললিত না হয় তাহলে কবিতা শ্রোতাদের কাছে একঘেয়ে লাগবে। এদিক থেকে আবৃত্তিকারের সাহিত্যবোধ ও কাব্যবোধ অভিনেতার চেয়ে অনেক বেশী গভীর হওয়া দরকার। আসলে আবৃত্তি বস্তুটি মূলত subjective এবং অভিনয় বস্তুটি objective। একটি আমাদের চিন্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অপরটি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত। এই কারণে আবৃত্তিকারকে সার্থকতা লাভ করতে হলে অবশ্যই intellectual হতে হবে, তাঁর স্থান কবিরই পাশে এবং তিনিও একজন স্রষ্টা।

আবৃত্তির লৌকিক ধারা

অরবিন্দ পালিত

নাচ, গান, অভিনয় এঁরা হলেন শিল্পকলার তিন প্রধান শরিক। এনাদের আসর সব সময়েই জমজমাট, হাঁক-ডাক বিস্তর। এনাদের এই জমাটি আসরের পাশে একটি ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। সে কণ্ঠ আবৃত্তির। শিল্পের আঙিনায় আবৃত্তিকে এঁদের সঙ্গে এক আসনে বসাতে গেলে প্রশ্ন উঠতে পারে, আবৃত্তি স্বতন্ত্রভাবে শিল্পের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য কিনা। সাহিত্যরসকে একটু ভিন্নভাবে আস্বাদন করানো ছাড়া তার আর কিছু ভূমিকা আছে কি? বড় জোর না হয় তাকে অভিনয় শিল্পের একজন ছোটখাটো তল্পিবাহক বলা যেতে পারে।

আবৃত্তি সম্পর্কে এই ধরনের ভাবনা প্রশ্রয় পায়, যখনই আমরা তাকে একটি অতি:আধুনিক শিল্পের চেয়ারে নিয়ে বসাই। আবৃত্তির যে একটি লৌকিক ধারা আছে, আবহমানকাল থেকে পিঁড়ির ওপর বসে সে আমাদের শিল্পরস পরিবেশন করে আসছে—সে কথাটা একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। সেখানে সে সাহিত্যের প্রসাধন বা অভিনয়ের তল্পিবাহক নয়। আপন সাম্রাজ্যে সম্রাট। আবৃত্তির সেই লৌকিক ধারা নিয়েই আজকের আলোচনা।

আজকে আবৃত্তির যে রূপ আমরা দেখি, তা নিঃসন্দেহে সাহিত্য-নির্ভর। আগে গোলাম কুদ্দুস কবিতা লেখেন, তারপর শম্ভু মিত্র আবৃত্তি করেন, "ইলা মিত্র"। কিন্তু প্রাচীন যুগে তো তা ছিল না। মিশরে, গ্রীসে, মধ্য এশিয়ায় যে সব সাহিত্যের সূত্রপাত, তাদের আদি উৎস মৌখিক সাহিত্য। প্রায় সব প্রাচীন ভাষার সাহিত্য সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। সভ্যতার অতি প্রত্যূষে লিপি ছিল না। লিপির আবির্ভাব হয় পরে। তখন মৌখিক ধারা থেকে ক্রমে ক্রমে লিখিত সাহিত্যের উৎপত্তি। লিখিত সাহিত্যের ধারা প্রবহমান রাখার গুরুদায়িত্ব প্রথমে ন্যস্ত ছিল পুঁথি বা ঐ জাতীয় বস্তুর ওপর।

মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর সে দায়িত্ব বহন করে আসছে মুদ্রিত গ্রন্থ। কিন্তু লিখিত সাহিত্যের আগের যুগে, যখন মৌখিক সাহিত্য প্রচলিত ছিল তখন সেই ধারাকে বহমান রাখার একমাত্র উপায় ছিল আবৃত্তি এবং সংগীত। আদি কবির প্রথম শ্লোক মুখ-নিঃসৃত, লেখনী-মুখ নিঃসৃত নয়। এইখানেই বোধ করি আবৃত্তির প্রথম জিত। হোমার ইলিয়াড-অডিসি গান গেয়ে শোনাতেন গ্রীসবাসীকে। আর্যরা বেদ-উপনিষদকে উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তির মধ্য দিয়ে বহন করে চলতেন। সেদিন মানব সভ্যতার মননের ফসলগুলি ধারণ করে রেখেছিল আবৃত্তি। সুতরাং সেখানে আবৃত্তির একটা অনন্য ভূমিকা ছিল। সে ভূমিকা গ্রন্থের। আবৃত্তি সেদিন গ্রন্থের ভূমিকা নিয়ে প্রাচীন সাহিত্যকে রক্ষা করেছিল।

এর পরে আসছে প্রাচীন আবৃত্তির শৈল্পিক দিক। শুধুমাত্র বাগ্‌-বিধি, উচ্চারণ, স্বর প্রক্ষেপণ, কণ্ঠস্বর এবং শ্রুতি—এর সাহায্যে প্রাচীন সাহিত্যকে সে যুগের আবৃত্তি রক্ষা এবং বহন করেছিল। স্থানে স্থানে অবশ্য সুরের সাহায্যও নেওয়া হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, চোখের সামনে (এমন কি কল্পনায়ও) কোন বইয়ের অস্তিত্বও ছিল না। 'শ', 'ষ', 'স' কিংবা 'র' বা 'ড়', 'র-ফলা', 'ঋ-ফলা', এবং 'য' এবং 'জ'—সবই রূপ পরিগ্রহ করত কেবলমাত্র উচ্চারণের সাহায্যে। স্বর-প্রক্ষেপণের উদ্দেশ্য ছিল, শ্রুতির মধ্যে শব্দটিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যাতে স্মৃতির পটে শব্দের ছবিটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর কণ্ঠস্বরকে নিশ্চয়ই এমন হতে হত যাতে তা শ্রুতিমধুর হয়ে স্মৃতির দরজায় পৌঁছয়। সবার ওপরে ছিল বাগ্‌-বিধি যা একান্তই কথন এবং শ্রবণের উপযুক্ত। তার অলঙ্কার এবং ঝঙ্কার কথন এবং শ্রবণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এগুলি সম্মিলিত-ভাবে ভাবকে বহন করে নিয়ে যেত সৌন্দর্যের আস্বাদন তথা রস উপলব্ধিতে যেটা শিল্পের মৌলিক আবেদন। তাই তো আবৃত্তিকে শিল্পের আঙিনায় নিয়ে বসাতে দ্বিধা হয় না।

আবার দেখুন, খ্রীস্টের জন্মের পাঁচ থেকে সাত হাজার বছর আগে মিশরে এক ধরনের story teller ছিল। এরা সাধারণত হাট-বাজারের কাছাকাছি কোথাও গিয়ে বসত। সওদা কেনা-বেচার শেষে হাটের মানুষেরা এদের চারধারে সমবেত হত গল্প শোনার লোভে। অবশ্যই সামান্য কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে। রূপকথা, উপকথা, নানা রকমের লোককথা থাকত এদের ভাঁড়ারে। আর থাকত সেগুলি পরিবেশন করার উপযুক্ত বাচনভঙ্গি, সুললিত কণ্ঠস্বর, মুখভঙ্গি ইত্যাদি। অর্থাৎ বাচিক এবং কায়িক দুরকম

অভিনয়েরই সুযোগ ছিল এইসব কথক মশায়দের। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি বেদ উপনিষদের প্রজ্ঞা যেমন আবৃত্তি ধারণ করেছিল, তেমনি আবার সাধারণ মানুষের চিত্ত-বিনোদনের ধারাটিকেও আবৃত্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। সিনেমা-থিয়েটার, রেডিও-টি-ভি এদের একমাত্র প্রাচীন প্রতিভূ ছিল আবৃত্তি। আজকাল কথায় কথায় আমরা Mass Communication medium বা গণ-সংযোগ মাধ্যমের উল্লেখ করি। সেই প্রাচীন যুগে আবৃত্তিই ছিল প্রকৃত-পক্ষে জন-সংযোগ মাধ্যম। আর এই মাধ্যম দীর্ঘ দিন ধরে ইতিহাসের পাতায় নিজের স্বাক্ষর রেখে এসেছে।

আমাদের দেশে আবৃত্তির যে লৌকিক রূপগুলি প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল ব্রতকথা। আমাদের দেশে মেয়েদের নানা রকম ব্রত ও আচার পালন করতে হত। এই ব্রতগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের শেষে ঐ বিশেষ ব্রতের যে ব্রতকথাটি আছে তা আবৃত্তি করা ছিল অবশ্য-পালনীয় ('ছিল' বলার কারণ এই ব্রতাচারগুলি ক্ষীয়মাণ)। এগুলি আবৃত্তি না করলে ব্রত সম্পূর্ণ হত না। ব্রতকথাগুলি ধর্মীয় আচারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ফলে এগুলির প্রচার ছিল বহুল। আবার ধর্মীয় কারণে এবং স্ত্রী-সমাজ কিছুটা রক্ষণশীল বলেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এগুলির বিশেষ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয়নি। এগুলি গদ্যে রচিত এবং নারীকণ্ঠবাহিত।

ব্রতকথাগুলি ছিল প্রমীলা রাজ্যের ব্যাপার। এই জন্য এগুলির মধ্যে নারীজীবনের নানা ব্যক্তিগত ঐহিক কামনার অভিব্যক্তি দেখা যায়। স্বামী, সংসার, সন্তান, স্বাচ্ছন্দ্য—সাধারণ মেয়েদের সব কামনা বাসনাই প্রতিফলিত। ভাদ্রমাসের লক্ষ্মী পূজোর কথায় পাই—"এক দেশে এক বিধবা বামনী সুতা কেটে কোন রকমে অতি কষ্টে শাক-ভাত খাইয়ে তার ছোট ছেলেটিকে মানুষ করত।" কথার শেষে দেখি, "তখন রাজা............নিজের মেয়ের সঙ্গে বামনীর ছেলের খুব ঘটা করে বিয়ে দিলেন"। মূলা ষষ্ঠীর কথায় দেখবেন, "এক দেশে এক বামুন ছেলে বউ নিয়ে বাস করত। একদিন বামুনের বড্ড মাংস খাবার ইচ্ছে হল।" এমনি ছোট বড় অনেক ঐহিক কামনাই প্রতিফলিত হয়েছে ব্রতকথায়।

ব্রতকথার গদ্য লক্ষ্য করবার মত। তখনও লেখ্য গদ্যের চল হয়নি। কিন্তু গদ্যের যে মৌখিক ঐতিহ্য প্রচলিত ছিল তা ঋজু, দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ। ক্ষেত্র-ব্রতের কথায় দেখুন, "এক দেশে এক গরীব ব্রাহ্মণ ছিল, সে হঠাৎ মারা যায়। ব্রাহ্মণী তখন তার ছোট পাঁচ বছরের ছেলেটিকে নিয়ে ভায়ের কাছে

এল।" এ যেন শরৎবাবুর উপন্যাসের পটভূমি, ছোট ছোট তিনটি বাক্যে সেরে দেওয়া হল। আর বাক্যের গঠন দেখুন। কোন অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় শব্দ নেই, অলঙ্কার বাহুল্য নেই (শুধু শেষ বাক্যে 'ছোট' শব্দটি অতিরিক্ত)। এই গদ্য আবৃত্তির সময়ে স্পষ্ট এবং স্বচ্ছন্দ উচ্চারণের প্রয়োজন।

ব্রতকথা আবৃত্তির একটি বিশিষ্ট অলঙ্কার হল ব্রতকথার সরল বচন মাধুর্য এবং তার গদ্য ছন্দ। দশপুত্তল ব্রতে যখন কুমারী মেয়েরা সমস্বরে আবৃত্তি করে—"এবার মরে মানুষ হব, রামের মত পতি পাব। এবার মরে মানুষ হব, সীতার মত সতী হব। এবার মরে মানুষ হব, লক্ষ্মণের মত দেবর পাব। এবার মরে মানুষ হব, দশরথের মত শ্বশুর পাব।" তখন যেন সেগুলি মন্ত্রের মত ছন্দোময় হয়ে ওঠে।

একটি বর্ণনামূলক অংশ দেখুন—"এক রাজা ছিলেন, তাঁর সো আর দো দুই রানী ছিলেন। রাজা দোরানীকে মোটেই ভালোবাসতেন না। এমন কি তাঁর মুখ পর্যন্ত দেখতেন না। রাজার এইরকম ব্যবহারে দোরানী মনের দুঃখে রাজবাড়ী ছেড়ে বাগানে গোয়ালঘরে গিয়ে রইলেন।"

এ একেবারে ঠাকুরমার কণ্ঠে বাচিক অভিনয় সমন্বিত আবৃত্তি। ব্রতকথার আবৃত্তিতে পুরুষ কণ্ঠের কোন সুযোগ নেই।

ব্রতকথার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সংলাপ। ব্রতকথা মেয়েরাই আবৃত্তি করতেন বলে ব্রতকথার মধ্যে যে সব সংলাপ এসে পড়েছে সেগুলি নেহাতই মেয়েলি। অত্যন্ত ঘরোয়া তার রূপ ; তার মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার অন্তঃপুরের রূপটি চমৎকার ফুটে উঠেছে। জয় মঙ্গলবারের ব্রতকথায় আছে—একদিন মা মঙ্গলচণ্ডী এক বুড়ী বামণীর বেশ ধরে বেনের বাড়ী ছলতে গেলেন। গিয়ে বললেন, "ওমা দুটি ভিক্ষে দাও গো।" বেনে বউ তাড়াতাড়ি সিধে সাজিয়ে ভিক্ষে দিতে এলো। বামণী জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কয় ছেলে, কয় মেয়ে মা?" বেনে বউ বলল, "আমার সাত মেয়ে মা, ছেলে নেই।" বামণী বললেন, "আমি ছেলে-আঁটকুড়োর মুখ দেখি না। আর মেয়ে-আঁটকুড়োর ভিক্ষে নিই না।"

লক্ষ্য করুন, এ ধরনের সংলাপ "পাঠ" করা যায় না। অভিনয়ের সুযোগ এতে রয়েছে। ব্রতকথার যে বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা হল, তাতে একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ব্রতকথা কেবলমাত্র গড়গড়িয়ে 'রিডিং' পড়ে গেলেই চলত না। ব্রতের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে একজন অন্তঃপুরিকা ব্রতকথাগুলি আবৃত্তি করতেন। বাকিরা শুনতেন। সুতরাং যাঁর ওপর পড়বার দায়িত্ব

থাকত, তিনি বাচিক অভিনয় করবার কি চমৎকার সুযোগ পেতেন। আর তাঁর জনপ্রিয়তা নির্ভর করত, তাঁর আবৃত্তির ক্ষমতার ওপর।

কালের স্রোতে ব্রতকথার গদ্য কিছু কিছু পদ্যছন্দে রূপান্তরিত হয়েছিল। তার প্রধান কারণ, সমস্বরে আবৃত্তিতে মাত্রা এবং যতি নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা। যেমন :

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুর বেলা।
আমি সতী লীলাবতী
সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী॥

বা:
আমি দিই পিটুলীর বালা।
আমার হোক সোনার বালা॥
আমি দিই পিটুলীর নথ।
আমার হোক সোনার নথ॥

ধীরে ধীরে ব্রতকথাগুলি লিখে রাখবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। যেহেতু তখন বাংলা গদ্যের কোন লিখিত রূপ ছিল না, তাই এগুলি পদ্যেই লেখা হল। ব্রতকথার এই পদ্যরূপের নাম পাঁচালী। অবশ্য পাঁচালী কথাটি আরও নানা অর্থে উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায়, "সাধারণভাবে এ কথা এখানে বলা যাইতে পারে যে, আখ্যায়িকামূলক পদ্য রচনাকেই মধ্যযুগে পাঁচালী বলিত। সেই অর্থেই ব্রতকথার পদ্যরূপকে পাঁচালী বলা হইলেও কালক্রমে ইহা একটি বিশিষ্টার্থ লাভ করিয়াছে—তাহা সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী এবং ত্রিনাথের পাঁচালী।"

ব্রতকথার এই পাঁচালীতে রূপান্তরে আবৃত্তির ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচিত হল। পাঁচালী আবৃত্তিতে আমরা পদ্যের বাঁধাধরা একঘেয়ে ছন্দের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। গদ্যের ছন্দ, সুর, বিশেষ করে কথা বলার যে বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী অর্থাৎ বাচিক অভিনয়, তার থেকে সরে এসে আবৃত্তির ধারা বইতে লাগল পয়ার-ত্রিপদী বা পাঁচালী-লাচাড়ীর বাঁধা খাতে। পাঁচালী লিখতেন পুরুষেরা। সুতরাং সেই প্রমীলার রাজ্য থেকে আবৃত্তি এসে পড়ল বার মহলে। বিষয়বস্তু বদলালো। সত্যনারায়ণ, শনি, ত্রিনাথ এঁরা সকলেই পুরুষের বহির্মুখী জীবনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থেকে পুরুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। সুতরাং এইসব পাঁচালীতে বহির্মুখী জীবন বা সামাজিক জীবনের প্রভাব এরে.

পড়ল। পাঁচালী আবৃত্তির আর একটি বৈশিষ্ট্য, পুরুষ কণ্ঠে আবৃত্তির সুযোগ এলো।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে জনসমাবেশে ভক্তিমূলক গ্রন্থ বা ধর্ম-গ্রন্থ পাঠের রেওয়াজ ছিল। যেখানে দেশের অধিকাংশ জনগণই নিরক্ষর, সেখানে ধর্ম-ই বলুন, ভক্তি বলুন, বা যে কোন রকমের জনশিক্ষাই বলুন, তাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বাহক ছিল গ্রন্থপাঠের আসর তথা আবৃত্তি। আবার জনগণের মনোরঞ্জনেরও একটি বাহক আবৃত্তি। রামায়ণ পাঠ সেই মধ্যযুগ থেকে আজ অবধি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। তবে এ আবৃত্তি পদ্য-ছন্দের পুনরাবৃত্তিতে আবদ্ধ। কখনও কখনও কথক ঠাকুর ব্যাখ্যার আশ্রয়ে আবৃত্তিকে আরও সরস করে তোলেন। ভারতবর্ষের সুদূর পূর্বসীমান্তে মনিপুরের গ্রামাঞ্চলে যান। সেখানে এখনও দেখবেন 'ওয়ারি লিবা'র আসর বসেছে। এ আসরে পাঠ হচ্ছে রামায়ণ-মহাভারত। কথকঠাকুর তাকিয়া নিয়ে সেই পরিচিত ভঙ্গিতে বসে রয়েছেন। নতুনত্বের মধ্যে মাইক্রোফোন রয়েছে কথকঠাকুরের সামনে। আর ব্যাখ্যার মাঝে মাঝে কথকঠাকুর ছুঁড়ে দিচ্ছেন দু'একটা আধুনিক শব্দ, যেমন—"যুধিষ্ঠির ভেরী গুড বয়—" কিংবা "ভীম দারা সিং অফ মহাভারত" ইত্যাদি। শ্রোতারা হেসে লুটিয়ে পড়ছে। আবার "লাইরিক হাইবা"র (LAIRIK HAIBA) আসরে যান। সেখানে পাঠ হচ্ছে চৈতন্য চরিতামৃত। শ্রীচৈতন্যকে তাঁর নিজের দেশের লোক যতটা মনে রেখেছে, তার থেকে বোধহয় বেশী মনে রেখেছে মনিপুর।

একটু শিক্ষিত মহলে চণ্ডীপাঠের বেশ আদর ছিল। অবশ্য সংস্কৃত চণ্ডীপাঠ অনেকেই বুঝতেন না। তাই পাঠক এখানেও ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতেন। বিবর্তনের ধারায় এই চণ্ডীপাঠ এবং তার বাংলা ব্যাখ্যা পরিমার্জিত হয়ে বর্তমানে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের দ্বারা একটি বিশিষ্ট আবৃত্তির রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এর পরে আমরা আলোচনা করব ছড়া নিয়ে। ছড়া আবৃত্তির এমন একটি সহজ সাদাসিধে রূপ যে তাকে হঠাৎ আবৃত্তি বলে চেনাই যায় না। কিন্তু আবৃত্তির যেগুলি প্রাথমিক প্রকাশ মাধ্যম অর্থাৎ ছন্দ, ধ্বনি, ভাব, এগুলি ছড়াতেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

যেমন ধরুন ছন্দ। গদ্য থেকে তখন পদ্যে রূপান্তর চলছে। তাই ছড়ায় দেখা যায় গদ্যের গায়েই যেন ছন্দের দোলা লেগেছে। যেমন :

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে।
ওপারেতে ছেলে মেয়ে নাইতে নেমেছে॥

যেন গঙ্গই কর্তা, ক্রিয়াকে নিজের নিজের জায়গায় শক্ত করে বেঁধে ছন্দের দোলনায় চড়ে দুলছে। এরই পরিণতি হল 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'-তে। সেই ক্রিয়াপদে পংক্তি শেষ।

ছড়ার পংক্তিতে পংক্তিতে ধ্বনির বৈচিত্র্য। ওপারেতে কালো রং/বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌—থেকে শুরু করে প্রকৃতির অসংখ্য শব্দ জড়ো হয়েছে ছড়ার ভাঁড়ারে। যেমন,

হৈ রে বাবুই, হৈ, রাঙা ধানের খৈ,
খোকামণির বিয়ে দেবো, পয়সা-কড়ি কৈ ?

এ যেন নদীর বুকে মাঝির হাঁক ভেসে চলেছে। কিংবা :

আগ্‌ডোম বাগ্‌ডোম ঘোড়াডোম সাজে
ঢাক মেঘর ঘাঘর বাজে।

—যেন টগবগ টগবগ করে ঘোড়া চলেছে চতুরঙ্গ সেনার সঙ্গে। ছড়ায় ভাবের সৌন্দর্যও আছে।

হলুদ বনে বনে
নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে
সুখ নেইকো মনে।

—যেন চিরকালের কিশোরী দুর্গা নাকছাবিটি হারিয়ে নিশ্চিন্দিপুরের বনে জঙ্গলে মনের দুঃখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ছড়া ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গও হয়ে উঠেছে। উত্তরবঙ্গের মহারাজা ঠাকুর, পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের ধর্ম ঠাকুর বা শিব ঠাকুরের পূজা উপলক্ষে লৌকিক ছড়া আবৃত্তি করা হয়ে থাকে। এই ছড়াগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজজীবনের প্রচুর উপকরণ বিদ্যমান।

ছড়া আলোচনা প্রসঙ্গে আরও দু একটা উদাহরণ হাতের কাছে এসে যাচ্ছে। ওড়িষায় এক ধরনের কবির লড়াই প্রচলিত আছে। এ হল দু-দল কবির মধ্যে প্রশ্ন উত্তরের লড়াই। প্রশ্ন এবং উত্তর সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করতে হবে কবিতার ছন্দে। কবিতার বিষয়বস্তু সব কিছুই হতে পারে। মেঘালয়ে হাসি উপজাতির মধ্যে এই ধরনের একটা খেলা প্রচলিত আছে। দু-দল ছেলেমেয়ে দুই প্রতিপক্ষ দল হবে এবং তাদের মধ্যে চলবে তাৎক্ষণিক কবিতায় প্রশ্ন উত্তরের লড়াই। বিষয়বস্তু সাধারণ জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ছড়া প্রসঙ্গে এ'কথাটা মনে এলো তার কারণ এইসব কবিতা আদৌ কবিতা পদবাচ্য হয়ে ওঠে না। বরং এতে ছড়ার ছন্দ এবং ধ্বনি-বৈচিত্র্যই বেশী করে ফুটে ওঠে।

আবৃত্তির আর একটি লৌকিক ধারার উল্লেখ করে আজকের আলোচনা শেষ করি। বিস্তৃত অতীত থেকে এর যাত্রা শুরু। এ-ও গল্প—বর্ণনা, সংলাপ, ছন্দ সমন্বিত। সেই কবে—"এক যে ছিল রাজা।......রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ঘড়া ভরা মোহর।......কিন্তু রাজার মনে সুখ ছিল না—" সেই দুঃখের কথা আজও প্রবহমান। রাজপুত্র এখনও তেপান্তরের মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাঙমা ব্যাঙমীর গল্প শোনে, আর রাজকন্যার উদ্ধারের স্বপ্ন দেখে।

ঠাকুরমার কণ্ঠ আজও শিশুদের সেই চিরকালের রূপকথার রাজ্যে নিয়ে যায়। আবৃত্তির ইতিহাস আছে। আর তা আছে এই লৌকিক ধারার মধ্যে।

বাংলার প্রথম আবৃত্তিকার কবি

অরুণকুমার বসু

আধুনিক বাংলা কাব্যের সূচনা হয়েছিল ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর পরিচয় ও আত্মিক ঘনিষ্ঠতার ফল হিসেবে, এই ঐতিহাসিক সত্যটি আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু শুধু বিদেশী ভাষার কাব্য-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগবশতই বাংলা কবিতার রূপান্তর ঘটেনি। ইংরেজি কবিতার আবৃত্তি শুনে উনিশ শতকের ইংরেজি-শিক্ষিত তরুণ বাঙালী ছাত্ররা অভিভূত হতেন। সেই আবৃত্তির উদাত্ত-অনুদাত্ত ধ্বনিস্পন্দ, সেই আবৃত্তির গাম্ভীর্য-মাধুর্যই ইংরেজি কাব্যকবিতাকে আমাদের কাছে আরো সমাদরণীয়, আরো প্রিয়, আরো চিত্তগ্রাহী করে তুলেছিল। সে পর্বে যেসব বিদেশী শিক্ষাব্রতী কলকাতায় বাঙালী ছাত্রদের ইংরাজি সাহিত্যের পাঠ দিতেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রতিভাসম্পন্ন আবৃত্তিকার ছিলেন। তাঁরা শিক্ষাকক্ষে কাব্যপাঠের শুষ্ক নীরস অধ্যায়টিকে রীতিমত আবৃত্তির শিল্পমঞ্চে পরিণত করার নিপুণ আর্ট জানতেন। ইতিপূর্বে কবিতাকে আবৃত্তির পাদপীঠে স্থাপিত করে কবিতার শিল্পরূপকে এমনভাবে শ্রোতার সামনে তুলে ধরার বিদ্যা আমাদের অনায়ত্ত ছিল। ভারতচন্দ্র হয়ত সেই আবৃত্তিবিদ্যার চর্চায় কিছুটা দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তা পুরনো বাংলা কাব্যের ধারায়। নতুনকালে ইংরেজি কবিতার আবৃত্তিই বাংলা কবিতার জন্মান্তর ঘটাল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতার তরুণ প্রতিভাশালী ছাত্রদের সামনে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তির উচ্চ শিল্পসম্মত আদর্শ তুলে ধরেছিলেন যে-সব শিক্ষক তাঁদের মধ্যে ডিরোজিও-র নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ডিরোজিও ছিলেন নিতান্ত তরুণ অধ্যাপক। জন্মে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত এবং মনে-প্রাণে কবিও। ডিরোজিও যে আশ্চর্য কবিত্ববোধদীপ্ত কণ্ঠে অসামান্য আবৃত্তি করতেন তার বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ সেকালের প্রত্যক্ষশ্রোতৃ মনীষীমহল থেকে পাওয়া গেছে। ইংরেজি ও

অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় কবিতাপাঠ ও কাব্য-আবৃত্তির একটি অনুচিকীর্ষু আদর্শ তুলে ধরেছিলেন ডিরোজিও তাঁর গুণমুগ্ধ অভিভূত ছাত্রদের সমক্ষে। তিনি শুধু বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক বা রীতিদ্রোহী নাস্তিক আধুনিক ছিলেন বলেই নবচেতনার ইতিহাসে স্মরণীয় নন, তিনি নিজে ছিলেন কবি। তাঁর সেই কবিত্বের আভা কবিতা-আবৃত্তির উৎকণ্ঠার মাধ্যমে অন্তত একজন বাঙালী কবিকে প্রোজ্জ্বল করেছিল। যাঁর নাম মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কর্কশ ছিল বলে তাঁর জীবনীকার কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সম্ভবত সেটা বয়সের অমিতাচারের কারণে, অপেক্ষাকৃত পরিণত জীবনে। যৌবনে তিনি নিশ্চয় আবৃত্তিযোগ্য কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রিয় কবি তখন বায়রন এবং কেনা জানেন, বায়রনের কবিতা অনুচ্চকণ্ঠে ক্ষীণস্বরে ধীর অশ্রুতপ্রায় তানলয়ে উচ্চার্য নয়। মধুসূদন ইংরেজি কবিতা নিয়মিত আবৃত্তি করতেন। এই আবৃত্তির প্রেরণাতেই তিনি প্রথম বয়সে ইংরেজিতেই কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। আয়াম্বিক পেন্টামিটার তাঁর প্রিয় আবৃত্তি-ছন্দ ছিল। ডিরোজিও-র আবৃত্তি তাঁকে কী পরিমাণে অভিভূত করেছিল, তার প্রমাণ পাই ডিরোজিও-র লেখা 'ফকির অফ জাঙ্গীরা' কাব্যের অনুকরণে লেখা মধুসূদনের কিছু তৎকালীন ইংরেজি কবিতায়। ডিরোজিও লিখেছেন :

My country ! in the days of glory past
A beauteous halo circled found thy brow,
And worshipped as a deity thou wast.
Where is that glory, where that reverence now ?

এই সম্বোধনাত্মক ভঙ্গি, এই আবেগগর্ভ জিজ্ঞাসা বিস্ময় ও বেদনাবোধ যেন কবির আবৃত্ত কণ্ঠের উচ্চাবচ ধ্বনিপ্রবাহকেই আমাদের শ্রুতিতে বাজিয়ে তোলে। চরণগুলি শুনলেই মনে হয় কবি যেন আবৃত্তি করতে করতেই এগুলি রচনা করেছেন। মধুসূদনের 'কিং পোরাস—এ লিজেণ্ড অফ ওল্ড্'-এর ছত্রগুলিও সেই আবৃত্তিযোগ্যতারই অনুরণন মাত্র :

And where art thou fair freedom ; thow
Once goddess of Ind's sunny clime ;
When glory's halo 'round her brow
Shone radiant, and she rose sublime.…

মধুসূদনের কবিতায় এই সম্বোধনাত্মক ভঙ্গি, সমগ্র দেশের বিগত গৌরবমহিমার জন্য এই মন্দ্রগম্ভীর খেদোক্তি নির্ভুল নিশ্চিতভাবে আবৃত্তিশোভন উদার-উদাত্ত

একটি কবি-কণ্ঠস্বরকেই নিঃশব্দে বাজিয়ে তোলে।

উনিশ শতকের কলকাতায় ইংরেজি সাহিত্যের আর একজন অধ্যাপক ডি এল রিচার্ডসন, অসাধারণ আবৃত্তির আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, বিশেষত শেক্সপীয়র-এর নাট্যকাব্যাংশের। নানা প্রত্যক্ষদর্শীর তথ্য থেকেই আমরা জানতে পারি, তাঁর শেক্সপীয়র পাঠ ও আবৃত্তি ছিল অতুলনীয়। শোনা যায় স্বয়ং মেকলে সাহেব তাঁর আবৃত্তি শুনে বলেছিলেন, "আমি ভারতবর্ষের সব-কিছু ভুলিতে পারি কিন্তু আপনার শেক্সপিয়র আবৃত্তি ভুলিতে পারি না।" রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে এসব কথা লিখেছেন। রিচার্ডসন শুধু পড়াতেন না, ছাত্রদের আবৃত্তি শেখাতেন, ভালো আবৃত্তি শোনা ও শেখার জন্য নাট্যশালায় যেতে উৎসাহিত করতেন। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, "তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা আবৃত্তি-বিদ্যা শিখিবার প্রধান স্থল নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন, তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত।" মধুসূদনের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুও জানাচ্ছেন, "যে গ্রন্থ তিনি অধ্যাপনা করিতেন, তাহার দুরূহ অংশসমূহ তিনি এরূপ নৈপুণ্যের সহিত পাঠ করিতে পারিতেন যে, তাহার একবার আবৃত্তিমাত্র ছাত্রদিগদের অনেকস্থলে অর্থগ্রহ হইত। সে সময়কার অনেক প্রসিদ্ধ রঙ্গশালার অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাঁহার নিকট সেক্স্‌পীয়র আবৃত্তি সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিতেন।"

কবিতা সম্বন্ধে রিচার্ডসনের মনোভাব ছিল খুবই আধুনিক, আর কবিতা আবৃত্তি করলেই কাব্যের তাৎপর্য শ্রোতার চিত্তে সঞ্চারিত হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। আবৃত্তিশিল্পী ছিলেন বলেই রিচার্ডসন বলতেন, "কবিতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে তুলে দিতে পারে। জগতের পরিচিত সাধ-আহ্লাদের অতীত এক চিরন্তন অভিনব আনন্দস্বর্গে উন্নীত করতে পারে। এ যেন এক ধরনের ধর্মই—কবিরাই প্রকৃতির পুরোহিত।" শুধু কাব্য-পাঠের দ্বারা যে তা সম্ভব নয়, কবিতাকে মন্ত্রের মতো যথাযথভাবে আবৃত্তি করলেই তবেই যে কবিতা দিব্যশক্তি লাভ করতে পারে, এই ছিল রিচার্ডসনের বিশ্বাস ও সাধনা। তাই "তাঁহার সুললিত কবিতায় ও হৃদয়গ্রাহিণী আবৃত্তিতে তাঁহার ছাত্রগণের হৃদয় সহজেই মুগ্ধ হইত।" সেই একটি মুগ্ধ ছাত্রের হাতেই বাংলা কবিতার নবজন্ম ঘটল, আবৃত্তিযোগ্য বাংলা কবিতার প্রথম কবি সেই মধুসূদন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কবিতা আবৃত্তি করার উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষা থেকেই মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কার, প্রবর্তন, প্রয়োগ ও প্রচলন ঘটাতে পেরেছিলেন। কারণ অমিত্রাক্ষর নীরব পাঠের ছন্দ নয়, বাংলার প্রথম আবৃত্তির ছন্দ। ঈশ্বর গুপ্ত মদনমোহন মনোমোহন পাঠ্য কবিতার পদ্যকার ছিলেন। ইংরেজি কবিতার আবৃত্তির আদর্শে তাঁরা বাংলা কবিতা লিখতে শেখেননি। তাঁদের কাব্যের যমক-পান-অনুপ্রাস-শ্লেষ-শব্দালংকার, কুরুচি-গ্রাম্যতা-কুৎসা-উত্তেজনা-রসিকতা সবটাই ছিল প্রধানত দৃষ্টিসুখের, অংশত শ্রুতিসুখের। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও বাংলা কবিতায় সেই মধ্যযুগীয় পাঠ্য-রীতির স্টাইলই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের কবিতায় কণ্ঠস্বর ছিল না। রঙ্গলালও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

মধুসূদনই একালের কবিদের মধ্যে প্রথম আবৃত্তিকার। আবৃত্তির আদর্শেই তিনি নাটকে প্রথম আবৃত্তির ছন্দ ব্যবহারের কথা চিন্তা করে অমিত্রাক্ষর ছন্দ উদ্‌ভাবন করেছিলেন। অর্থাৎ এমন ছন্দ যা অভিনেতারা শ্রোতাদের সম্মুখে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করবেন, যে ছন্দের উচ্চারিত ধ্বনিপ্রবাহের উচ্চাবচতায়, মনোভাবের বিচিত্র তরঙ্গগুলি দোল খাবে। রিচার্ডসনের আবৃত্তি এবং নাট্যাভিনেতাদের আবৃত্তি শেখানোর অভিপ্রায় সার্থক হল। গোড়া থেকেই মধুসূদন বুঝেছিলেন যে, কৃত্রিম গদ্যে বা তৎসম শব্দবহুল আড়ষ্ট গঠনের বাক্য দিয়ে অভিনয় অশোভন, অনুপযুক্ত। অমিত্রচ্ছন্দের প্রয়োজনীয়তা নাটকের জন্যই অনুভূত হয়েছিল তাঁর মনে, অর্থাৎ অভিনেতা কণ্ঠে আবৃত্তির জন্য। কবির গুণগ্রাহী মহারাজা যতীন্দ্র-মোহনকে তিনি বলেছিলেন, "যতদিন বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন না হইবে ততদিন বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে বিশেষ কোনো উন্নতির আশা নাই।" যতীন্দ্রমোহন এতে সংশয় প্রকাশ করে সম্ভবত মধুসূদনের উদ্যম ও সম্ভাবনাকেই আরো ত্বরান্বিত ও বিধিবদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন। মধুসূদন অবশেষে পেয়েই গেলেন সূত্র, বললেন, "আমাদিগের ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ হইতে পারে কিনা আমি আপনাকে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে প্রস্তুত আছি।" অনুমান হয়, এই ঘোষিত সংকল্পের পূর্বেই তাঁর একক কণ্ঠের আত্মমগ্ন আবৃত্তিতে এই নতুন প্রবর্তব্য ছন্দের আভাস ধরা দিয়েছিল। তারপর এল পদ্মাবতী, অমিত্রচ্ছন্দের প্রথম পরীক্ষা এবং তারই আবৃত্তি-কবিতার চেহারায় এল তিলোত্তমা। তিলোত্তমা-সম্ভবই বাংলার প্রথম আবৃত্তিযোগ্য কাব্য।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এই অর্থেই বৈপ্লবিক যে, এই ছন্দই বাংলা কবিতাকে পাঠের ভূমি থেকে আবৃত্তির আকাশে মুক্তি দিল। মিল-গ্রথিত চরণে সমাপ্য

বাক্যে বন্দী পদ্য কেবল পাঠযোগ্য কবিতা ছিল, আবৃত্তির কোনো সম্ভাবনা তাতে ছিল না। অমিত্রাক্ষর ছন্দই নিছক একঘেয়ে পাঠের দাসত্ব থেকে কবিতাকে মুক্তি দিল। সে মুক্তি চরণের শৃঙ্খল ভেঙে ক্রীতদাসকে স্বাধীনতা দেওয়ার মতই বৈপ্লবিক।

আবৃত্তিপটু মধুসূদনই সেই বিপ্লবের অগ্রদূত। তাই তিনিই বাংলার প্রথম আবৃত্তিশিল্পরুচির কবি।

আবৃত্তি প্রসঙ্গে শ্রীশম্ভু মিত্র : একটি সাক্ষাৎকার

প্রস্তাবনা : নমস্কার ! আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রীশম্ভু মিত্র মহাশয়কে প্রথমেই জানিয়ে দিই যে, বহুকাল পরে এরকম আবৃত্তির আসরে তাঁকে পেয়ে আমরা সকলেই আনন্দিত হয়েছি ।

শম্ভুদা যখন আবৃত্তির জগতের সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রেখেছিলেন, সে সময়টা ছিল আমাদের প্রায় উদ্ভিন্ন যৌবনের কাল । তারপর যতই দিন যেতে লাগল আবৃত্তির জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে তিনি নাট্যপ্রযোজনা ও অভিনয়ের জগতে বেশী করে যুক্ত হয়ে পড়লেন, ফলে তাঁর কণ্ঠে আমরা আবৃত্তি ক্রমশই কম ক'রে শুনতে লাগলাম । তারপর এখন বলতে গেলে তো অভিনয় জগৎ থেকেও তিনি প্রায় অবসর গ্রহণ করেছেন, অভিনয় করেন কালেভদ্রে, সেটাও আমরা পাই না । সুতরাং একালের যাঁরা যুবক তাঁদের পক্ষে এরকম মুখোমুখি বসে তাঁর কণ্ঠে আবৃত্তি শোনা সম্ভব হয়েছে ব'লে তো আমার মনে পড়ছে না । আগেই বলেছি, আমরাই তাঁর আবৃত্তি শুনেছি আমাদের প্রথম যৌবনে, আর এখন তো আমাদের চুলে পাক ধরেছে, বয়েস হয়েছে ।

বছরখানেক ক্রমাগত লেগে থেকে এই আসরে আবৃত্তি করবার জন্ম তাঁকে রাজী করাতে পেরেছি ।

['আমার বদনাম করা হচ্ছে' শম্ভুবাবুর এই সরস মন্তব্যে শ্রোতৃমণ্ডলী হেসে ওঠেন ।]

আমরা যারা একটু-আধটু আবৃত্তি-চর্চা করি, আমাদের আবৃত্তি করার এই আকাঙ্ক্ষা বা আবৃত্তি করার এই নেশার উৎস খুঁজতে গেলে যে মানুষটির কাছে আমরা পৌছে যাই তিনি শ্রীশম্ভু মিত্র ।

একসময়ে তিনি মাঠে ময়দানে আবৃত্তি ক'রে বেড়িয়েছেন, তারপর দীর্ঘকাল কোনো সংযোগ নেই । এতদিন বাদে আজকে যখন আমরা তাঁকে কাছে পেয়েছি, তখন প্রথমেই শুনতে চাইছি সেই কবিতাগুলো

যেগুলো অতীতে তাঁর কণ্ঠে বহুবার শুনেছি।

শম্ভুবাবু: কী রকম, কী রকম? কি কবিতা?

প্রশ্ন: যেমন ধরুন, 'লীলাসঙ্গিনী', তারপর 'নীলমণিলতা'। 'নীলমণিলতা' এমনই একটা কবিতা, যেটা প'ড়ে আমরা বুঝতে পারতাম না যে, এ কবিতার আবৃত্তি সম্ভব। শম্ভুদাই সে আবৃত্তির পথ দেখিয়েছেন। তারপর নজরুলের 'ফাল্গুনী' কবিতা, বহুকাল এসব কবিতা ওঁর কণ্ঠে শুনিনি।

উত্তর: হ্যাঁ অনেকদিন, অনেকদিন আগে ঐসব কবিতা আবৃত্তি করতাম। হয়কি, এক একটা সময়ে এক এক রকম কবিতা করতে ইচ্ছে করে। তারপর পরে আর ফের ওতে ফিরে যাওয়া যায় না, বয়সটা আর থাকে না তো। অল্প বয়সে বেশ এক রকমের মেজাজ থাকে। তবে 'লীলাসঙ্গিনী' ইত্যাদি কবিতাগুলো রবিবাবুর বেশ পরিণত বয়সে লেখা। 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতাটা একটু বার করো তো দেখি, মানে মাঝপথে যদি আটকে যাই সেইজন্য। আগে স্মৃতিশক্তি খুব খারাপ ছিল না। কিন্তু এখন বুড়ো হয়েছি তো, ভুলে ভুলে যাই অনেক জিনিস, আমার মনে থাকে না। ওর প্রথম লাইন হচ্ছে 'দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে।'

[শম্ভুবাবু 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন।]

প্রশ্ন: এবারে শুনি 'ফাল্গুনী' কবিতা।

উত্তর: কী বলব, নজরুল সায়েব তো যৌবনমত্ত কবি, তাঁর লেখা কবিতা, তাও আবার একটু রসিকতার কবিতা। আমি এই বুড়ো বয়সে এই কবিতা আবৃত্তি করলে অনেক সময় লোকের খুব খারাপ লাগতে পারে। তায় আবার একটি মেয়ে বলছে। যাই হোক, সবটা করার দরকার নেই, খানিকটা করছি। এতে মজা আছে।

[শম্ভুবাবু 'ফাল্গুনী' কবিতার খানিকটা অংশ আবৃত্তি করলেন।]

প্রশ্ন: 'নীলমণিলতা'?

উত্তর: মানে, 'লীলাসঙ্গিনী'র পরেই 'ফাল্গুনী', আর তারপরেই আবার 'নীলমণিলতা', বড্ডো মেশানো হয়ে যাবে না? তার চেয়ে বরং ঐ ধরনের কবিতা বলি যেমন—

[শম্ভুবাবু রবীন্দ্রনাথের 'জন্মান্তর' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন।]

প্রশ্ন: আপনি যখন এই কবিতা আবৃত্তি করলেন, তখন একটা সুর প্রাধান্য

পেয়েছিল।

উত্তর : হ্যাঁ। সুর অর্থাৎ একটা ছন্দের দোলা।

প্রশ্ন : অনেকে এখন কবিতা আবৃত্তি করার সময় বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার ক'রে থাকেন। এই প্রসঙ্গে আপনি কিছু বলবেন?

উত্তর : এতে কী বলব। শিল্পের ব্যাপারে তো অপার স্বাধীনতা, যে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। আর ওটার সম্পর্কেও যে যা ইচ্ছা হয় বলতে পারে, ও ব্যাপারেও অপার স্বাধীনতা। সেইজন্য যদি কারো মনে হয়, লাগানো যায় তাহলে তিনি লাগাবেন, আমি জানি না। তবে বাজনাটা গানে লাগে তো, ওটা টানা। কী জানি কেন, আমার মনে হয় কথাগুলো হারিয়ে যাবে। তাই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের কথা আমার মনে হয়নি। কেউ যদি লাগান এবং শুনে যদি যাকে বলে বেশ রসোত্তীর্ণ মনে হয়, যদিও সেটা যে কী তা কেউই ডিফাইন করতে পারেন না, তবুও বলি, যদি রসোত্তীর্ণ হয় তাহলে খুব ভালো, আর না হলে ভালো নয়।

প্রশ্ন : সে তো সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

উত্তর : হ্যাঁ, তাই-ই তো।

প্রশ্ন : 'জন্মান্তরে'র মতই আরও কবিতা আছে যাতে ছন্দের এই রকম দোলা আছে।

উত্তর : হ্যাঁ, আর ঐ ছন্দের দোলাটা বোঝাবার জন্যই তো ঐ কবিতাগুলো ওইরকম ক'রে লেখা। যেমন "পথ বেঁধে দিলো বন্ধনহীন গ্রন্থি, / আমরা দুজন চল্‌তি হাওয়ার পন্থী।" ওর মধ্যে বেশ ঝোঁক আছে, তাই না? অন্য আর একটা কবিতা আছে, সেটাও খুব ভালো ক'রে আবৃত্তি করা যায়। সেটা অবশ্য গান হিসেবে গাওয়া হয়।

[শম্ভুবাবু আবৃত্তি করেন :

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুন্ঠিত কুন্ঠিত জীবনে
ক'রো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপনপর ভুলিয়ো,
এই সংগীত-মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।

এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে,—
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।]

অবশ্য এ নিয়ে কেউ রাগ করতে পারেন, বলতে পারেন, এটা গান গাওয়া হয়, এটাকে এরকমভাবে বলা হচ্ছে কেন? এমন কবিতাও তো আছে যেগুলোকে কবিতা বলা হয়, অথচ রবিবাবু সেগুলো ইচ্ছে করে সুরে বেঁধে গান তৈরী করে দিয়েছেন। এখন এরকম হয়তো কী করা যাবে।

প্রশ্ন : আবৃত্তির কি স্বরলিপি করা যেতে পারে?

উত্তর : স্বরলিপি? আমাদের স্বরলিপির যেরকম ধরন তাতে তো হয় না। এখন স্টাফ্ নোটেশান আমি ভালো ক'রে জানি না, তাতে হয় কিনা তাও জানি না। তাতে যদি হয়, হতেও পারে। এখন বুড়ো হয়েছি জোর ক'রে বলতে পারি না, তবে যতদূর মনে পড়ছে, বহুদিন আগে Daniel Jones-এর একটা বইয়ের পেছনে একজন অভিনেতার কথার খানিকটা অর্থাৎ দু-তিনটে লাইনের একটা নোটেশান করা ছিল, বোধ হয় ফলস্টাফের, কী যাই হোক। তা সেরকমভাবে করা যেতে পারে। কিন্তু ক'রে লাভটা কী হয়, মানে সেটার দ্বারা কি হয়? যদি একান্তই করা যায়, আমি এখনও খুব নিশ্চিত নই যে, ওটা করা যায়, তাহলে একটা কাজ হতে পারে যে, যাঁরা অ্যানথ্রপলজির নানান দিকে বিশেষ ক'রে সোশিয়লজি বা কালচারাল অ্যানথ্রপলজি নিয়ে গবেষণা করেন, পরের যুগে এইটে তাঁদের হয়তো ভয়ানক সাহায্য করতে পারে। কারণ, এক একটা যুগে এক এক রকম ভাবে কথার উচ্চারণ হয়। কোন্ কথাটার কেমন অনুভব হচ্ছে সেটা বদলে যায়, এক এক যুগে এক এক রকম থাকে। যেমন, রবিবাবুদের সময়ে কিছু কথা যথেষ্ট জোর ক'রে বলা হত, তখন হয়তো তার একটা আবেদন ছিল, কিন্তু আজকে তার কোনো আবেদন নেই, মানে আবেগের দিকে কোনো আবেদন নেই। কারণ, বদলে বদলে যায় তো সব। একটা সময় থেকে আর একটা

সময়ে এইটে যখন বদলে বদলে যায়, তার মানে কিন্তু সমাজের মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক সেই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও কোথায় যেন বদল হয়ে যাচ্ছে। একজন লোক পঞ্চাশ বছর আগে স্ত্রীর সঙ্গে যে কথা বলত এবং যা শুনে সকলের মনে হত যে, হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক আবেগপূর্ণ কথা, পঞ্চাশ বছর পরে সেইটে বলে না। তাই তো? এখন এর হিসেবগুলো যদি থাকে তাহলে তাই দিয়ে সমাজে সম্পর্কগুলোর কীরকম কীরকমভাবে বদল হচ্ছে এটা হয়তো পরে ধরা যেতে পারে। কিন্তু সেরকম করা যায় কি? জানি না। এই তো, এত পয়সা খরচা ক'রে যন্ত্রপাতি দিয়ে যেটা রেকর্ড করা হয়, তাইই সব সময় ঠিক হয় না, অর্থাৎ যেমনটি বলা হলো তেমনটি ওঠে না। তা ওটা যদি হয়ও, কী হবে কে জানে।

প্রশ্ন: একটা জায়গায় পড়েছিলাম, রবীন্দ্রনাথ যখন চেকোশ্লোভাকিয়ায় গিয়েছিলেন ১৯২১ সাল-টাল হবে বোধ হয়, তখন উনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারও স্বরলিপি করা হয়েছিল। আপনি যা বললেন, অর্থাৎ রেখে দেওয়ার জন্য, কীরকম করে তিনি বলতেন তা পরবর্তীকালে জানার জন্য।

উত্তর: ওরকম যদি হয়, যদিই হয়, তাহলে পরে, অনেক দিন পরে তার থেকে হয়তো একটা হিসেব করা যেতে পারবে। সমাজতত্ত্বের হিসেবে ওটা হয়তো খুব কাজে লাগতে পারে।

প্রশ্ন: কথা বলার এই যে প্যাটার্ন বা স্টাইল এটা কত বছর অন্তর অন্তর পালটে যেতে পারে ব'লে আপনার মনে হয়?

উত্তর: আমি জোর ক'রে কী ক'রে বলব?

প্রশ্ন: তবু একটা আন্দাজ?

উত্তর: হ্যাঁ, অনেকগুলো জিনিসের ওপরেও ওটা নির্ভর করে। সমাজটার মধ্যে কতগুলো ঘটনা ঘটছে। সমাজটা কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, তার ওপরে বদলের এই হার খানিকটা নির্ভর করে। অনেকগুলো বড় বড় ঘটনা যদি সমাজে ঘটে যায়, তাহলে পরে দেখা যাবে যে, পাঁচ বছরের মধ্যেই কথা বলার ধরনটা আর এক রকম থাকছে না। তাই বলে আবার, অত দ্রুতই যে সব সময় পালটিয়ে যায় তা কিন্তু নয়। কতকগুলো এমন শিকড় ভেতরে আছে যে তাতে মানুষের মনে, মনটার ভেতরে, একইভাবে প্রতিক্রিয়া হয়। কীরকম বেশ মজা আছে,

কতকটা বদলায় কতকটা বদলায় না। তবু, কথা বলবার ভঙ্গিটা বেশ বদলে যায়। আমার ধারণা, বছর দশেকে খুব বদলে যায়। ১৯৩০ সাল ৩১ সাল নাগাদ আমি একজন লোককে কথা বলতে শুনলুম। বিশ সালে অর্থাৎ তার দশ বছর আগে তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলেন ব'লে লোকে তাঁর খুব প্রশংসা করেছে। আর আমি দশ বছর পরে, বোধহয় ওই ৩০-৩১ সালে তাঁর কথা শুনলুম। আমার তখন আর তাঁকে ঠিক স্বাভাবিক মনে হল না। তা হলে নিশ্চয়ই তার মাঝখানে কথা বলার ভঙ্গিটা বদলে গেছে।

আমাদের সকলের সামাজিক কথোপকথনের যেটাকে, কী বলব? শব্দের ছক বা sound patte.n বলে, সেইটে বদলে যায়। এক এক সময়ে এক একটা যুগে শব্দের ছক যে রকম থাকে তার পরের যুগে সে রকম থাকে না, বদলে যায়। সেই জন্য একটা যুগে রবীন্দ্রনাথ যে রকম ক'রে যে কবিতাগুলো আবৃত্তি করেছেন এখন আমরা সেভাবে করতে পারি না। তাঁর ধরনটায় অনেক জায়গায় দেখা যাবে যে, ভেতরের skeletonএ একটা মিল আছে; শব্দের সম্পর্কে তাঁর যে অনুভব সচেতনতা, সেগুলো এখনও আমাদের ভালো লাগে, একই রকম লাগে কিন্তু কিছু টান আছে সেগুলো তখন হয়তো ঠিকই ছিলো, এখন ভালো লাগে না, এখন আমরা তা করতে পারি না। সম্ভবই নয়।

প্রশ্ন: আগে, অনেক দিন আগে যেসব নাম করা শিল্পী আবৃত্তি করেছেন তাঁদের রেকর্ড আমরা শুনি। অনেকে বলেন যে, তাঁরা যে রকমভাবে আবৃত্তি করতেন, সেই রকমভাবে আবৃত্তি করলে ভালো হয়। আপনি বলছেন, সেটা খুব প্রয়োজনীয় নয়।

উত্তর: না, না। খালি পণ্ডিতেরাই এই কথা বলতে পারেন অর্থাৎ যাঁরা শাস্ত্র-টাস্ত্র মানেন তাঁরাই বলতে পারেন, ওই যখন সেই মনু যে রকম ক'রে বলেছিলেন সেই রকম ক'রে বলতে হবে।

[শ্রোতাদের হাস্যরোল]

আজকালকার দিনে অবশ্য কেউ মনু বলেছিলেন বলবে না, বলবে এ্যাডাম যেমন ক'রে বলেছিলেন।

[শ্রোতাদের আবার হাস্যরোল]

হ্যাঁ, এখন তো বাঙালী ভদ্রলোকেরা সব পশ্চিম থেকে উদাহরণ বার

করেন।

প্রশ্ন: এই যেমন শেক্‌স্‌পীয়ারের সময়ে যে ধরনের নাটক অভিনয়ের···

উত্তর: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যেমন আজকে কে জানে শেক্‌স্‌পীয়ার কীরকম কীরকম ক'রে বলতেন? শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক আজও আমাদের ভীষণ জ্যান্ত মনে হয়। হ্যাঁ, একটা কথা আছে, আমার ঠিক মনে নেই। ঐ বুড়ো হয়েছি তো, আন্দাজে বলছি:

The time is out of joint, O cursed spite,
That ever I was born to set it right!

তা এইটে, এই কথাটা আজও আমাদের ভীষণ বিচলিত করে। ভালো লাগে কথাটা, ওই যে:

O cursed spite,
That ever I was born to set it right!

ধরা যাক, এমন যদি হয় যে, কোনো একটা প্রক্রিয়ার ফলে প্র্যাকেট-ট্র্যাকেট ক'রে আমরা শেক্‌স্‌পীয়ারকে বাঁচিয়ে ফেললুম বা তাঁর আওয়াজটা শুনতে পেলুম আর শেক্সপীয়ার সায়েব ওটা প'ড়ে বললেন, 'আমি এরকম ক'রে বলি' তা হলে সেটার দ্বারা কিছু প্রমাণ হবে? এইটা প্রমাণ হবে যে, শেক্সপীয়ার যেমন ক'রে বললেন আমরা কিছুতেই সেভাবে বলি না এবং বলবও না। কারণ চারশো বছর আগে, তাঁর সময়ের সমাজে শব্দের, শব্দোচ্চারণের, কী ধরন ছিলো, সেই অনুযায়ী তিনি কথা বলবেন; তখনকার হিসেবে সেইটা ঠিক ছিলো এবং সেই বারবেজ সায়েব নিশ্চয়ই সেই রকম করেই কথাগুলো বলেছিলেন। কিন্তু আজকের দিনের বারবেজরা যখন সেই লাইনগুলো বলেন তখন তাঁরা আজকের দিনের সমাজ হিসেবেই কথাগুলো বলেন। সুতরাং শেক্সপীয়ার যাই-ই ভেবে থাকুন না কেন, সেটাই কিন্তু শেষ কথা নয়, অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে, শিল্পী যখন কিছু সৃষ্টি করেন এবং সেটা যখন মহৎ সৃষ্টি হয়ে ওঠে, তখন সেই সৃষ্টিটা শিল্পীর চেয়েও বড়ো। শেক্‌স্‌পীয়ার কী নিজে ভাবতে পেরেছিলেন যে, কত মানে ওই কথার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে যেটা প'ড়ে আমরা এত শো বছর পরেও এইরকম বিচলিত হব? শেক্সপীয়ার নিজেও তো এইটা অনুভব করতে পারেন নি। তাই, সৃষ্টিটা যখন হয়ে যায় তখন সেটা, ওই, সৃষ্টিকারের চেয়েও বড়ো হয়ে যায়। সেইজন্য, তাঁর সময়কার মতন তিনি একটা রূপ বলতে

পারেন যে, আমি এই রকম ক'রে বলেছিলাম, কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।

প্রশ্ন : একজন কবি কবিতা লিখলেন, একজন আবৃত্তিকার সেটা পড়বেন। এখন কথা হলো, কবি একজন আবৃত্তিকারকে কতখানি স্বাধীনতা দিতে পারেন পড়ার প্যাটার্নের জন্য, মানে কীরকমভাবে পড়বেন বা…

উত্তর : এ খুব শক্ত কথা।

প্রশ্ন : ধরুন, একজন আবৃত্তিকারই বা নিজে কতখানি স্বাধীনতা আদায় ক'রে নিতে পারেন ?

উত্তর : আমি এটার উত্তর দিতে পারি যদি আমার একটা কথার উত্তর দিতে পারো। যদি তুমি জোর ক'রে এক রকম একটা নিয়ম আমায় বলতে পারো যে, প্রত্যেক ঘরে ঘরে, ঐ বলে না—বর বড়ো, না কনে বড়ো ; মানে কার হাতে সংসারের কর্তৃত্ব ? স্বামী অর্ডার করবে, না, স্ত্রী অর্ডার করবে—এটা যদি বেঁধে দিতে পারো, তাহলে ওটাও বাঁধা যাবে।

[দর্শকদের তুমুল হাস্যরোল]

ওখানে হয় কী, যে সংসারে স্বামীর বুদ্ধি-শুদ্ধির চাইতে স্ত্রীর বুদ্ধি-শুদ্ধি একটু বেশী সেখানে স্ত্রী যা বলে, স্বামী, নেহাৎ একটা ভোঁট যদি না হয়, তাহলে সে সেটা মেনে নেবে, বুঝবে যে, হ্যাঁ এ বেশী বোঝে। বিপদ হলে পরেই স্বামী বলবে 'ওগো শোনো। কী যে করি এখন।' তখন স্ত্রী একটু বিবেচনা ক'রে বললো, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো, এইটেই করবো'—বলে, ক'রে ফেললে। এই রকমই চলে। আবার যেখানে স্বামীর বুদ্ধি-শুদ্ধি বেশী সেইখানে স্ত্রী আবার এসে বললে, 'হ্যাঁ গো ভাখো না'—এই রকম, এরকমই নিয়ম।

সেই রকম কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো যিনি কবিতা লিখেছেন, তিনি নিশ্চয়ই খুব দামী লোক কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, যে লোকটা সেইটা পড়ছেন তাঁর বুদ্ধিও কম নয়, মানে বেশ ভালো। তাহলে পরে, তখন আবার ওঁর একটু বোঝবার আছে, তাই না ? ওটা উল্টে উল্টে যায়, সব সময়েই তাই হয়। আমিও অনেকবার ভেবেছি, ওটা পৃথিবীতে সব সময়ে ওই রকমই হয়। এই যেমন পলিটিক্যাল লীডাররা তো সমাজে খুবই দামী, important, তাঁদের হাতে অনেক ক্ষমতা। বিশেষ ক'রে যাঁরা সরকারে-টরকারে বসেন তাঁদের হাতে—অপ্রতিহত

ক্ষমতা। এক্ষুনি 'গর্দান লে আও' বললে পরে একদম—গলা কেটে দিতে পারেন। তাহলে, তাঁদের দাম বেশী, না কবি-টবিদের দাম বেশী? ওটা সব সময়েই নির্ভর করে, কার বুদ্ধি বেশী তার ওপর এবং সেইটে মেনে নেওয়ার মতন ক্ষমতা যদি সেই সভ্যতায় থাকে, তাহলে সেই সভ্যতাটাই ভালো। অর্থাৎ যে কেউই দিল্লীর তখ্‌তে বসুন না কেন, তাঁরা যদি বোঝেন যে, এইখানে বাংলাদেশের এক জায়গায় একটা গ্রামের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নামে একটি মানুষ আছেন তাঁর বুদ্ধি কিন্তু ভয়ানক বেশী এবং পায়ে হেঁটে তাঁর ওখানে গিয়ে তাঁকে একটু জিজ্ঞাসা ক'রে নেওয়া দরকার, তাহলে পরে সেই পলিটিক্যাল লোকেরা বুদ্ধিমান এবং তাহলেই সংসারটা ঠিক চলে। তাই না? আবার উল্টোটাও হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন একজন দুর্ধর্ষ ব্যক্তি সেই রাজ্য শাসনের ভার নিয়েছেন যে, তখন অত বড় মাপের শিল্পীই কেউ নেই, তখন আবার তাঁরা তাঁর কাছ থেকে খানিক শুনবে। ওর কোনো বাঁধা নিয়ম নেই তো। ওটা ওই বর বড়, না কনে বড়, বলা বড় শক্ত।

প্রশ্ন: আজকে আমরা বা আমাদের পরে যারা আবৃত্তি করতে আসছে, তারা তো শিখতে চায়। আমাদের কাছ থেকেই শিখতে চায়। আমাদের ভাঁড়ারে যেটুকুনি বুদ্ধি আছে, তাই দিয়ে একটু বলে-টলে দিই। খুব গুরুগম্ভীর ভাবে বলি—এরকম করে বলবে, এরকম করে বলবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তা আজ যখন আপনাকে পেয়েছি তখন জানতে চাইছি যে, যিনি আবৃত্তি করতে আসছেন বা আসবেন বলে মনে মনে ভাবছেন তাঁর পক্ষে কি কি জিনিস আয়ত্তে রাখলে তাঁর সুবিধা হয়, অর্থাৎ তাঁর প্রস্তুতির জন্য কাজে লাগে, নিজেকে গড়ে নিতে কি কি জিনিস সাহায্য করে?

উত্তর: আমি খুব জোর করে কিছু বলতে পারি না। আমি অনেকবার দেখেছি, আমার একটা মুশকিল হচ্ছে আমি আবৃত্তি কাউকে শেখাতে পারি না। কারণ, আমার অনেকবার মনে হয়েছে যে, এতে ছোট ছোট সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম এতো সব ব্যাপার আছে ওই পুরো মানুষটাকে নিয়ে যে, ওইটে শিখিয়ে করিয়ে নেওয়া যায় না। তাহলে করি কি ক'রে? আমি কি ভেবেছিলাম? এখন আমি ছাতামাতা কি করি, তা তো আমিই জানি না, নিজে তো বোঝা যায় না। কিন্তু আমার আবৃত্তি করতে

ভালো লাগে। আর এগুলো খুব ব্যক্তিগত কথা, আশা করি আপনারা কেউ খারাপভাবে নেবেন না। এই আমি, যতদূর মনে পড়ে, অল্প বয়স থেকেই, কতো হবে, বছর পনেরো-টনেরো থেকে আরম্ভ করে একাদিক্রমে …মাঝে মাঝে এটা বলতে গেলে আমার লজ্জা করে, মনে হবে যে, আমি বাড়িয়ে বলছি না তো, বানিয়ে বলছি না তো ?…আমি বোধহয় অন্ততঃ পনেরো-ষোল বছর তো নিশ্চয়ই, আঠারো-কুড়ি বছরও হতে পারে, পনেরো-ষোল বছর তো নিশ্চয়ই বলে মনে হচ্ছে, প্রত্যহ লোকে যেমন ব্যায়াম করে না, সেই রকম আমি নিজে প্রত্যহ নিজের গলাটা তৈরী করবার চেষ্টা করেছি। আরও সব করেছি যেমন, শরীরটা ঠিক করবার চেষ্টা, অমুক করবার চেষ্টা, এই রকম সব করেছি। তার মধ্যে অনেকখানিই কিন্তু এই কবিতা পড়ার ব্যাপার ছিল এবং সেটা নেহাৎ অসুখ করে গিয়েছে কী কোথাও গিয়েছি, তার জন্যে দু'একদিন আটকে গেল ; তাছাড়া কিন্তু, ব্যায়ামে যেমন লোকে ফাঁকি দেয় না সেইরকম আমিও ফাঁকি দিই নি, প্রত্যহই করেছি। কি করেছি ? এই যে, কী করেছি এতো বছর ধরে, আমিও তো হিসেব রাখি নি, যদি রাখতাম তাহলে পরে বলা যেত যে, এর পরে এই করেছি। তবে আমার যতদূর মনে পড়ে · অনেকগুলো কল্পনা জাগে, মনে হয়, হয়তো এইরকম ভেবেছিলাম। কিন্তু ওই বলে না যে, পরে সিংহাবলোকনে, মানে hindsight-এ নিজের ওপর অনেক বুদ্ধি আরোপ করে আমরা অনেক বাড়িয়ে বলি, ভাবখানা যেন, আমি গোড়া থেকেই এই সব ভেবে করিছি ? এই রকম সব করে তো। তাই ভয় করে। পাছে ওইরকম একটু মিথ্যাচার হয় সেইজন্যে বলতে চাই না। খুব কম করে যেটুকু বলা যায় যে, আমার প্রথম মনে হয়েছে, গলাটা বেশ ভালো শুনতে হবে, এমন বলব যে, সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনবে। গলাটা কি ক'রে ভালো করা যায়, জোরে শুনতে পাওয়া যায়, উচ্চারণ কি ক'রে স্পষ্ট করা যায়, দম কি ক'রে বাড়বে—এই রকম। তা আমাদের সময়ে আমাদের বড়োরা বলে দিতেন যে, মেঘনাদবধ কাব্য থেকে আবৃত্তি করো। সেই 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে' ইত্যাদি, মানে অনেকখানি লাইন তো। এই রকম অনেকক্ষণ ধরে একসঙ্গে অনেকটা বলতে অভ্যাস করলে পরে, দম বাড়বে। এই রকম করে করেছি, করতে করতে এক সময়ে আমার

এই কথায়বার্তায় মনে হয়েছিল, একজনের কথায় যে, আমার গলাটাও এঁর মতো—এরকম বেশ ভারী করে বলি তো। যেমন, তখন উঠতি বয়সে, বাড়িতে দরজায় যদি কেউ কড়া নাড়ে তো কেউ বলি না যে, কে? তখন এরকম গলা করে বলি, কে-এ-এ-এ? আমার যখন ছোট বয়েস তখন তো অভিনয়ও হত ঐরকমভাবে, সামাজিক নাটক হলে পরেও। [গলা ভারী করে] 'কাল মাসের পয়লা গয়লা এলে কি বলব' এইরকম গোছের আর কী।

[শ্রোতাদের তুমুল হাস্যধ্বনি]

তা, সেই রকম আমিও ঐ রকম 'কে-এ-এ-এ' করে বলতুম আর কী। আমার চেয়ে বয়সে বড় কেউ একজন আমাকে সপ্রশংসভাবে বললেন যে, গলাটা বেশ বুড়োটে বুড়োটে।

[শ্রোতাদের হাস্যরোল]

তাইতে আমি আধুনিক চলতি বাংলায় যাকে বলা যায় পাংচার্ড, তাই হয়ে গেলাম। তখন ভাবতে লাগলাম যে, আচ্ছা, সত্যিই তো, এই বুড়োটে গলা কি করে হয় আর ছোকরাটে গলাই বা কি করে হয়। তা, অনেক লোকের বয়স আমার চাইতেও তো অনেক বেশী—পরে যেমন বোধ হল যে, শিশির বাবুর বয়স অনেক বেশী, তা তাঁর গলা তো কেউ বুড়োটে বলে না, আর আমার গলা কিনা বুড়োটে হবে? যাই হোক, এই করে তখন একটা অনুভব হল যে, গলায় সচলতা থাকে। তখন ঐ বোধটা জন্মাতে লাগল যে, সচলতাটা গলায় কি করে আসে। আর তারপরে এই যেমন আছে না, মানেটা অনুভবটা—একথাগুলো তো আমরা খুব বলি, কিন্তু এগুলো বুঝতে বুঝতেই আমার এত বচ্ছর কেটে গেল, এখনও পর্যন্ত ওর কোনো শেষ পাই নি আমি। সত্যি কথা, এই 'মানে' যে কত ভয়ানক ক'রে বেরোয় এবং কত স্তরে একটা 'মানে' থাকে তা বলাই যায় না। এর মধ্যে খুব মজা আছে, সে তো সব এখন বলা যাবে না আর তাছাড়া সকলের একটু একঘেয়েও লাগবে। এই যেমন খুব ছোট ছোট কথা বলা যায় যে, বাংলায় আমরা যখন কথা বলি তখন ধরা যাক, একটা বাক্যের মধ্যে এক একটা ঝোঁক পড়ে, একটা বিশেষ জিনিস বোঝাতে গেলে এই একটা ঝোঁক পড়ে। যেমন, সুন্দর ফুলটা। যখন বলি 'সুন্দর', সে একরকম, যখন বলি সুন্দর ফুলটা তখন ঐ সুন্দর শব্দটা চড়ে গেল—'সুন্' না? সুন্+দর ফুলটা না? কিন্তু

আবার আর এক রকমভাবে বলা যায় যেমন **সুন্দর ফুলটা**, এ্যাঁ? অর্থাৎ আমরা এই ঝোঁক যখন দিই, যখন বিশেষ করে বোঝাতে চাই তখন পর্দাটা হয় ওপরে চড়ে যায়, আর নয়তো পর্দাটা নীচে নেমে যায়। এই দু'রকম সাধারণভাবে হয়। আবার এও যদি খুলে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, সুন্ আর দর এই দুটো তো ইয়ে হচ্ছে, Syllable হচ্ছে, Syllable-কে কি বলে? দল বলে, আর একটা কি বলে? কি যেন বলে বাংলায় ভুলে গেছি। তা যাই হোক, ঐ সুন্ আর দরের মধ্যে আমি কখনো আগের আস্তেকটায় ঝোঁক দিচ্ছি কখনো পরের আস্তেকটায় ঝোঁক দিচ্ছি—এ ভয়ানক ইন্টারেস্টিং এবং কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এত দ্রুত এগুলো হয় যে, জোর ক'রে করতে হয় না। মুশকিল হয় যখন আমরা কিছু করতে বসি, অভিনয় করি, কি আবৃত্তি করি, তখন ভয়ানক জোর ক'রে ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করি, ঐ মিথ্যে সাক্ষীর মতো একটু বাড়িয়ে বলা আর কী! কথাটা আমার নয়, রবীন্দ্রনাথের। এসব ক্ষেত্রে ঐ রকম একটু হয়ে যায়—একটু বাড়িয়ে বলা, আর তাইতেই একটা কোথায় মুশকিল হয়। আর তা না হলে কিন্তু ঐ রকম সহজই থাকে। যেমন আমি বলছি, একটা কথা ধরা যাক 'তুমি কাল সকালে আমার কাছে এসো।' তুমি। কাল। সকালে। আমার। কাছে। এসো—এই তো, ছটা শব্দ আছে তো? এইটা ছ রকমে বলা যায়। অর্থাৎ (১) **তুমি** কাল সকালে আমার কাছে এসো (২) তুমি **কাল** সকালে আমার কাছে এসো (৩) তুমি কাল **সকালে** আমার কাছে এসো (৪) তুমি কাল সকালে **আমার** কাছে এসো (৫) তুমি কাল সকালে আমার **কাছে** এসো (৬) তুমি কাল সকালে আমার কাছে **এ:সো**—এই ছরকম ভাবে বলা যায় এবং এর মধ্যে কোথাও বাড়াবাড়ি করবার দরকার নেই, না? খুব সহজে আমরা বলি, হামেশাই এরকম করে বলি এবং হামেশাই এরকম ক'রে বলতে পারি বলেই কিন্তু আমি যাদের সঙ্গে ঘর করি, আমার চারপাশের লোক যারা তারা চট করে বুঝতে পারে আমি কি বলতে চাচ্ছি, কোনটা বলতে চাচ্ছি, মানেটা কি হচ্ছে। এই যে মানেটা হচ্ছে, এই যে মানেটা প্রকাশ পাচ্ছে, এটা তো আমি আমাদের খুব সাধারণ দৈনন্দিন কথা থেকে বললাম। এখন যখনই আমরা একটা ভারী কথা বলি, আবেগের কথা বলি, তখন তার মধ্যে আরও অনেক [মানে] ঢুকে যায়, না?

'আমার চোখ-দুটো এসেছে ছুটির দরবারে তোমার কাছে। একমাত্র তোমার কাছেই আমার ছুটি। অতি ছোটো তার আয়তন,... ঐযে দুই-একগুচ্ছি অশিষ্ট চুল কপালের উপর এসে পড়েছে,...চারিদিকে দিনের আলো ডুবে এলো...এর মধ্যে এই যা দেখছি এ এক আশ্চর্য সত্য'—এখন এসব কথা আরও অন্য রকম হয়ে যায় না?

প্রশ্ন: আবৃত্তি বলবো না, কবিতা-পড়াই বলবো। কবিতা-পড়ার প্রতি এই-যে ঝোঁক, এই-যে আকর্ষণ এটা আপনি নিজে কীভাবে পেয়েছেন?

উত্তর: আমি নিজে কি করে পেয়েছি, এ তো জানি না। এমনি বাড়িতে কিছু কিছু—না, কিন্তু এরকম পড়ার ইয়ে ছিল বলে মনে নেই। ছিল না। আমার বাড়িতে বিশেষ লোকজন কেউ ছিল না। মানে, ঐ আরকি, খুব কম লোক। আমার মা অনেক আগে মারা গিয়েছেন, তারপরেতে বাবা দু ভাই ইত্যাদি, এই রকম করে করে, এই আর কী—। তা তার মধ্যে এক সময়ে তখন কত বয়েস—বছর চোদ্দ হবে বোধ হয়, কী, আর একটু কম—বছর বারো তেরো হবে তখন একজন ভদ্রলোক; আমার চেয়ে বড়ো, তিনি তখন বি. এ. পড়ছেন, তিনি বললেন 'এসো এই কবিতাটা পড়ো দিকিন, আবৃত্তি করো।' আমি তো জানিই না, কি করে আবৃত্তি করে। তিনি বললেন, 'আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।' তিনিই আমাকে প্রথম শেখালেন। তার মধ্যে তাঁর দু'একটা জিনিস বেশ মজা লাগলো। যেমন, আমি পড়ছি, 'নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা। অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ; রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ' —এই। বারো বছর বয়সে যেমন পড়ব, সেই রকম পড়েছি। উনি বললেন, "ওটা কি হচ্ছে। তুমি বুঝতে পারছ না, 'নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা', তার এই রকম এই রকম—'অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ'—তা তুমি এগুলো বুঝিয়ে বলো। 'রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ'—তুমি কীরকম পাঁটার ঘুগনির মতন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে।" সেই আমার প্রথম ধারণা হলো যে, এইসব কথাগুলো বলতে হলে, মানে অনুযায়ী ঠিক করে বলতে হয়। এখন ভাবলে মনে হয় যে, এসব কবিতা কেউ যে বসে বসে পড়ে তখন বোধহয় আমার মাথায় ছিল না।

কবিতা যারা পড়ে তারা আবৃত্তি করে—ভাবটা এই রকম। আর নয়তো যারা পড়ে তারা ওর ওপরে প্রবন্ধ লেখে, যেগুলো মাসিক

পত্রিকায় বেরোয়। এইরকমই বোধ হয় আমার ধারণা ছিলো। তারপর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পরে, ওই বালীগঞ্জে একটা মাঠ আছে—সেনাদের, সেটা এখন ঘিরে দিয়েছে, ওখানে ঐ সেনাদের ছাউনি অনেক দিন থেকেই ছিলো, কিন্তু ওর মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের পথ ছিলো, ঐ মাঠটায় আমরা বেড়াতে যেতে পারতাম। ঐখানে একদিন বিকেলবেলায় গিয়ে দেখি, আমার এক স্কুলের ছাত্রবন্ধু, হাসিবল হোসেন তার নাম, আমরা তাকে 'কাজী' 'কাজী' বলতাম; সেই কাজী বসে আছে একলাই। ছোটবেলা থেকেই সে এই সাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্কে খুব উৎসাহী ছিলো। তা, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দেখলাম যে, সে কবিতা আবৃত্তি করে না বা কবিতা নিয়ে সে কোনো প্রবন্ধ লিখবে না কিন্তু কবিতা পড়তে ভালবাসে। খুব জোর করে বলতে পারবো না, কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে, বোধ হয়, এই কবিতা: 'ওই আসে'—তার গলা ভালো নয়, কিন্তু এই-যে 'ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা' এই কথাগুলো কী আবেগ দিয়ে বলছে আর কীরকম চোখটোখ ক'রে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, ছাখ্, কী সুন্দর কথাগুলো, আওয়াজগুলো কী সুন্দর! তখন আমার এতো আশ্চর্য লাগলো, সেই বিকেলবেলায় মাঠে বসে যে, বাঃ এ এতো তন্ময় হয়ে কবিতা পড়ে, এ কবিতা ভালবাসে, না? সেই কাজী হাসিবল খুব ভালো লোক ছিলো, আমরা বেশ বন্ধু ছিলাম। তারপরে সে এখানেই ছিলো, যখন বাংলা ভাগ হয়ে গেলো, ও পূর্ব পাকিস্তানে যায় নি, এইখানেই ছিলো। তারপরে সে একটা দোকান দিয়েছিলো। তা এইসব লোক কি দোকান দিতে পারে, তা চলে কখনো দোকান? পার্ক সার্কাসে আমাদের বাড়ির কাছেই সে থাকতো। এই রকম করে তারপর এক সময় সে এখান থেকে চলে গেলো। কী সব গোলমাল হলো। তারপর এখানে আমাদেরও তো গুণে ঘাট নেই, সেই পঞ্চাশ বাহান্ন সালে মুসলমানদের নিয়ে আবার একটা সেই কীসব আরম্ভ হয়েছিলো, না? ঐসব নোংরামি-টোংরামি—তারপর একটা সময়ে সে এদেশ ছেড়ে চলে গেছে। আর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে, হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো—ঐযে লণ্ডনে মস্ত বড় পার্কটা—হাইড্ পার্ক—হ্যাঁ ঐ হাইড্ পার্কের একটা পাশে হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা, তাকে তার

কাছে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলো। তা ও জিজ্ঞেস করেছে যে, 'হ্যাঁরে হাসিব, তুই আর ফিরবি না?' সে বলেছে, 'দূর, আমি ফিরবো না।' মানে, তার কাছে ঐটা হলো তো মুসলমানদের দেশ আর এটা হলো হিঁদুদের দেশ। তা, ও বলে, 'আমি তো কোথাও ফিটিং করি না, আমি না হিঁদু, না মুসলমান, আমি ওর কোনো জায়গায়ই যাবো না।' চলে গিয়েছে, আমারই মতো বুড়ো হয়ে গিয়েছে, বেঁচে আছে কিনা, জানি না। চলে গেছে, সে বড়ো ভালো বন্ধু ছিলো আমার। সে-ই প্রথম ঐ কথাগুলো বলে যে, কবিতা কী মজার। একজন লোক যে তার থেকে কোনো ফায়দা ওঠাতে চায় না, খালি ভালবাসে, এ তাকেই দেখেছিলাম।

অনেক হয়েছে, না?

কবিতা পাঠ কবিতা আবৃত্তি

অরুণ মিত্র

কবিতা-পাঠ এবং কবিতা-আবৃত্তি নিয়ে ইদানীং নানা প্রশ্ন যে উঠছে এটা এক শুভ লক্ষণ, কেননা এ বিষয়ে কিছু ভাবনা-চিন্তার দরকার আছে। অনেক কাল যাবৎ, সেই আচার্য শিশির ভাদুড়ীর সময় থেকে, কবিতার উপর শিল্পীদের বিশেষ নজর পড়েছে, যার ফলে কবিতা-আবৃত্তি অভিনয় বা সংগীতের মতো এক জন-শিল্পানুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এতে এক প্রধান স্থান পেয়েছে লিরিক কবিতা। কবিতা-প্রেমের কথা ভাবলে লক্ষণটা আনন্দের, কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে মনে নানা প্রশ্নও আসে। সে সব কথা আমি বলেছিলাম কিছুকাল আগে যখন কবিতা-আবৃত্তির চর্চা চারদিকে প্রবল হয়ে উঠেছে। 'আবৃত্তি আকাদেমীর' আমন্ত্রণে এক ঘরোয়া সভায় এ সম্বন্ধে আমি কিছু মত প্রকাশ করেছিলাম এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম। আমার সেই বক্তব্য বছর-খানেক বাদে আকাদেমীর মুখপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর কিঞ্চিৎ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। অতঃপর এই বিষয় নিয়ে রবীন্দ্র সদনে এক আলোচনা-সভা এবং আবৃত্তি ও কাব্যগীতির অনুষ্ঠান হয় প্রধানত শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের আগ্রহে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগীতি শোনান শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র। আলোচনায় ছিলেন শ্রীশম্ভু মিত্র ও শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ। আমিও তাতে অংশ গ্রহণ করি। বস্তুত সন্তোষকুমারের ভূমিকার পর আমার বক্তব্যেই আলোচনার সূত্রপাত। কিন্তু আলোচনা অগ্রসর হয়নি, কেননা উত্তর আসে আক্রমণে, যা প্রত্যাশিত ছিল না। সমস্যাটা সাহিত্যসংশ্লিষ্ট, বিশেষ কোনো তারিখে বিশেষ কোনো মঞ্চে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ দিয়ে তার সমাধান হয় না। আর এ বিষয়ে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাধান তৈরি করাও যায় না। অবশ্য কোনো জন-অনুষ্ঠানে, যেখানে বহু লোক গিয়েছেন শিল্প উপভোগের জন্যে এবং যার সঙ্গে শৈল্পিক প্রতিষ্ঠার ব্যক্তিগত অভিমান জড়িত হয়ে পড়েছে, সেখানে এ ধরনের আলোচনার ব্যবস্থা

বাস্তবসম্মত কিনা তাও খুব সন্দেহের তবে একেবারে অর্থহীন হয়তো নয়, কারণ শিল্প-পিপাসু মনে চিন্তার কিছু জায়গা তো থাকে, সেখানে খানিকটা নাড়া লাগে, যা শেষ পর্যন্ত দৃষ্টির পক্ষে উপকারীই হয়।

কবিতা আমরা অন্যদের সামনে পড়ি কেন? জনসমাবেশে আবৃত্তি করি কেন? তার সহজ ও স্বাভাবিক কারণ তো এই যে, কোনো কবিতা পাঠকের ভালো লেগেছে বলে তিনি সেই ভালো-লাগাটা অন্যদের অনুভব করাতে চান। অর্থাৎ কবিতার যে ভাব বা যে-বক্তব্য তাঁকে নাড়িয়েছে সেইটা তিনি অন্যের মনে পৌঁছে দিতে চান। যে-সব কবিতা কাহিনী-প্রধান অথবা প্রত্যক্ষভাবে নাট্যগুণসম্পন্ন, সে-সব কবিতা নিয়ে সমস্যা নেই। সে-রকম কবিতা বিবৃত বিষয়ের অবলম্বনে অভিনয়-কুশলতার দ্বারা ফুটিয়ে তোলা যায় এবং তাতে শ্রোতাদের নাট্যপ্রবণতা তৃপ্ত হয়। অবশ্য সেক্ষেত্রে আবৃত্তিকারের ক্ষমতা অনুসারে আবৃত্তির কার্যকারিতায় তফাত হয়। কিন্তু সত্যিকার সমস্যার ক্ষেত্র হল লিরিক কবিতা। এ কবিতায় রূপ নেয় জীবন ও জগতের সংস্পর্শে কবির অব্যবহিত একান্ত প্রতিক্রিয়া। এই কারণে লিরিক কবিতা বিভিন্ন কবির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করে। ঘটনার বিবরণ নয়, কাহিনী নয়, নাট্যভাষণ নয়। যে কবিতায় কবির ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়, তাঁর সংবেদনা ও অনুভূতির রূপায়ণ থাকে, তাঁর মানবীয় উপলব্ধি উন্মোচিত হয়, এ সেই কবিতা। আধুনিক কবিতা বলতে আমরা এখন একেই বুঝি। এই কবিতার জন্যেই সমস্যার উদ্ভব। অন্য কোনো কবিতা পাঠের ধরন এর উপর চাপানো চলে না। এ কবিতা কেউ নিজে পড়ার সময় তার সে-বক্তব্য, তা সে ভাবই হোক বা অনুভবই হোক বা আর কিছু, তাঁকে নাড়িয়েছে, অন্যের সামনে পড়ার সময় সেটাই শ্রোতাদের মনে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করবেন, এই হল আসল কথা এ কবিতার ক্ষেত্রে। লেখক যখন স্বয়ং তাঁর লেখা পড়েন তখন এ ক্রিয়াটা আপনা থেকেই হয়, অবশ্য যদি তাঁর স্নায়বিক বিহ্বলতা না দেখা দেয়। আমি নিজের কথা এই বলতে পারি যে, আমি যে-আবেগ ও যে-অনুভূতি নিয়ে কোনো কবিতা লিখেছি, সেই আবেগ ও অনুভূতি ফিরে আসে আমার মনের মধ্যে, যখন কবিতাটা অন্যের কাছে পড়ি। যাঁরা শুনছেন তাঁদের প্রতি আমার মনোযোগ স্বভাবতই থাকে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে যায় আমার মনের আন্দোলন (কোনো কারণে যখন শ্রোতাদের প্রতি মনোযোগ বেশি দিই তখনই আমার কবিতাপাঠ ঠিক হয় না)। কবিতার ভাবের দ্বারা আমি যে আবার আন্দোলিত হই তার ফলে অন্যের মনে তা

সঞ্চারের চেষ্টা সচেতনভাবে করার প্রয়োজন হয় না। অন্যের কবিতা যখন কেউ পড়েন তখন ওরকম একাত্মতা সম্ভব নয় বটে, কিন্তু আবেগ বা অনুভবের আন্দোলন নিশ্চয় থাকবে, কেননা অন্যের কবিতা যে পড়া হয় তা তো ভালো লাগার কারণেই পড়া হয়। আর অনুভূতিই এই ভালো লাগার মূলে। অর্থাৎ কবিতার ভাবের সঙ্গে কবিতা-পাঠকের একটা হৃদ্‌গত সংযোগ ঘটে। এটা এক subjective ব্যাপার এবং এটা ছাড়া কবিতাকে শ্রোতার হৃদয়সংবেদ্য করা সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। subjective মনোভঙ্গি থেকে বিযুক্ত হলে লিরিক কবিতার পাঠ স্বভাবতই কবিতাকে ছাড়িয়ে শিল্পকৌশলের দিকে যায় এবং অন্যভাবে শ্রোতাকে প্রভাবিত করতে চায়। সেটা কবিতার ব্যাপার নয়। অবশ্য বুদ্ধিনির্ভর কবিতাও আছে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে-জাতের কবিতায় যদিও কবির যথেষ্ট ক্ষমতা প্রকাশ পেতে পারে যা প্রশংসার যোগ্য, এবং সে-কবিতা শ্রোতাকে ভাবাতেও পারে, কিন্তু তা কখনোই শ্রোতাকে আচ্ছন্ন করতে, তাকে ভেতর থেকে নাড়াতে, তাকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে পারে না।

আবেগ ও অনুভূতিকে ঘিরেই লিরিক কবিতার সৃষ্টি এবং তার আবেদনও পাঠক ও শ্রোতার আবেগ আর অনুভূতির কাছে। এই সৃষ্টি কবির নিজস্ব উপলব্ধির বাহন। সেইখানে এ কবিতার অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য। আর তার বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তার চলনে। হয়তো কোন গূঢ় অনুভবকে বয়ে নিয়ে চলে এক শান্ত মন্থর বাক্যপ্রবাহ। কারো ক্ষেত্রে হয়তো কোনো নিবিড় ভাব রূপ নেয় টানটান শব্দ-সম্পর্কের মধ্যে। আবার হয়তো কোনো সৃষ্টিতে কবিতার অন্তর্গত কথা খোলা আওয়াজ পরিহার করে বাক্যের এক চাপা ধ্বনিকে আশ্রয় করে। লিরিক কবিতার এই দুই দিক সম্বন্ধে সজাগ থেকে যদি কণ্ঠ ব্যবহার করা যায়, তবে কবিতা ঠিকভাবে পৌঁছয় শ্রোতার কাছে। অবশ্য এই সজাগ থাকাটা কোনো পরিকল্পনার বিষয় নয়, ওটা আপনা থেকেই ঘটে যদি কবিতার সংবেদনা থাকে পাঠকের মধ্যে। কবি তাঁর নিজের লেখা পড়তে গেলে যেমন হয় অনেকটা সেই রকম।

কবিতা শোনার পর শ্রোতা তার ভাবে বিচলিত বা অভিভূত হবেন, এটাই তো কাম্য। পাঠকের অনুভূতি বা সংবেদনাই তা ঘটাতে পারে, অন্য কোনো উপায়ে তা সম্ভব নয়। সেই কারণে ভাঙা গলায় কবিতা পড়লেও তা শ্রোতাকে নাড়াতে পারে যদি পাঠকের এই আত্মগত ক্রিয়াটা থাকে তার পেছনে। কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন তো আছেই, কিন্তু তার ভূমিকা নিশ্চয় কবিতা উপলব্ধির ভূমিকার চেয়ে বড়ো হতে পারে না। যদি সে-উপলব্ধির প্রকাশ না থাকে

তাহলে কণ্ঠবাদনই বড়ো হয়ে ওঠে, যার ফলে আবৃত্তিকারের শৈল্পিক দক্ষতায় শ্রোতারা অভিভূত হন এবং তাঁরা কবিতাকে গৌণ করে বাহবা দেন আবৃত্তির কৌশলকে। এতে আপত্তির কিছু নেই যদি প্রগাঢ় অনুভব এবং অন্তর্বাহী ভাবনার কবিতা বাদ দিয়ে পড়া হয় অন্য ধরনের কবিতা, যাতে আছে আপাত নাটকীয়তা অথবা সহজ কাহিনী।

বিপত্তি ঘটে যখন আবৃত্তির শৈল্পিক অভ্যাসে পড়া হয় লিরিক কবিতা। কবিতাকে ছাড়িয়ে তখন অন্য শিল্প শ্রোতার মন জুড়ে বসে, কবিতা হয়ে যায় উপলক্ষ্য মাত্র। এবং কবিতার গুণাগুণে আর কিছু আসে যায় না। এর নিদর্শন আকছার পাওয়া যায়। যিনি ক্ষমতাবান শিল্পী, অর্থাৎ যাঁর কণ্ঠস্বর চমৎকার, যিনি তা ইচ্ছেমতো ওঠাতে নামাতে পারেন এবং সেই সঙ্গে মুখে নানারকম অভিব্যক্তি ফোটাতে পারেন এমন শিল্পী যখন কোনো ভালো কবিতা আবৃত্তি করেন তখন স্বভাবতই তুমুল হাততালি পান। তারপরই যদি তিনি এমন কোনো কবিতা পড়েন যা আগেরটির মতো উৎকৃষ্ট নয় (কবিতারও তো গুণের তারতম্য আছে, উৎকৃষ্ট আছে, তাই না কি ?), তখনও তিনি সমপরিমাণ অভিনন্দন পান। এটা তো হামেশা দেখাও যায়। এমন-কি তিনি যদি সজ্ঞান করে কোনো বাজে কবিতা পড়েন তাহলেও যে একই রকম তারিফ পাবেন একথা নিশ্চয় করে বলা যায়। তাহলে কবিতার ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অন্য শিল্পের একটা অবলম্বন হওয়া ছাড়া আর কি ?

সন্দেহ নেই যে, এই অবলম্বনের মূল হল শব্দ-ধ্বনি। শব্দের ধ্বনি সব কবিতার মতো লিরিক কবিতারও এক মুখ্য উপাদান। তা থেকে তার চলনটা ধরা পড়ে, তার অঙ্গ-বিন্যাস ফুটে ওঠে এবং তার নির্ভরে ছন্দ এক বিশেষ আন্দোলন শ্রুতির মাধ্যমে মনে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু এ কবিতার আর এক ধ্বনি আছে যা ভেতর থেকে উঠে আসে, যা শব্দসমূহের প্রয়োগ ও অন্বয় এবং তাদের অর্থ ও ব্যঞ্জনাকে আশ্রয় করে রূপ নেয়। কবিতার আসল অভিঘাত তা থেকেই উৎপন্ন হয়। কবিতার সার্থক পাঠে এই অর্থব্যঞ্জনাসমন্বিত ধ্বনিরূপই মূর্ত হয়ে ওঠে। তখন উচ্চারণকর্তার উপস্থাপনার দিকে শ্রোতার আর মন যায় না, কবিতাটাই তাঁর সামনে চলে আসে।

আসলে অন্যের সামনে লিরিক কবিতাপাঠের প্রথম প্রেরণাই হল নিজের একান্ত ভালো-লাগা, এবং পাঠের ইচ্ছেটা স্বতোৎসারিত। পঠিতব্য কবিতার সঙ্গে নিজের আবেগ ও অনুভূতি জড়িত হয়েছে বলে একটা আত্মগত মনোভঙ্গি এই পাঠের পেছনে থাকে। সচরাচর যে আবৃত্তি অনুষ্ঠান হয় তার সঙ্গে এই

পাঠের পার্থক্য এই দুই কারণেই ঘটে অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ততা বা স্বতঃপ্রণোদন এবং আত্মগত মনোভঙ্গি। অবশ্য এমন তর্ক করা যায় যে, অনুষ্ঠানের আবৃত্তিকার যখন কোনো কবিতা আবৃত্তি করেন তখন সে-কবিতা তাঁর ভালো লাগে বলেই করেন, এবং ভালো-লাগার কোনো পরিমাপ-যন্ত্র নেই যা বলে দেবে কার কতখানি ভালো লেগেছে এবং কার ভালো-লাগাটা খাঁটি আর কারটা নয়। এ যুক্তি সরাসরি উড়িয়ে না দিয়ে একটু বিচার করে দেখা যেতে পারে। পাঠক অথবা আবৃত্তিকার, প্রত্যেকেই তাঁর ভালো লাগে বলেই কোনো কবিতা পড়েন বা আবৃত্তি করেন, এ কথা মেনে নিলেও কিছুটা থেকে যায়। কেন-না মনোভাব হিসেবে ভালো-লাগা যতই বিমূর্ত হোক, সব ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও তা প্রকাশ পায় বিশেষ বিষয়কে ভিত্তি করে। তার এই প্রকাশ-রূপ নানারকম হতে পারে। সেটাকেই পরিমাপ-যন্ত্র বলে ধরা যায়, যা ঠিক-বেঠিকের হদিশ দিয়ে দেয়। তারপর আর পরিমাণের প্রশ্ন থাকে না। সব আবৃত্তিকার অবশ্যই নয়, কিন্তু অনেকেই তাঁদের ভালো-লাগা প্রকাশ করতে গিয়ে নিজস্ব কিছু সৃষ্টি করেন, যা পঠিত কবিতাকে অতিক্রম করে যায় এবং যার জন্যে কবিতা তাঁরা যাই পড়ুন না কেন তারিফ পান সমান। অর্থাৎ কবিতাকে উপলক্ষ্য করে সৃষ্টি হয় অন্য শিল্প। কিন্তু কবি নিজে অথবা কবিতার একান্ত পাঠক যখন কবিতা শোনান তখন তাঁর নিঃসঙ্গ অনুভূতির সংযোগ থাকে তাতে। কবিতাটাই তখন তাঁর কাছে সর্বস্ব, কোনো করতালির প্রত্যাশা নিয়ে তিনি তা পড়েন না। কবিতার গুণাগুণ শুধু সেইভাবেই প্রকাশ পেতে পারে।

এইখানে কবিতা পাঠ বা আবৃত্তির সঙ্গে গানের অর্থাৎ যে-গানের কথায় কবিতা থাকে, যেমন রবীন্দ্রসংগীত, সেই গানের এক অনতিক্রমণীয় পার্থক্য আছে। গানে অনুমোদিত স্বরলিপি দিয়ে কণ্ঠের চলাফেরা সম্পূর্ণ বাঁধা থাকে, তার বাইরে গায়ক বা গায়িকার যাওয়ার অধিকার নেই। কিন্তু আবৃত্তিতে কণ্ঠ-বিচরণের কোনো পথ ছকে দেওয়া থাকে না। আবৃত্তিতে স্বরলিপির কোনো প্রশ্ন নেই। সেখানে পাঠক বা আবৃত্তিকার নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীন। অতএব তিনি স্বেচ্ছাচারীও হ'তে পারেন। তবু যে সংগীতে বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার ভিন্নতা প্রকাশ পায়, একই গানের আবেদনে তারতম্য ঘটে, আমার ধারণা, তার মূলে থাকে গায়ক-গায়িকার অনুভূতি ও সংবেদনার ভিন্নতা। কোনো স্বরলিপির নির্দেশ সেখানে দেওয়া যায় না। গায়নে এবং আবেদনে যে-বিভিন্নতা হয় তাকে সৃষ্টি করে গায়ক বা গায়িকার সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব, তাঁর মনোভঙ্গি,

গানের ভাবমণ্ডলে তাঁর প্রবেশ করার সামর্থ্য এবং রচিত শব্দাবলীর ভাবে তাঁর সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা। এ দিক থেকে লিরিক কবিতার উপযুক্ত পাঠের সঙ্গে তার কিছু মিল আছে। আবার কণ্ঠসাধনা ও চর্চার দিক থেকে তার কিছু মিল আছে আনুষ্ঠানিক আবৃত্তির সঙ্গে।

আনুষ্ঠানিক আবৃত্তি যে ব্যক্তিগতভাবে কবিতা পাঠের থেকে অন্য প্রকৃতির, প্রস্তুতির প্রক্রিয়াই তা চিহ্নিত করে দেয়। বৃহৎ জনসমষ্টির সামনে performance হিসেবে কবিতা পড়তে হলে তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার। ফলে শুরু হয় মহড়া। কণ্ঠকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, ভঙ্গিগুলো কোথায় কেমন হবে, এ সব নিয়মিত চর্চায় রপ্ত করেন শিল্পী। এই প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি কবিতাপাঠকে অন্য এলাকায় নিয়ে যায়, যা হল অভিনয়ের এলাকা। এই কারণে আবৃত্তিকে এক পৃথক শিল্প বলা যায় কিনা সে-প্রশ্নও আসে। পৃথক শিল্প, না অভিনয়-শিল্পের এক অঙ্গ? নাট্যাভিনয়ে যেমন থাকে স্বগতোক্তি অথবা একক কথন, তেমন কিছু? মোট কথা, এই আবৃত্তিতে আবৃত্তিকার জনসমক্ষে উপস্থাপনের জন্যে হিসেব করে অভ্যাস করে কবিতার এমন এক শিল্পরূপ দিতে চান যা তাঁর স্বতন্ত্র সৃষ্টি। মূলত এই প্রস্তুতি, এই প্রশিক্ষণ, আনুষঙ্গিকের এই গুরুত্ব কবিতাপাঠের প্রকৃতি বদলে দেয়, কবিতার অবলম্বনে সৃষ্টি হয় এক বিশেষ শিল্পরূপ। অবশ্য performing art-এর বৈশিষ্ট্যই তাই। সেটা শ্রোতা ও দর্শকসাধারণের কাছে নিশ্চয়ই খুব চিত্তাকর্ষক হতে পারে, কিন্তু কবিতার নিজস্ব ভূমিকা সেখানে গৌণ। ফলে কবিতার effect-এর দিক থেকে মুড়ি-মিছরির সমান দর হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের নয়, যেমন বাজারদরে হয়েছে আজকাল। তর্ক ওঠানো যায়, কবিরাও তো নির্দিষ্ট কোনো দিনে জন-সমাবেশে কবিতা পড়ে থাকেন, যেমন কবি-সম্মেলনে, তাহলে সে-পাঠও এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। কিন্তু তা যায় না এই কারণে যে, তাঁদের উপস্থাপনায় কবিতাব শিল্পরূপ দানের কোনো প্রয়াস থাকে না। সব ক্ষেত্রেই তাতে স্বতঃস্ফূর্ততার একটা উপাদান থাকে। হয়তো কোনো কবি কবিতা ভালো পড়েন, কোনো কবি ভালো পড়েন না। কিন্তু এই ভালো বা মন্দ পাঠের মধ্যে দিয়ে কবিতাটাই তিনি আঁকড়ে থাকেন, যার সঙ্গে যুক্ত থাকে তাঁর নিজের আবেগ। সুতরাং কবিতার গুণাগুণ শ্রোতার কান থেকে মুছে যায় না।

এমন দেখা যায় যে, কবিতার নিভৃত অনুরাগীরা যখন সেই অনুরাগ বশে কোনো বিশেষ কবির কবিতা অন্যদের পড়ে শোনান তখন তাঁদের পাঠের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য হয়। সুতরাং কবিতার পাঠে সেক্ষেত্রেও কি গোলমাল থাকে না?

এ সম্বন্ধে বলা যায়, যে-পার্থক্য ঘটে তা কবিতার প্রকৃতির জন্যেই ঘটে। আমরা জানি, লিরিক কবিতা, বিশেষত আধুনিক কালের কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই জটিল এবং গূঢ়সঞ্চারী। বিশিষ্ট শব্দ-সংযোগের মাধ্যমে তার তাৎপর্য এক এক জনের কাছে এক এক রকম প্রতিভাত হতে পারে। সুতরাং এ রকম কবিতা যাঁরা অন্যের কাছে পড়েন তাঁরা নিজের নিজের উপলব্ধি অনুসারেই পড়েন, যা সাধারণত এক হয় না। তাছাড়া, প্রত্যেকেরই পড়ায় একটা ভঙ্গি থাকে, যা তাকে অন্যদের পড়ার থেকে পৃথক করে। এর সঙ্গে ঠিক পড়া বা বেঠিক পড়ার সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

আধুনিক লিরিক কবিতা বড়ো হতভাগিনী। ছাপার অক্ষরে তার দিকে তাকিয়ে দেখার মানুষ খুব কম। সুতরাং সাধারণ্যে তার প্রচারের প্রয়োজন আছে। তার একমাত্র উপায় হল কণ্ঠের আশ্রয় নেওয়া। অর্থাৎ লোককে পড়ে শোনানো। সে কারণে কবিতা পাঠের আয়োজন করা বাঞ্ছনীয়। কবিতা জিনিসটা যে ফ্যালনা নয় তার চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়ে তাকে জনপ্রিয় করার জন্যে আলো, সংগীত, নাটকীয় কলাকৌশল ইত্যাদিও ব্যবহার করা যেতে পারে। সেজন্যে বেছে নেওয়া উচিত বিশেষ ধরনের কবিতা: যে-সব কবিতা উপলক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হলেও কোনো কাব্যিক ক্ষতি হয় না। কিন্তু সাধারণভাবে লিরিক কবিতা ঐ উপায়ে জনপ্রিয় করতে গেলে ফল উল্টো হবে: কবিতাই মারা পড়বে। আমি মনে করি জন সমক্ষে কবিতার সংবেদনশীল পাঠই যথেষ্ট কার্যকর। অবশ্য 'জন' বলতে আমি শিক্ষিত জন বোঝাচ্ছি না। কেন-না কবিতায় সাড়া দেওয়ার সঙ্গে তথাকথিত শিক্ষার কোনো যোগ আছে বলে মনে হয় না। কবিতার সংবেদনা যাদের থাকে তাদের জন্ম থেকেই থাকে, যাদের থাকে না তাদের হাজার পরীক্ষা পাসেও গজায় না। সুতরাং এ বিষয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বাছবিচার না করাই উচিত। পাবলো নেরুদার আত্মজীবনী থেকে আমরা তো জেনেছি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের বিচারে তাঁর যে কবিতাগুচ্ছ জটিল সাব্যস্ত হয়েছিল সেই কবিতা তাঁর মুখে শুনে খনি শ্রমিকরা কতখানি অভিভূত হয়ে পড়েছিল। আমাদের দেশে যেহেতু শিক্ষিতদের চেয়ে অশিক্ষিত-অনেক বেশি, সেহেতু অশিক্ষিতদের মধ্যে কাব্য-সংবেদীর সংখ্যা অনেক বেশি, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। অতএব শিক্ষিত অশিক্ষিত ভেদ না করে সর্বত্র সর্বসমক্ষে কবিতাপাঠের ব্যবস্থা করা উচিত। আমার বিশ্বাস, তাতে কবিতার পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হবে।

কবিতার পাঠ নিয়ে ভাববার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, বিশেষত যখন তাকে

ক্রমশই বেশি করে জনগণকে নিয়ে আসা হচ্ছে। আমার ভাবনাগুলো এখানে নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করলাম। এমন দাবি করি না যে, আমার দৃষ্টিকোণ অভ্রান্ত। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা কি কখনো করা যায়? অন্য দৃষ্টিকোণ, অন্য ভাবনা থাকতে পারে। যদি থাকে, চলুক না আলোচনা। তাতে তো আমরা লাভবানই হব।

আবৃত্তি—কী পাই কী চাই

সন্তোষকুমার ঘোষ

সুর ছিল, ছিল শব্দও। দেশ বিদেশের আদি শাস্ত্র যদি সত্য হয় তবে আদিতে শব্দই ছিল। আমরা বলি শব্দ ব্রহ্ম। ওরা বলে দ্য ওয়ার্ড ওয়াজ উইথ্ গড, দ্য ওয়ার্ড ওয়াজ গড। তবু আমি নিঃসংশয় নই। প্রকৃতি তো মানুষেরও আগে! নদী, সমুদ্র, নির্ঝর, বালুঝড়, বাতাস, আর মহাকাশ। হয়তো শন্‌শন্ অরণ্যও। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব একটা ধ্বনি আছে, আহত বা অনাহত সুর। মানুষের গলা কখনও বনের বাণীর নিরন্তরতায়, তটিনীর তরঙ্গের ভঙ্গিতে, সংগীতের ইশারা পেয়ে থাকবে। কাজেই প্রাথমিক মানবের কণ্ঠে আপাত অর্থহীন সুর ফুটে ওঠাও বিচিত্র নয়। সেই সুর সমুদ্র নদী আর অরণ্যের নকলে বা আদলে আদিম আর্তি, সেই স্বর শুধুই অব্যয়। ভয়ে, বিমূঢ় বিস্ময়ে, অথবা ব্যাখ্যাহীন বাধাহীন আনন্দে উল্লাসে তার উচ্চারণ। মানুষের। বলা যায় না এ ব্যাপারে তৎকালীন বন্যপশুরাও তার প্রেরণা হয়ে থাকতে পারে। সোজা কথায়, বোবা থাকলে চলবে না—ডাকতে হবে।

আমার ধারণা, কথা এসেছে পরে। কথা মানে বাক্ অর্থাৎ অর্থময়ী দেবী। তিনি সুরকে সঙ্গী করে নিলেন। গোড়াকার বাচনিক শিল্পতে তাই গান আর কাব্য মেশামেশি। যার যৌগিক নাম দীর্ঘকাল ছিল মন্ত্র। পরে প্রেম এমনকি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বানও সুরে-স্বরেই তরঙ্গিত হল। সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্বে বিস্তর প্রাণী যেমন উভচর, শিল্প সৃষ্টির একটি পর্যায়ে তেমনই। তখন লেখা তো নেই, শুধু বলা, শুধু গাওয়া। গান আর কবিতা মিলে এক—উভচর। শ্রেষ্ঠ নমুনা তখনই, ঋক্-এর অনেক সূক্ত আর যখন সামবেদ হয়।

কাব্য আর গীতি। পরে দুই শরিকের মতো এরা কবে আলাদা হয়ে গেছে। তবু পার্টিশানের পরও উভয়ে কোনও কোনওখানে আজও জড়িয়ে আছে। নবরত্ন সভায় কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব ও মেঘদূত

নিশ্চয়ই সুর সহযোগে শোনান? বলতে কি রামায়ণও যতটা মহাকাব্য ততটাই গান। বাল্মীকির প্রেরণায় লব কুশ কাহিনীটা গেয়েগেয়ে শুনিয়ে তাদের পিতৃদেবকে নাকি চমকে দেয়। তুলসীদাসের রামচরিত-মানস কিংবা কবীরের দোঁহা, তুলনায় এসব যদিও অর্বাচীন, তথাপি সুরসংসর্গের ঐতিহ্যে আজও সসম্মানে আসীন। এই ধারা পরবর্তী হিন্দী কবিতাতেও অব্যাহত। একই লাইন অন্তত দু'বার সুর করে আওড়ানো, সেই রীতিটা তো আছেই, তাছাড়া ওই ভাষায়, যতদূর জানি, কবিদের শুধু লিখেই খালাস নেই, কণ্ঠহারা হলেই মুশকিল। অর্থাৎ কী এখানকার চারণ কবিদের, কী ওখানকার ব্যালাড্-স্রষ্টাদের ঐতিহ্য সমানে চলছে।

ভিন্ন গোঠ বোধহয় এক বাংলাই। অন্তত এই ভারতে। এখানে গান—গানই। কবিতা—কবিতাই। সুর করে পড়ার রেওয়াজ নেই। সেইজন্যেই অন্যতর একটি প্রকরণ—আবৃত্তি। অনেককাল এই ব্যাপারটা নানা অনুষ্ঠানে ছিল অভিনয় বা সংগীতেরই আঁচলধরা। নিজের শিরদাঁড়ায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছে অতি অল্পকাল। যদিও আগে শিশির ভাদুড়ী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখের কিছু কিছু রেকর্ড শুনেছি, ডিস্ক্-এ প্রকাশিত হয়েছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও কিছু কিছু দিব্যকণ্ঠের ধ্বনি, তবু এর বহুল প্রচলন মোটামুটি আধুনিক। আবৃত্তিকে প্রথম উদাত্ত বিস্তারে যিনি প্রতিষ্ঠা দেন, তিনি সম্ভবত কাজী সব্যসাচী। তাঁর ভরাট স্বরাট কণ্ঠেই শ্রোতারা সম্মোহিত হয়ে যেতেন।

তিনি নেই, কিন্তু তাঁর তৈরি রাস্তাটা আছে। আছে তাঁর নির্ভীক অন্ত-নিরপেক্ষ সাহস। সেই সাহসকে মশাল করে, তাঁরই দেখানো রাস্তা ধরে আজ একটা মিছিল দেখতে পাচ্ছি। দেবদুলাল, প্রদীপ, অমিয়, পার্থ, গৌরী, কাজল প্রভৃতি নাম সেই শোভাযাত্রার অগ্রগামী সারি।

শুধু আবৃত্তি নিয়েই বের হচ্ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড। আবার গান না, নাচ না, শুধু আবৃত্তি দিয়েই একটা ভরপুর আসর? কী শৈল্পিক, কী ব্যবসায়িক এই পরিপূর্ণতা বছর কয়েক আগে ভাবাও যেত না। আজ শম্ভু মিত্র কবিতা পড়বেন, এই বার্তা যেই রটে গেল অমনই হাউস ফুল তো বটেই, হল্‌ও যেন ভেঙে পড়ে-পড়ে। আবৃত্তির প্রসঙ্গে তৃপ্তি মিত্র আর তাঁর কন্যা শাঁওলির কথাও উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি।

২.

কবিতা পাঠের দুটি দিক: একটি কবির নিজের কণ্ঠ। গলা যদি তেমন খোলতাই নাও হয়, তবু তাঁর বলাটার তাৎপর্য অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের রেকর্ডই ধরুন না কেন। শেষ বয়সের রেকর্ডসমূহে তাঁর উচ্চারণ ভঙ্গির হদিশ তো পাইই, জানি কোন্ অংশে কোন্ শব্দে ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক—তাছাড়া কবির নিজস্ব অভিপ্রেত একটা অর্থও কি বেরিয়ে আসে না আবৃত্তিতে? সেটাও দরকার। ওটা যেন মুদ্রিত একটি বইয়ের বিশেষ একটি "অথরস্ কপি"। হাজার হাজারের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি।

ইদানীং কিছু কিছু রেকর্ডে সক্ষম জনপ্রিয় আবৃত্তিকারদের পাশাপাশি কবিদের নিজেদেরও নিবেদন। এই সহঅবস্থিতি সপ্রশংসভাবে লক্ষ করি। আধুনিক অনেক কবিরই পড়া ভালো। না হলেও এর আলাদা একটা দাম থাকত। আর দাম তো তাঁদের আছেই প্রচলিত অর্থে কবি না হয়েও কবিতার প্রচার ও প্রসারকে ব্রত হিসেবে শিরোধার্য করছেন যাঁরা। ওঁরা সৃষ্টি হয়তো করেন না, তবু সৃষ্ট বস্তুর মর্মে প্রবেশে প্রয়াসী। যদি স্পর্ধা না হয় তবে বলি, এতখানি করলেন আর এতদূর এগিয়ে গেলেনই যখন, তখন এঁরা আরও একটু দূর যান না কেন? কবিতার শুধু মন নয় দেহ বা ছন্দের কৌশলকেও অধিকার করুন। যতটা রসনার উচ্চারণে, ততটাই মস্তিষ্কের জ্ঞানে। রাগ-রাগিণী গানের যা, ছন্দ কবিতার তা; এক কথায় ব্যাকরণ। আয়ত্ত হলেই এই শিল্পের উপহার উপচার সম্পূর্ণ হবে, হবে সব অর্থে সর্বার্থসাধক।

পুনশ্চ: এখানেই দাঁড়ি টেনে দেওয়া যেতে পারত। তবু আমার বিশৃঙ্খল মনে আরও দুটো কথা চমকে উঠল যে! কবিরা নিজের কবিতা যখন পড়েন তখন তাঁদের ঈপ্সিত মানে তো মেলেই। সেই পড়া থেকেও অন্যদের অবশ্যই কিছু না কিছু নেবার আছে। গলা না হলেও ছন্দটা, বলার কথাটা। আবার অন্যেরা যখন কবিদের কবিতা পড়েন তখনও কিন্তু নতুন একটা বোধ বা আয়তন মেলে। যেমন কবিকৃত ব্যাখ্যায় যে-পদ্যটা তালগোল পাকিয়ে যায়, অনেক সহৃদয় বিদগ্ধ অধ্যাপকের সুরসিক বিশ্লেষণে সেটাই প্রাঞ্জল বা জলজল্ হয়ে ওঠে। যেন বেদানার এক একটা দানা ছাড়ানো। তখন সেই বেদানা নিরাকার। সহসা বেদনা। অতএব আবৃত্তিকে যাঁরা সমর্থ বৃত্তি করছেন তাঁদের প্রাপ্য সমকাল আর উত্তরকালের কৃতজ্ঞতা।

আচ্ছা, কবিরা যখন অন্যের কবিতা পড়েন? তখনও কিন্তু দ্বিতীয় একটা তার টংকৃত হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার আলোচনা করলে যেমন

সেটা আলাদা শকুন্তলা [প্রাচীন সাহিত্য], তিনি শকুন্তলা পাঠ করলেও হয়তো সেটা এমন কোনও নাট্যকাব্য হ'ত বা হতে পারত যা কালিদাসেরই সমান্তর। একালের এক অগ্রণী কবির কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথেরই 'কণিকা'র কোনও কোনও কবিতার আশ্চর্য একটা আলাদা মানে হালকা তালে বেজে উঠতে শুনেছি।

আর না। কলেজে আমাদের দর্শনশাস্ত্রের এক তরুণ অধ্যাপক এলেই আমরা সমস্বরে বলে উঠতাম "আজ ফিলজফি নয় স্যার, আজ পোয়েট্রি"। আর অমনই তিনি হাজিরার খাতা, পড়ার বই সব বন্ধ করে চোখ বুজে মাঝে মাঝে একটা একটা বৃষ্টি-ঝাপসা বিকেলে মন থেকে বলতে শুরু করতেন "আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারংবার ফিরেছি ডাকিয়া"—লাইনের পর লাইন, অবিরল, অনর্গল। ভুলি কী করে, কী করেই বা ভুলি!

আবৃত্তির কথা

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৭১ সালের কথা। সে বছর সাতই জুলাই তারিখে এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে গিয়েছিলাম। সেদিন ছিল বাছাই পর্বের প্রাথমিক প্রতিযোগিতা এবং তার পরদিন ছিল চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। সাধারণত আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিচারক হয়ে যেতে উৎসাহ পাই না, কোনো-না কোনো অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। তবু কখনো কখনো যেতেই হয়, কারণ এমন ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে ডাক আসে যে এড়ানো যায় না।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় বিচারের ভার নেবার আমন্ত্রণ জানাতেই এসেছিলেন বন্ধুবর গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় যিনি 'কল্‌হন' ছদ্মনামে লেখক হিসেবে সুপরিচিত। কিন্তু সেদিন অন্য অনুষ্ঠান পূর্বনির্ধারিত ছিল ব'লে প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম। তার ওপর, গোবিন্দবাবুর মুখে যখন শুনলাম যে, আমাদেরই আর এক সাহিত্যিক-অধ্যাপক বন্ধু প্রলয় সেনও বাছাই পর্বে অন্যতম সহযোগী বিচারক থাকবেন তখন তাঁর সঙ্গলাভেও প্রলুব্ধ হলাম। বস্তুত যাঁরা গান করেন, ছবি আঁকেন, অধ্যাপনা করেন, সুর সৃষ্টি করেন কিম্বা যাঁরা গল্প-উপন্যাস লেখেন, কাব্য রচনা করেন তাঁদের সকলের প্রতিই আমি যেন কীরকম একটা শ্রদ্ধাজাত দুর্বলতা এবং বিস্ময়জড়িত আকর্ষণ অনুভব করি। সে হয়তো এসব ক্ষেত্রে আমার অপারগতার জন্যই।

প্রতিযোগীর সংখ্যা ষাটের কম নয়—এ খবর জানবার পর গোবিন্দবাবুর আমন্ত্রণও উপেক্ষা করতে দ্বিধাবোধ করতাম না কিংবা প্রলয়বাবুর সঙ্গলাভের লোভও তুচ্ছ জ্ঞান করতাম যদি সংগঠন-কর্তৃপক্ষ সর্বাগ্রে প্রতিযোগিতার ছোপ-ধরা কোনো কবিতা নির্বাচন করতেন। কিন্তু এঁরা তা না ক'রে বাংলাদেশের একালের জনপ্রিয় কবি শামসুর রহমানের 'ফিরে যাচ্ছি' কবিতাটি মনোনীত করায় এত খুশী হয়েছিলাম যে, কয়েক ঘণ্টা ধরে ঠায় বসে থেকে একজনের পর

একজনের মুখে একই কবিতা বারবার শোনার দুঃখভোগ করতেও এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। বলতে ভুলে গেছি, এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন বেলেঘাটা ছাত্র সংসদ। এ ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য রয়েছে দীর্ঘ দিনের।

আমি ঢের দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং সুকান্তের কয়েকটি মাত্র কবিতাই সচরাচর প্রতিযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। এই সব কবিতার সংখ্যা সর্বাসাকুল্যে দশ-বারোটির বেশি নয়। এই কবিতাগুলির মধ্য থেকে কোন একটিকে নির্বাচন ক'রে যাঁরা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন তাঁদের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধা হয় এই যে, প্রতিযোগী পাওয়া যাবে কিনা সে-সম্পর্কে কোনো দুর্ভাবনা থাকে না, খবরটা চাউর হয়ে গেলে প্রতিযোগীরা যে ভীড় ক'রে আসবেনই সে বিষয়ে তাঁরা সুনিশ্চিত থাকতে পারেন। কেননা, এই কবিতাটিই আবৃত্তি ক'রে যে প্রতিযোগী এর আগে তালতলায় প্রথম হয়েছিলেন তিনি এখানেও নাম দেন এই আশায় যে, এবারও প্রথম পুরস্কারটি তিনিই ছিনিয়ে নিতে পারবেন, আর যে প্রতিযোগী এর আগে কদমতলায় এই কবিতা বলে অল্পের জন্য প্রথম বা দ্বিতীয় হতে পারেন নি তিনি আসেন এই মনস্কামনায় যে, এবার হয়তো তাঁর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে। এই ভাবেই প্রতিযোগীর একটা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, প্রতিযোগিতার যে কোনো আসরেই এঁদের দেখা মেলে।

শিক্ষাগুরু এবং অভিভাবকরাও ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিতে এগিয়ে আসেন। কারণ, তাঁরাও একদিন তাঁদের কিশোর ও তরুণ বয়সে এই কবিতাগুলি আবৃত্তি ক'রেই পুরস্কার পেয়েছিলেন, আলমারিতে সারে সারে সাজানো কাপ ও পদকের দিকে চোখ পড়লে সেই স্মৃতি আজও ঢেউ খেলিয়ে ওঠে। আপন শিক্ষার্থী এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে কে না ভালোবাসে! বয়স থেমে থাকে না সেইহেতু গত পনেরো বিশ বছরে প্রতিযোগীর মুখই শুধু বদলেছে, প্রতিযোগিতার চরিত্র একটুও বদলায় নি। প্রতিযোগিতার আসরগুলো জমজমাট থেকেছে কিন্তু আবৃত্তি-শিল্পের কোনো অগ্রগতি হয়নি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই দশ-বারোটি কবিতা, সেই অতিমাত্রায় সুর টেনে বোধ-বর্জিত আবৃত্তি বড়ো কৃত্রিম বড়ো একঘেয়ে লাগে। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিচারক হওয়ার সাধ হয় না, কর্মব্যপদেশে আমন্ত্রণ এড়িয়ে যাই।

কিন্তু এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা সেই গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম ঘটাতে পেরেছেন দেখে, বহুদিনের কায়েমী ব্যবস্থার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের গণ্ডি

অতিক্রম করতে পেরেছেন দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমি গিয়েছিলাম আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে। অবশ্য সেই সঙ্গে প্রতিযোগীদের মুখে আধুনিক কবিতা শোনার আগ্রহও ছিল।

বলতে বাধ্য হচ্ছি, বড়ো হতাশা নিয়ে ফিরে এসেছি। অধিকাংশ প্রতিযোগীদের কণ্ঠেই সেই সাবেকী ঢঙে 'ফিরে যাচ্ছি' কবিতার আবৃত্তি শ্রুতিকটু লেগেছে। আসলে, প্রতিযোগিতার আসরগুলোয় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং সুকান্তের যে ক'টি কবিতা প্রায়শই ঠাঁই পেয়ে থাকে সেগুলি বছরের পর বছর মোটামুটি একই ঢঙে একই সুরে আবৃত্তি হয়ে আসছে। তার ফলে, এই কবিতা-গুলো আবৃত্তির এমন একটা ফর্মা বা আদল তৈরি হয়ে গেছে যে, স্রেফ সেই ভঙ্গি অনুকরণ করতে পারলেই, সেই শৈলীতে দাগা বুলোতে পারলেই আবৃত্তি একরকম উৎরে যায়, কবিতার ভাবার্থ ও বক্তব্য বোঝবার দরকার পড়ে না। এই ভাবেই চলে আসছে। আবৃত্তি বোধ-বর্জিত ভঙ্গিসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। এই অন্তঃসারশূন্য বহিরঙ্গসর্বস্বতা তখনই অতি মাত্রায় প্রকট হয়ে ওঠে যখন নতুন কোনো কবিতা আবৃত্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। বেশ কিছুকাল ধরে এই আশঙ্কা আমার মনকে আন্দোলিত করছে যে, এখনও সময় থাকতে যদি আমরা সতর্ক না হই তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আবৃত্তি কাটা গ্রামোফোন ডিস্কের মতো একই জায়গায় ক্রমাগত ঘুরপাক খাবে, সেই 'আফ্রিকা', 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'দুঃসময়', 'আমার কৈফিয়ৎ', 'সব্যসাচী', 'ফরিয়াদ, 'ছাড়পত্র , 'বোধন' ইত্যাদির মধ্যেই আবৃত্তি সীমাবদ্ধ থাকবে, আর না হয় তো হাতুড়ে আবৃত্তিকারদের হাতে প'ড়ে কবিতার নামে স্থূল কাব্যহীনতা প্রশ্রয় পাবে, আবৃত্তির রাজ্য থেকে বৈদগ্ধ ও মনীষিতা নির্বাসিত হবে, তখন অবিদ্যা এই শিল্পকে পুরোপুরি গ্রাস করবে। আমার এই আশঙ্কা যে অমূলক নয়, সেদিন তার প্রমাণ পেলাম 'ফিরে যাচ্ছি' কবিতার আবৃত্তি শুনতে শুনতে।

আবৃত্তি : সৌন্দর্যময় নির্মাণ

অমিয় চট্টোপাধ্যায়

বেশ কিছুকাল আগে এক সংবাদে দেখেছিলাম, একটি ব্রডকাস্টিং প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদল টেপ রেকর্ডার নিয়ে লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছেন নিচুতলার কবিতা-প্রেমী নাগরিকদের হিসেব কষতে। ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে শুরু করে শ্রমজীবী সব শ্রেণীর মানুষের কাছে মাইক্রোফোন ধরে তাদের কবিতা বলতে বলা হয়েছিল। শতাংশের হিসেবে সামান্য হলেও সাড়া তাতে মিলেছিল। অনেকেই তাঁদের প্রিয় কবিদের কবিতার কিছু কলি অন্তত বলতে পেরেছিলেন। এ থেকে একটা জিনিস বোঝা যায়, শুধু বুদ্ধিজীবী, ছাত্রছাত্রী বা সমঝদার সংস্কৃত মানুষই নয়, মোটা দাগের কিছু মানুষকেও কবিতা স্পর্শ করতে পারে। কবিতার আবেদন প্রায় সর্বত্রগামী। কবিতার জনপ্রিয়তা যাচাই করতে গিয়ে আমাদের দেশে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, একবার আশ্চর্য এক নিরীক্ষায় নেমেছিলেন। সে গল্প হয়তো অনেকেই জানেন। এক মুদির দোকানে বসে কবি তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন তাঁর নিজস্ব স্টাইলে। তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন বাংলা কবিতায় এই নতুন ছন্দটি পাঠক বা শ্রোতারা কেমন ভাবে নেবেন।

নিজের জন্যে কবিতা পড়া আর হাজার শ্রোতাকে শোনানোর জন্যে কবিতা আবৃত্তি করা—এ দুটোর মধ্যে কিন্তু অসীম ব্যবধান, একেবারেই আলাদা ব্যাপার। কাজেই আবৃত্তি সার্থক শিল্পরূপে পরিবেষিত না হলে তার আবেদন শ্রোতৃ-ইন্দ্রিয়কে কখনই স্পর্শ করতে পারে না।

যখন কবিতা তখন সেটা সাহিত্য, যখন সেই কবিতা আবৃত্তি করা হয় তখন তা অন্য শিল্প। শিল্প হয়ে সে আর একবার সম্পূর্ণ হয় অন্যভাবে। তখন প্রতিপাদ্যের পাশে এসে দাঁড়ায় নির্দেশ। সেই নির্দেশকেই আবৃত্তির নির্মাণ বলে আমরা অভিহিত করতে পারি।

আপাত বিচারে প্রতিপাদ্য নিয়ে কোনও গণ্ডগোল থাকার কথা নয়, শুধু কবিতা বিচারের মধ্যে দিয়েই সেই প্রাথমিক কাজ সেরে ফেলা সম্ভব। নির্মাণ নিয়েই নানা প্রশ্ন উঠতে পারে।

আবৃত্তির প্রকাশরীতি কেমন হবে তা আবৃত্তিকার নিজস্ব মনন ও মেধা দিয়েই নির্মাণ করবেন। তথাকথিত ছন্দোবদ্ধ এবং সহজবোধ্য কবিতাকেই তিনি নির্বাচন করবেন তেমন মেনে নেওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না। কঠিন গদ্যছন্দের কবিতাও আবেদন গ্রাহ্য হতে পারে। কাজেই কবিতা নির্বাচনে ষোল আনা স্বাধীনতাই আবৃত্তিকারের। শিল্পীর বিশ্বাস, বোধ এবং যুক্তি নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করবে, অন্য কেউ নয়। কোন্ কবিতার মর্ম তিনি শ্রোতাদের মরমে পৌছে দিতে পারবেন সেটা তাঁকেই বুঝে নিতে হবে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের নিরীখে। আপন ব্যক্তিত্ব আরোপ করেই মাপতে হবে নির্বাচনের সঠিকতা। শ্রোতার মর্জি যেন প্রশ্রয় পেয়ে আবৃত্তিকারের সেই মানসিকতার বিরোধী হতে না পারে। এক্ষেত্রে আবৃত্তিকারের অনেক বেশি সাহসী হওয়া প্রয়োজন।

আবৃত্তিকারকে সম্পূর্ণ পরিচিত হয়ে নিতে হবে নির্বাচিত কবিতার প্রতিমার সঙ্গে। কবিতার ভিতরের ব্যঞ্জনাটি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হবে অন্তরে, বাইরে প্রকাশের সময় সেই ব্যঞ্জনাকে বাজাতে হবে সঠিক সুরটি লাগিয়ে। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে আনতে হবে স্পষ্টতা। উচ্চারণ বিকৃতির ভার আবৃত্তি সইতে পারে না। বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে নির্ভুল উচ্চারণকে আয়ত্ত করতে হবে। শুধু মাত্র শব্দের উচ্চারণই নয়, প্রতিটি অক্ষরের উচ্চারণ সঠিক করতে হবে। ভাল আবৃত্তির মধ্যেও চ, ছ, জ, ষ, ঝ-এর উচ্চারণ অনেক সময় নির্ভুল হতে পারে না, ওই অক্ষরগুলির ওপর অকারণ ঝোঁক দেওয়ার ফলে। ভাল কবিতা পড়েন—এমন অনেকের মধ্যেই এ দোষ আমি দেখেছি। অনেক শব্দ আছে যেগুলো ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে কবিতার মধ্যে আসে। তাই স্বরাঘাতের অমোঘতা আবৃত্তিতে একটি প্রয়োজনীয় বস্তু। সুর করে টেনে টেনে অথবা অতি নাটকীয় ভঙ্গিমায় পড়ার প্রবণতা সংবেদনশীল স্বাভাবিকতার হানি ঘটাতে পারে, কবিতার গভীরতর ব্যঞ্জনাটিকে বেসুরে বাজিয়ে দিতে পারে। আবৃত্তি আর অভিনয়কে রবীন্দ্রনাথ কতখানি আলাদা করে ভাবতেন তা বোঝা যাবে কবিরই একটি অভ্রান্ত উক্তি থেকে। "আবৃত্তি আর অভিনয় দুটো স্বতন্ত্র শিল্প—কিন্তু দেখেছি, অনেকেই দুটোকে অভিন্ন মনে করেন। তাই গলা কাঁপিয়ে এবং হাত পা নেড়ে আস্ফালন করাকে তাঁরা চালিয়ে দেন আবৃত্তি বলে। আবৃত্তি বাচন শিল্প—অভিনয় আনুষ্ঠানিক শিল্প, আকারে সমধর্মিতা থাকলেও তাই

প্রকাশও প্রকারভেদ রয়েছে দুটোর মধ্যে।" (কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ: নন্দগোপাল সেনগুপ্ত)। আবৃত্তি চর্চা করার আগে প্রত্যেক আবৃত্তিকার এই রবীন্দ্র-নির্দেশকে স্মরণে আনতে পারেন।

কোনও শিল্পই প্রয়োগ অথবা নির্মাণের ব্যাপারে শেষ কথা বলে দিতে পারে না। নিরাকার সুর সব সময়েই অস্থির। আবৃত্তি-শিল্পের ক্ষেত্রেও এরকম না ভাবার কোনও কারণ নেই। অবশ্য অনেকে মনে করেন দীর্ঘ দিনের গবেষণা এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পকে নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার পর একটা জায়গায় এসে নীতি নির্ধারিত হয়ে যায়। তখন তার বিধি এবং প্রয়োগ-কৌশলের ব্যাকরণও খানিকটা শান্ত হয়ে যায়। যেমন হয়েছে মার্গ সংগীত শিল্পে। কিন্তু আবৃত্তি কলা সেই তুলনায় শিল্প হিসেবে খানিকটা দাপটহীন। অস্থিরতাও কম।

একটা কবিতার মর্ম একটাই। কিন্তু তাকে আবৃত্তি করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আবৃত্তিকারের প্রয়োগ-কৌশল পাল্টে যেতে পারে। এবং যেহেতু কৌশলের রকমফেরের মধ্যেই এই শিল্পের ব্যাকরণ (সংগীতের ব্যাকরণের মত পণ্ডিতিয়ানা সেখানে অনুপস্থিত) অথবা বিজ্ঞান নিহিত আছে, সেই কারণেই এমনটি স্বাভাবিকও। একটু আগেই আমি শিল্পে অস্থিরতার কথা বলেছি। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ চিত্রকলা। আধুনিক চিত্রকলায় যতরকম বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা হয় ততখানি অন্যত্র লক্ষিত হয় না। আধুনিক শিল্প হিসেবে চিত্রকলা নিয়মের বেড়ি যতখানি ছিঁড়তে পেরেছে, তেমন মাতাল হওয়া আর কোনও শিল্পশাখার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আবৃত্তি-শিল্প কতখানি জনপ্রিয় হতে পারে এমন প্রশ্ন ইদানীং খুব উঠছে। এ প্রশ্নের জবাবে অবশ্যই বলা যায়, শিল্প অথবা শিল্পী মাত্রেরই জনপ্রিয় হবার অবকাশ আছে। আবৃত্তি-শিল্প অথবা আবৃত্তিকারের ক্ষেত্রেও সে সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেওয়ায় কোনও বাধা নেই। প্রয়োগ কৌশলে বৈচিত্র্য আনতে পারলে এবং সমকালীন শিল্প-প্রেক্ষাপটকে স্বীকার করে নিয়ে বিশিষ্টতা রচনা করতে পারলে আবৃত্তি-শিল্পের মর্যাদা অথবা জনপ্রিয়তা বাড়তে পারে কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। অবকাশ কি নেই?

শিল্প মাত্রই বিকাশের দিকে উন্মেষমান। প্রতিভা অথবা মেধার উন্মেষ যদি উজ্জ্বল হয় তাহলে তার শিল্পকে সৌন্দর্যময়তায় সিঞ্চিত করতে সে সক্ষম। তার প্রকৃতি খানিকটা পাল্টে দিতেও সে অক্ষম নয়। ভাষার শিল্পরূপ সব সময়েই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং সেই কারণে association-এর প্রশ্ন এখানে শুরু থেকেই স্বীকৃত। শ্রোতার সঙ্গে আবৃত্তিকারের সম্বন্ধ স্থাপনও তাই স্বীকার্য। নিরাকার

মূলে প্রধানত দুটো শক্তি কাজ করে। প্রথমত শিল্পীর মেধা, অন্যদিকে শ্রোতার গ্রহণক্ষমতা। গ্রাহকের গ্রাহ্যতা যদি নিরীক্ষিত শিল্পরূপের সঙ্গে হাত মেলায় তাহলে তা জনপ্রিয় হবে—একথা মেনে নেওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। আবার অধিকাংশ গ্রাহকের কাছে অগ্রাহ্য হয়েও শিল্পের সদ্গতি অসম্ভব নয়—এমন থিয়োরিতে বিশ্বাস করারও ঐতিহাসিক নজির আছে। ভাল আবৃত্তি গ্রাহকদের প্রভাবিত করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

শিল্প বলেই তার বিবর্তনও আছে। আমাদের দেশেই মধ্যযুগে আবৃত্তি করার রীতি অন্যরকম ছিল। গানের মত সুর করে কবিতা বা পাঁচালি পড়া হত। এমন কী কখনও কখনও এইসব সুর করে পড়ার মধ্যে রাগ রাগিণীও এসে পড়ত। হিন্দী বা ওড়িয়ায় এখনও গানের ঢং-এ আবৃত্তি করার রেওয়াজ চালু আছে।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, সব দেশেই সুপ্রাচীন কাল থেকে আবৃত্তি চর্চা চলে আসছে। প্রাচীন গ্রীকদের আবৃত্তিপ্রীতির কথা ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি। সোফোক্লিস নাট্যকার হওয়ার আগে নিজে আবৃত্তি করতেন কোরাসের দলে। শ্রেষ্ঠ গ্রীক বাগ্মী ডেমোস্থিনিস তাঁর জিভের জড়তা কাটানোর জন্যে সব সময়ে ছোট্ট পাথরের টুকরো মুখে পুরে রাখতেন এবং স্পষ্ট উচ্চারণ ও সুকণ্ঠ বজায় রাখার জন্যে নিয়মিত কণ্ঠচর্চা করতেন। কণ্ঠ এবং উচ্চারণের জাদু দিয়েই তিনি ফিলিপ অফ ম্যাসিডনকে বক্তৃতার মঞ্চে পরাজিত করেছিলেন। ইতিহাস খ্যাত রোমান বাগ্মী সিসেরো জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর পর অ্যান্টনি-বিরোধী বক্তৃতায় সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত করেছিলেন। 'দি অরেটর' নামে একটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন, যার একটি অধ্যায়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণ রীতি সম্পর্কে দীর্ঘ একটি নিবন্ধ সন্নিবেশিত হয়। কোনও শব্দ উচ্চারণের সময় জিভের ক্রিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবহাররীতি অথবা কণ্ঠস্বরের মডুলেশন বা ওঠা-নামা কোন্ পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হবে, সে সম্পর্কে নির্দেশদান ছাড়াও অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতিও তিনি আলোকপাত করেছিলেন। প্রত্যেকটি অক্ষরে এবং শব্দে কীভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, দীর্ঘ বাক্য পড়বার সময় কখন কোথায় দম নিতে হবে যান্ত্রিকতাপুষ্ট না হয়ে—এসব নির্দেশও সিসেরো দিয়ে গেছেন দু' হাজার বছর আগে।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে গীর্জায় গীর্জায় ধর্মীয় গাঁথা আবৃত্তি করার জন্য শুধুমাত্র সুমিষ্ট কণ্ঠকেই ব্যবহার করা হতো। এই কারণেই সুকণ্ঠের অধিকারী অল্প বয়েসের ছেলেদের গলায় অস্ত্রোপচার করে সে-সব কণ্ঠস্বরকে চিরকালীন স্থায়িত্ব-

দেওয়ার পদ্ধতি ছিল। আবৃত্তি শিক্ষারও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা ছিল। সেকালের গুণদী ধারাতেই তখনও আবৃত্তি করা হত। প্রাচীন স্থাপত্যের মতই সেই গ্রপদীধারার মূল্য আজ নিরূপিত। যুগের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পরীতিও বিবর্তিত হচ্ছে, শৈলীর নবোন্মেষ হচ্ছে। আধুনিককালের প্রেক্ষাপটে এই উন্মেষ-শৈলীর মূল্য তাই অপরিসীম। ব্যক্তিত্বের মুন্সিয়ানা ট্র্যাডিশনকেও আত্মসমর্পণ করাতে পারে। অবশ্য এখনও অনেকে আছেন, যাঁরা রিজেক্টেড রক্ষণশীলতার সচেতন পক্ষপাতী। এমন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও দেখেছি, আধুনিক কবিতার আবৃত্তিতে যাত্রাধর্মী রস পেলে তাঁরা আনন্দ পান।

আসলে কাল গড়াতে গড়াতে সবকিছুর প্রেক্ষাপট পাল্টে দেয়, বদলে দেয় শিল্পরীতিকেও। প্রতিনিয়তই সে নিরীক্ষার সম্মুখীন। এসব নিরীক্ষার মধ্যে সৌন্দর্যের অনায়াস প্রবেশ যদি ঘটে তাহলে তাকে স্বীকার করে নিতে আমাদের বাধা কোথায়? ইংরেজ কবি ইয়েটস্ আবৃত্তি এবং কবিতা পাঠ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। সেসব পরীক্ষা সমালোচনার বাণে একদা বিদ্ধও হয়েছিল। ইয়েটস্ বিশ্বাস করেছিলেন সংগীতানুষঙ্গ কবিতা পাঠ বা আবৃত্তিতে আরো সৌন্দর্যময়তা আনতে সক্ষম। ইয়েটস্-এর নিরীক্ষার প্রতিধ্বনি ইদানীং কালের বি বি. সি-র প্রযোজনাতেও আমি শুনেছি 'Poetry and Music' নামে নিয়মিত একটি অনুষ্ঠানে। সে অনুষ্ঠানে আবৃত্তিকার বা অভিনেতা (কবি নন) যে কবিতা পড়ছেন তার সঙ্গে অনুষঙ্গ হিসেবে সমধর্মীয় সংগীত ব্যবহার করা হয়। এ অনুষ্ঠান শুনে আমার মনে হয়নি কবিতার শুদ্ধতার কোনও হানি হয়েছে। তার কারণ সেখানে অনুষঙ্গকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হয়েছে, কবিতাকে অতিক্রম করে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে সে কখনও যায়নি। কলকাতা রেডিয়োর বিবিধ ভারতী প্রচারতরঙ্গে সংগীত সহযোগে কবিতা পাঠের কয়েকটি অনুষ্ঠানকে সফল নিরীক্ষার সুফল বলা যায়। সম্প্রতি আকাশবাণী থেকে প্রচারিত আমার ও দেবদুলালের করা 'শিশুতীর্থ' আবৃত্তিতে ধ্বনি ও সংগীতানুষঙ্গ ব্যবহার করে কবিতাটিকে অনেক বেশি ব্যঞ্জনাময় করেছিলেন ধ্বনি সংযোজক রঞ্জন মিত্র।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'রবিহারা' কবিতাটি স্বকণ্ঠে রেকর্ডে আবৃত্তি করেন। এই আবৃত্তির রেকর্ডটি যাঁরা শুনেছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন ব্যাকগ্রাউণ্ডে বেদনা-নিংড়ানো একটি সুর বেহালায় বেজেছে। কাজী সব্যসাচীর কাছেই জেনেছিলাম 'রবিহারা' বেদনার এই করুণ সুরটি বাজিয়েছিলেন পরিতোষ শীল। কবিতায় সংগীতানুষঙ্গ প্রসঙ্গে সব্যসাচী তখন বলেছিলেন, "আবৃত্তিতে Music adoptation-এর ব্যাপারে আমি

পক্ষপাতী নিশ্চয়—যদি সত্যিকারের ভাল music হয়। এতে আমি খুব সাহায্য পাই, music অনেকখানি টেনে নিয়ে যায়।" তিনি নিজেও রেকর্ডে অনেক আবৃত্তির সঙ্গে সংগীত ব্যবহার করছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষাতেও, "কবিতার ভাব ও ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আলো ও সাংগীতিক ধ্বনির ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহ বোধ করি।"

রেডিয়োতে আমার প্রযোজনায় বিষ্ণু দে-র জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত দীর্ঘ কবিতা 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' একবার প্রচারিত হয়েছিল। এখানেও সংগীতের ব্যবহার ছিল এবং কিছু কিছু অংশ সুরারোপিতও (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র -কৃত) হয়েছিল। জ্ঞানপীঠ পুরস্কৃত এই কবিতার ধ্রুবত্বকে সার্থক সংগীত-অনুষঙ্গ আরো বৈপ্লবিক করতে পেরেছিল বলে আমার মনে হয়েছে। প্রয়োগের নির্বাচনটা কবির কলম থেকে আসুক কিন্তু প্রয়োগশৈলীতে যদি আর একটি উজ্জ্বল অনুষঙ্গ এসে কবিতার প্রতিমাকে স্পর্শ করে, তাহলে তাকে চাতুরিহীন অভিনবত্ব বলতে দ্বিধা কোথায়?

আবৃত্তি-শিল্পের উন্মেষ, বিশেষত রেডিয়ো, টি. ভি. এবং ডিস্‌ক্‌-এ, অনুষঙ্গ সহযোগে আরো বিকশিত হতে পারে। আমি বিশ্বাস করি না, গ্রাহক বা শ্রোতারা বাঁধা রীতির বাইরে আরো কিছু আশা করেন না। এবং যেহেতু এই শিল্পে নিয়মের অথবা নিষেধের খড়্গ হামেশাই শিল্পীর স্বাধীনতায় কোপ বসাতে যায় না, সে কারণে এর অনায়াস এবং সংবেদনশীল বিবর্তনও সম্ভব। তবে সে সব নির্মাণ কতখানি ভার সইতে পারবে, তা আগে থেকেই সম্পূর্ণ নিরূপণ করে দেওয়া যায় না। যেমন সমজাতীয় কোনও শিল্পের শেষ কথা শুরুতেই বলে দেওয়া যায়নি। শিল্পের ধারা আপনা থেকেই পাল্টে যায়। একটাকে বাতিল ক'রে আর একটি উন্মেষিত ধারাকে আশ্রয় করে। গ্রহণে বর্জনে গ্রাহকরা তার বিচার করেন। যদিও বর্জিত হলেই শিল্প অসার্থক—এমন যুক্তি সব ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

একালে ছাপার অক্ষরে দীর্ঘ আধুনিক কবিতার সঙ্গেও অনুষঙ্গ হিসেবে বিমূর্ত ছবি জুড়ে প্রকাশ করার প্রয়াস আমরা দেখতে পাচ্ছি। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ কবিতায় পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা সমধর্মী ছবি এবং শক্তির একটি সনেট সংগ্রহের সঙ্গে প্রকাশ কর্মকারের বিমূর্ত চিত্রকলার মৈত্রী অনেকেই হয়তো লক্ষ করে থাকবেন। কবির সঙ্গে চিত্রকর হাত মিলিয়ে সমগ্র নির্মাণে সৌন্দর্যময়তার ব্যাপ্তিই ঘটিয়েছেন। পাঠকও সেখানে প্রাপ্যের অতিরিক্তই পেয়েছেন। একবার ২১শে ফেব্রুয়ারির একটি অনুষ্ঠানে

বাংলাদেশ টি-ভি প্রযোজিত আবৃত্তির আসরে ঠিক এই ভাবেই কবিতা, ছবি ও সংগীতের অকৃত্রিম মৈত্রী আবৃত্তির নির্মাণকে অনুপম সৌন্দর্যময়তা দিয়ে গাঁথতে পেরেছিল। এসব নিরীক্ষা তো সাফল্যকেই চিহ্নিত করে।

আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে যে হাওয়া বইছে, যে সুর বাজছে, তারই সঙ্গে লয় মিলিয়ে কবিতা লেখা হচ্ছে! কবিতা আবৃত্তির শিল্পটিকে যদি সেই লয়ে বাঁধা যায় তাহলে ক্ষতি কি ?

পাঠ, আবৃত্তি : কিছু ভাবনা, কিছু কথা

প্রদীপ ঘোষ

কবিতার সঙ্গে খুব ছেলেবেলা থেকেই আমার আত্মীয়তা। ব্যক্তিগত আনন্দবেদনা প্রাপ্তি-বঞ্চনায় কবিতা আমার আশ্রয়। আনন্দের প্রকাশে বেদনার উপশমে বারবার কবিতা আমাকে উজ্জীবিত, সঞ্জীবিত করেছে। নিজের প্রয়োজনে অনেক বিনিদ্র রাত কেটেছে কবিতাকে নিয়ে। নিজের জন্য যেন কবিতা 'আমার ঘরের জিনিস।' কবিতার কাছে এই একান্তে আমি এক নিবিষ্ট পাঠক। একই তাগিদে যেমন কখনও বা সংগীতের শ্রোতা, কখনও ছবির দর্শক। এসবই নিজের জন্য। এখানে আনন্দের খোঁজ, আনন্দের ভোজ। এখানে সব ক্লেশ, ক্লেশ ও ক্লেদ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়—আত্মমগ্ন আনন্দ সন্ধান।

এখন কবিতা পড়ি অন্যের জন্যও। বুঝতে পারি নিজের জন্য আর অন্যের জন্য কবিতার কাছে যাওয়ার পার্থক্য ক্রমশ যেন বেড়েই চলেছে। কেননা যে কবিতা নিজের ভাল লাগে অনেক সময় সে কবিতা অন্যকে শোনাতে গেলে তার সৌন্দর্য, মাধুর্য, গভীরতা অনেকখানি কমে যায়। তেমন মর্মগ্রাহী হয় না। বুঝি এ কবিতা একান্তই ব্যক্তিগত, নিভৃত মননে, ধ্যানে, একাগ্র অনুরাগে তার আন্তরিক ঐশ্বর্য—নিবিড় অনুভবে নিঃসঙ্গ হৃদয়ই যার স্পর্শ পায়। দেখেছি অন্যের যে কবিতা ভাল লাগে বা চাহিদা, প্রাণ তাতে সাড়া দেয় না, এক রকমের অনুশীলনে অধীত মুন্সিয়ানায় পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। নয়ত আত্মম্ভরিতার নিষ্ঠুর অপবাদ জোটে। মাঝে মাঝে তবু এই অপবাদের শঙ্কাকে অস্বীকার করেও আজকাল নিজের ভাললাগা কবিতা অন্যকে শোনাতে চেষ্টা করি। কবিতাপ্রিয় শ্রোতার অনেক সময় তা মনকে নাড়া দিয়েছে। তবে সবসময় হয়েছে—এ কথা বলতে পারি না। অন্যের প্রয়োজনে কবিতার তন্ন-তল্লাসে রাত জাগায় ব্যক্তিগত আনন্দের বদলে উত্তেজনা হয়ত আছে। কিন্তু শ্রম আছে, শ্রান্তি আছে। আর নিজের জন্য কবিতায়

আছে বুঝি বিশ্রাম। অর্থাৎ আগেকার নিশ্চিন্ত পাঠকের ভূমিকা আর নেই। আবৃত্তিশিল্পীদের যতই কবিতা নির্বাচন ও প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নিয়ে জাহির করি না কেন, অকপট সত্য হল এখন অন্যের রুচি, পছন্দ, চাহিদাকেও অল্পবিস্তর মান্য করি। তাই কবিতা পাঠের বা আবৃত্তির আসরও নির্ভেজাল, নিরুপদ্রপ নয়। সেখানে, আবৃত্তি ইদানীং জনপ্রিয় হয়েছে, আবৃত্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প ইত্যাদি দাবি সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই নানান চমক দেওয়া চমকে দেওয়া কবিতা (?) অকবিতার হানাদারি, পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে নানা কিম্ভূত কাণ্ডকারখানা। কবিতাচর্চার সঙ্গে যার সম্পর্ক সামান্যই। যেখানে ভাব ও ভাবনার ফাঁকটুকু ফাঁকি দিয়েও ভরাতে হয়। এই আত্মবঞ্চনার দায় ব্যক্তিগত কবিতাচর্চায় নেই। অন্যের কানে পৌঁছে দিতে আমার প্রিয় কবিতাকেও বহিরঙ্গে নানান রঙের তুলি বোলাই। অনেক সময় প্রয়োজনে কখনও অপ্রয়োজনেও আপনপ্রিয় সরল কন্যাটিকে যেমন বিবাহবাসরে উপস্থাপিত করি—সালঙ্কারা, সাশ্রু-নয়না।

কবিতাও পাঠ থেকে আবৃত্তি যখন, তখন অনেক কথাই এসে পড়ে। এবার তারই ওপর কিছু আলোচনার চেষ্টা করি।

আমি নিজেকে একজন আবৃত্তিশিক্ষার্থী বলে মনে করি। তাই আবৃত্তি নিয়ে, আবৃত্তির মূল চেহারা—তার বিন্যাস, প্রকরণ প্রকাশ এ সব নিয়ে মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন তোলপাড় করে। অনেক কিছুরই এখন সঠিক উত্তর পাই নি। খুঁজছি—খুঁজতে হবে। শিল্প কাকে বলে. আবৃত্তি শিল্প কিনা এসব আমার কাছে স্পষ্টতর হবার অপেক্ষা রাখে। আবৃত্তি সম্পর্কে অনেক লেখা পড়েছি, আলোচনা শুনেছি, বর্ণাঢ্য প্রদর্শনীও দেখেছি, কিন্তু আবৃত্তি যেহেতু প্রয়োগশিল্প, তাই আবৃত্তি বলতে ঠিক কাকে বোঝায়—বিশুদ্ধ আবৃত্তি কি, আদর্শ আবৃত্তিকারই বা কে ইত্যাদি বিষয়ে নানা সংশয়ের নিরসন হয় না। পথের সন্ধান করে চলেছি। জানিনা এর শেষ কোথায়—লক্ষ্য কি—সেখানে যাবই বা কেমন করে। কবিতা বা কোনও রচনা আমার মনে যেমন ভাবে অনুরণিত হলো, আমিও তেমন আমার বোধ, বুদ্ধি, উপলব্ধি, কণ্ঠে প্রকাশের ক্ষমতা অনুযায়ী তা ব্যক্ত করবো—শুধু এতেই যদি আবৃত্তি সম্পূর্ণতা পেত তবে ভাবনা ছিল না—এত খোঁজাখুঁজির দরকার হত না। কিন্তু তা যেন আরও কিছু। সেই আরও কিছুটা কি তারই সন্ধান চলেছে মননে-অনুশীলনে। এও এক গভীর গবেষণা।

প্রথমেই একটা বিস্ময়কর সত্যের কথা বলি—আবৃত্তি পশ্চিমবঙ্গে যতটা প্রসারতা লাভ করেছে তেমন কিন্তু ভারতের আর কোনও ভাষায়, কোনও রাজ্যে

এমন কি প্রতিবেশী বাংলা দেশেও করে নি। ইয়োরোপ, আমেরিকা, কানাডার বহু জায়গায়ও অনুরূপ পরিস্থিতি। বিদেশে অবশ্য কোথাও কোথাও আবৃত্তি সম্পর্কে দ্বিধার মনোভাবও লক্ষ করেছি। এ সব জায়গায় আবৃত্তিকার বলে বিশেষ কেউ নেই তবে কবি-কণ্ঠে কবিতা পাঠের চাহিদা আছে যথেষ্ট। বিদেশের অনেক বিদগ্ধ কবিতাপ্রেমীর মতে কবির কাছ থেকে যা পাওয়া যায় সরাসরি তাই সত্যের, অর্থের, ভাবের যথাসম্ভব কাছাকাছি—পূর্ণতা যদি নাও মেলে। কিন্তু আবৃত্তিকারও একজন পাঠক মাত্র, তাঁর কাছে রচনায় গূঢ়তর ভাবার্থের আভাসের বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আবৃত্তিকার রয়েছেন কবি আর শ্রোতার মাঝখানে। কবি আর পাঠকে যে তন্ময় একান্ত সম্পর্ক সরাসরি গড়ে ওঠে, আবৃত্তিকার মাঝখানে থাকায় কবি আর শ্রোতার মধ্যে কি তা সম্ভব, নাকি সেখানে কবিকে আড়াল করে দাঁড়ান আবৃত্তিকার—শ্রোতার নিজস্ব বোধকে প্রভাবিত ক'রে। হয়ত পাঠক ভিন্ন অবকাশে কবিকে ভিন্নতর আমেজে পেতে পারেন আরও নিজের করে—শ্রোতা ধ্বনিভাষ্যে মর্মের গভীরতার বদলে অনুভূতির আগেই স্বর ও শ্রুতির ব্যঞ্জনায় স্পন্দিত, আন্দোলিত হন। কবি ও কবিতা যায় সরে,—কোনও এক বিখ্যাত কবির ভাষায় 'স্খলিত হয়ে'। কিন্তু একটা কিছু ত' ঘটে—শ্রোতার কান নয় মর্মেও যা আঘাত করে। আবৃত্তিকারের কণ্ঠ, প্রকাশভঙ্গিমা, স্বরক্ষেপন, ব্যক্তিত্ব সব মিলিয়ে শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। শ্রোতা হয়ত কবিতাটির প্রতি আকৃষ্ট হন আবৃত্তিকারের জন্যই। এমন তো শোনা যায়—শ্রোতা বলেন—এ কবিতাটা আগেও পড়েছি, শুনেছিও, কিন্তু উনি পড়ার পর এতদিনে মনে হলো যেন ঠিকঠিক উপলব্ধি করলাম। কিংবা, এ কবিতা যেন ওমুকের বলার জন্যই রচিত, আর কারো গলায় এটা তেমন খোলে না—যেমন গানের বেলাতেও কারো কারো বেলায় বলেন শ্রোতারা। তাহলে শুধু কণ্ঠ নয়, তার ব্যঞ্জনা নয়, স্বরক্ষেপন নয়, আরও কিছু মর্মভেদী ব্যাপার আছে যা মানুষকে শুধু তাৎক্ষণিক আবেদনে আবিষ্ট করে না, আনন্দ দেয় না—দীর্ঘদিনের জন্য মনের মণিকোঠাতেও জায়গা করে নেয়। আমার মনে হয় এখানেই আবৃত্তিকারের সার্থকতার প্রশ্ন এলো। কবিতাপাঠ আর আবৃত্তির পার্থক্যের সুর ধরা পড়লো বোধ হয় এখানেই। পাঠে শুধু মাত্র শব্দ উচ্চারণ—ছন্দ যতি বজায় রেখে—হয়ত বা শব্দের কিছুটা ওজন বুঝেও।

কিন্তু আবৃত্তি আরও গভীর, ব্যাপক, মর্মস্পর্শী যা অবশ্যই দীর্ঘমনন ও অনুশীলনসাপেক্ষ। এখানে মাত্রারও সামগ্রিকভাগে বিরাট তারতম্য। ব্যাপারটা পাঠ ও আবৃত্তির গুণ ও মাত্রাগত পার্থক্যের। কবি যখন আবৃত্তির নিজস্ব

চাহিদা পূরণ করেন তখন তা আর নিছক কবির পাঠ নয় আবৃত্তিকারেরই আবৃত্তি। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তিকার, নজরুল আবৃত্তিকার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আবৃত্তিকার। কিন্তু ঠিক সেই অর্থে বিষ্ণু দে নন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুন্দর শান্ত কণ্ঠের পাঠ ঋজু, স্পষ্ট, অর্থবহ।

অতীতে কবিতা ছিল শ্রাব্য। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় সেকাল ও একালের এই কবিতা শোনা ও কবিতা পড়ার ব্যাপার নিয়ে এক মজার ছবি পাই।

বিক্রমাদিত্যের সভায়
কবিতা শুনিয়েছেন কবি দিনে দিনে।
ছাপাখানার দৈত্য তখন
কবিতার সময়াকাশকে
দেয় নি লেপে কালি মাখিয়ে।
হাইড্রলিক জাঁতায়-পেষা কাব্যপিণ্ড
তলিয়ে যেত না গলায় এক-এক গ্রাসে,
উপভোগটা পুরো অবসরে উঠত রসিয়ে।

হায় রে, কানে শোনার কবিতাকে
পরানো হল চোখে দেখার শিকল,
কবিতার নির্বাসন হল লাইব্রেরিলোকে;
নিত্যকালের আদরের ধন
পাব্লিশরের হাটে হল নাকাল।
উপায় নেই,
জটলা-পাকানোর যুগ এটা।
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটলডাঙার অম্নিবাস-এ চড়ে।
মন বলছে নিঃশ্বাস ফেলে—
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য—
আর আমি যদি হতেম—কী হবে বলে।
জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে।
তোমরা আধুনিক মালবিকা,
কিনে পড় কবিতা

আরামকেদারায় বসে।
চোখ বুজে কান পেতে শোন না;
শোনা হলে
কবিকে পরিয়ে দাও না বেলফুলের মালা,
দোকানে পাঁচ সিকে দিয়েই খালাস।

অনেক বিশিষ্ট কবি যেমন মনে করেন কবিতা তাঁরা লেখেন আর পাঁচজনের সামনে উচ্চারিত হবার জন্য, অনেক কবি আশা করেন তাঁদের কবিতা আবৃত্তিকারদের কণ্ঠে ধ্বনিত হবার জন্য, অনেকে আবার তেমনি আবৃত্তিকে তেমন আমল দিতে রাজী নন।

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে জীবনানন্দের কবিতা একান্ত পাঠের জন্য—উচ্চারিত-আবৃত্তির জন্য নয়। তবে নির্লিপ্ত নিমগ্নমেজাজে জীবনানন্দের পাঠ তিনিও অনুমোদন করেছেন। এবং তাঁর নিজেরই (সুনীলবাবু) এক সাম্প্রতিক কবিতার বই-এর বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে—যে সব কবিতা আবৃত্তিকারদের মুখে-মুখে ফেরে এ বইএ সেই সব কবিতা……এ আবৃত্তিকারদের স্বীকৃতি বৈকি।

আবার কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন কবির দায়িত্ব লেখাতেই শেষ। বিষ্ণু দের বক্তব্য—যাঁর গলায় সুর আছে তিনি সুরেলা পড়তে পারেন। আমার সুর নেই গলায় আমি পড়িনা—আমার আসে না। এলিঅট, ডিলান টমাস এঁদের পড়া প্রধানত পাঠ—Good reading। অমার মনে হয় অর্থ বা ভাবের পার্থক্য নিয়ে যতটা নয় তার চেয়ে বেশি তার প্রকাশভঙ্গিমায়—কবি আর আবৃত্তিকারের পড়ার প্রভেদে। যদিও কবি-অধ্যাপক ড. নরেশ গুহর স্বীকারোক্তি—আবেগনিষ্ঠ শিক্ষিত গলায় আধুনিক বাংলা কবিতার ধ্বনিভাষ্য শুনে এ কথা উপলব্ধি করা অনায়াস হবে যে সার্থক কবিতা মাত্রেই তার বিষয়-বস্তু, শব্দ চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গী এবং ছন্দ সৌকর্য পার হয়ে শেষ পর্যন্ত ধ্বনিসম্ভব এক অলোকসামান্য রূপের জন্ম দেয়।

অর্থগত ব্যাপারেও যে সংকট নেই এমন নয়। কবি নিজেকে প্রকাশ করেন। আবৃত্তিকার তাঁর উপলব্ধিতে তা গ্রহণ করে পৌঁছে দেন শ্রোতাকে–সেই সঙ্গে নিজের বোধ, বুদ্ধি, অনুভব, অভিজ্ঞতাও যুক্ত হতে পারে, বক্তব্যও এসে যায় হয়ত বা। শুধু কবিতা নিয়েও কম সংশয় নেই যেমন—সুকান্তের 'প্রিয়তমাসু' কি বৈপ্লবিক সমাজচেতনার পরিপন্থী কবিতা? আমাকে অনেকে ত' তাই বলেছেন। বিষ্ণু দে'র 'ঘোড়সওয়ার' কেউ বলেন কুমারীমনের আকাঙ্ক্ষার, কেউ বলেন বিপ্লবের। রবীন্দ্রনাথের 'জন্মান্তর'?—শুধুই ব্যঙ্গ না প্রচ্ছন্ন কৌতুক বেদনার।

জীবনানন্দের দুঃখ কি বিষন্নতায় রিক্ত করে না প্রশান্ত নির্লিপ্তিতে মগ্ন? সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' কি ছোটদের জন্য—একি কমিক্যাল—হাসির কবিতা? আমার ত' মনে হয়েছে সমাজসচেতনায় কবিতা—নানা বৈষম্যের প্রতি বিদ্রূপের কবিতা বিচিত্র ছন্দে ও রূপকে। এমনি সব অর্থের সঙ্গে সঙ্গে পড়াও ত' বদলে বদলে যাবে। যাওয়া উচিত।

অর্থ নিয়ে অস্পষ্টতার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' গ্রন্থের "শাজাহান" কবিতাতেও পাচ্ছি যা নিয়ে প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে তাঁর পত্রবিনিময়।

বলাকার ৭ সংখ্যক কবিতা শাজাহান সম্পর্কে—৩……স্মৃতিভারে পড়ে আছি। ভারমুক্ত সে এখানে নাই—

"……শেষ দুটি লাইনের সর্বনাম 'আমি' ও 'সে'—যে চলে যায় সেই হচ্ছে 'সে' তার স্মৃতিবন্ধন নেই। আর যে অহং কাঁদছে সেই তো ভার-বওয়া পদার্থ। এখানে আমি বলতে কবি নয়, আমি-আমার করে যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা।"

প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৪৮

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে লেখা চিঠি ২১শে শ্রাবণ ১৩৪৪; "কবিতা লিখেছি বলেই যে তার মানে সম্পূর্ণ বুঝেছি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই। মন থেকে কথাগুলো যখন সদ্য উৎসারিত হচ্ছিল, তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা মানের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্তর্যামীর কাজ সারা হতেই সে দৌড় দিয়েছে। এখন বাইরে থেকে আমাকে মানে ভেবে বের করতে হবে—সেই বাইরের দেউড়িতে যেমন আমি আছি তেমনি তুমিও আছ এবং আরও দশজন আছে, তাদের মধ্যে মতান্তর নিয়ে সর্বদাই হট্টগোল বেধে যায়। সেই গোলমালের মধ্যে আমার ব্যাখ্যাটি যোগ করে দিচ্ছি—যদি সন্তোষজনক না মনে করো, তোমার বুদ্ধি খাটাও, আমার আপত্তি করবার অধিকার নেই।"

এরপর মানেটা :

"আমি জানি শাজাহানের এই অংশটি দুর্বোধ। তাই এক সময়ে এটাকে বর্জন করেছিলুম। তারপরে ভাবলুম কে বোঝে কে না-বোঝে সে কথার বিচার আমি করতে যাব কেন—তোমাদের মত অধ্যাপকদের আক্কেলদাঁতের চর্ব্য পদার্থ না রেখে গেলে ছাত্রমণ্ডলীদের ধাঁধা লাগবে কী উপায়ে?"

আবৃত্তিকার শব্দকে সঞ্জীবিত করেন, ভাব ও অর্থকে সঞ্চারিত করেন। শ্রোতার মনেও সেই ভাব ও অর্থের ক্রিয়া চলতে থাকে বলে এ দুয়ের মিলনটা খুব জরুরী। এবং এই মিলন মুহূর্তেই আবৃত্তি সার্থক, ফলপ্রসূ। নিছক পাঠ বা

উচ্চারণ নয়, আবৃত্তি তাই এক সৃজনধর্মী শিল্প। আবৃত্তিকার বিষয়ের মর্ম উপলব্ধি করেন বোধ, বুদ্ধি, অনুভূতি দিয়ে, মননে অনুশীলনে তাকে আবার অবয়ব দেন শ্রোতার সামনে তুলে ধরতে। প্রতিনিয়ত এই গড়া আর ভাঙা চলে শব্দকে নিয়ে—কবিতা নিয়ে, এমনকি বারবার বহুবার একই কবিতা বা শব্দ নিয়েও। তাই কবি যেখানে সুনিশ্চিত অর্থ নিয়ে পাঠক-শ্রোতাকে পরিচালিত করেন, মননশীল আবৃত্তিকার বহুতর ব্যঞ্জনার অবকাশে শ্রোতকে শুধু আকৃষ্ট বা আবিষ্ট করেন না—অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধও করেন। এ জন্যেই আবৃত্তিকার প্রয়োজন হলে ছন্দের কবিতায় লয়ের হেরফের ঘটিয়ে ভাবের গভীরতা আনতে—ছবি আঁকতে চেষ্টা করেন, তবেই না কবিতার ক্যানভাসে নানা রঙের শব্দগুলো সাড়া দেয়, নড়ে চড়ে, নাড়া দেয়। প্রত্যেক শব্দের একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল আছে—তা এত গভীর আর বিস্তৃত যে তাকে একবারেই ধরা যায় এমন নয়। কবিতার উপলব্ধি ও মনন থেকে এই শব্দ নানা স্তর পেরিয়ে যন্ত্রণা ও মমতায় আত্মপ্রকাশ করে। সচেতনতার নীচেও আছে কিছু অর্ধচেতন কিছু বা অচেতন। চিন্তা-চেতনার এই স্তরগুলো নিরন্তর স্পন্দিত হচ্ছে। কিন্তু শব্দ প্রকাশিত হবার পর কবির নিজের কাছেও তার অনেকটাই অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবৃত্তিকার মনন ও উপলব্ধিতে তাকে দিনে দিনে নিত্যনতুন করে পেতেও পারেন—যার ফলে শব্দের ব্যঞ্জনা ও বর্ণে হেরফের ঘটে। নিজের জীবনেই এমনটি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। বারবার চিন্তায়-চেতনায় নতুনতর রূপ প্রতিভাত হয়েছে। তেমন ভাবেই বদলেছে তার প্রকাশ। তাই বলে মূল কাঠামোটা—যেটা কবিতার ভিত্তি তা নড়বড়ে হলে চলবে না। প্রতিমা তৈরির বেলায় যেমন। ইমারত তৈরির বেলায় যেমন। এও ত' শব্দের ইমারত। কবির পাঠ এই সুস্থিত ভিত্তি প্রস্তুতে নিশ্চয়ই সাহায্য করে কিন্তু তার উপর সুরম্য প্রাসাদ গড়ে তোলেন আবৃত্তিকার। কবিতা তখন রঙে রূপে রসে প্রাণবন্ত প্রতিমা। প্রসঙ্গত বিষ্ণু দে'র একটি রচনার উল্লেখ করি :

"সৎ কবিরাও যে নিজেদের বা অন্যের কবিতা পাঠে সব শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করবেন তা আশা করাই অন্যায়। তবু কবির নিজের পাঠে ভিন্নমনা বা ভিন্নকণ্ঠ পাঠকেরও যে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সাহায্য হয়, তাতে সন্দেহ নেই। তাই একালের এক বিদগ্ধ সমালোচক ও মহাকবি যখন 'ফোর কোয়ার্টেটস্' নামক তাঁর বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা রেকর্ডিং-এর জন্য পড়েন তখন লেখকের ভূমিকায় লেখেন : লেখকের নিজের কবিতা পাঠের রেকর্ডে যেটা রক্ষণীয় তা হচ্ছে কবিতাটি রচনান্তে কবির কাছে কবিতাটির ধ্বনি আদৃত হয়। লেখকের রেকর্ডিং-এর মুখ্য

সার্থকতা হল ছন্দের তরঙ্গ পরম্পরার স্বরূপ নির্দেশ। আরেকজন পাঠক কবিতাটি আবৃত্তি করতে গিয়ে ঐ ছন্দস্রোতই যে অনুসরণ করবেন তার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু তিনি যদি লেখকটির পাঠভাষ্যে মনোযোগী হন, তাহলে তিনি অন্তত নিশ্চিত হতে পারবেন যে তাঁর পাঠের স্বকীয়তা স্বেচ্ছাকৃত, অর্থাৎ তাঁর পাঠের স্বাতন্ত্র্য অজ্ঞতাপ্রসূত নয়।"

কবিতা যে কেমন নতুনতর ব্যঞ্জনায় অভিনব রূপ নেয়—অনিবার্যভাবে শ্রোতার মনকে সমূলে নাড়া দেয় এবং তার প্রতিক্রিয়া যে কী দারুণ সঞ্চরমান তার অভিজ্ঞতা হল আমার সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ভ্রমণে। সেখানে নিতান্তই নিজের ইচ্ছায় দুই বাংলার কবিতাপ্রেমীদের কথা ভেবে আমার নির্বাচনে রেখেছিলাম 'সোনার তরী'র কবিতা "দুই পাখি"। চট্টগ্রামে প্রথম যখন পড়লাম—"এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালবাসে,/তবুও কাছে নাহি পায়/খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে,/নীরবে চোখে চোখে চায়"...ইত্যাদি। কর্ণফুলীর তীরে সেদিন সমবেত শ্রোতার ব্যথাদীর্ণ প্রাণের দীর্ঘশ্বাসে বাতাস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ বেদনাবোধ পাখির জন্য নয়, বলাবাহুল্য দুই বাংলার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের সহজতর সম্পর্কের প্রতিবন্ধকতার জন্য। বার বার তাই পড়তে হয়েছে, টেপ করে দিতে হয়েছে। এ কবিতার দিগন্ত কি সম্প্রসারিত হয়নি? আবার ২০- ১শে ফেব্রুয়ারি '৮২ রাত্রে ঢাকায় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের স্মৃতির মিনারে মধ্যরাত্রিতে আমাকে ভিড়ের মধ্যে চিনতে পেরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা যখন শহীদমিনারের ওপর নিয়ে গিয়ে মাইক্রোফোনে কিছু বলতে অনুরোধ করেছিলেন—অপ্রস্তুত, অভিভূত আমি। আমার দেশবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে হৃদয়ের গভীর থেকে সেদিন উৎসারিত হয়েছিল 'নৈবেদ্য'র কবিতা —"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়/দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়/লোকভয়, রাজভয় মৃত্যুভয় আর।" আমি উদ্দীপ্ত। বিস্তীর্ণ জনসমুদ্র উদ্বেলিত। আবৃত্তি এখানে অমোঘ মন্ত্রের মত কবিতাকে বাণীরূপ দিয়েছে সংকল্পের আত্মোদ্বোধনের। দেশ-কাল পরিবেশের গুরুত্ব এখানেই বুঝিবা। নয়ত এ কবিতা তো অহরহ কতশতবার এখানে-সেখানে আবৃত্তি হচ্ছে—এমন কেন হচ্ছে না। উল্টোটাও ঘটে। যেমন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত লং প্লে রেকর্ড শহীদ কাদরীর একটি কবিতা "তোমাকে, অভিবাদন প্রিয়তমা"—আবৃত্তি করেছি—মজার মেজাজ আনতে চেষ্টা করেছি। শুনেছিলাম কবির তা পছন্দ হয়নি—ঢাকার অনেকেরই হয়নি, আমি নাকি কবিতার সঠিক মর্ম বুঝতে পারিনি। এবার ঢাকা গিয়ে ব্যাপারটা শুধরে নিলাম কবির কাছ

থেকেই। এ কবিতা কৌতুকের তবে করুণ কৌতুকের—অপূরণীয় প্রতিশ্রুতির, তাই বিষণ্ণতারও। এ রকম হতেই পারে। তাই আবৃত্তিকারকে অনেক বেশি সংবেদনশীল—সেই সঙ্গে গ্রহণশীলও হতে হয়। মনের সব জানলা দরজা খোলা রেখেও কতটুকু আলোই বা তাতে ঢোকে। ঘরের বাইরে আরো আলো আরো আকাশ—অতএব জানার শেষ কই।

আবৃত্তি আজ প্রয়োগশিল্পের মর্যাদার দাবি নিয়ে এসেছে—অন্যান্য প্রকাশধর্মী প্রয়োগশিল্পের পাশাপাশি আবৃত্তিরও আসন। এখন তাই অনেক আবৃত্তিকার, অনেক আবৃত্তিসংস্থা। আবৃত্তি নিয়ে হৈ হৈ তুমুল আসর, সার্থক আলোচনা অর্বাচীন সমালোচনা, সঠিক-বেঠিক নানা জল্পনা-কল্পনা ইত্যাদি কত কী! আবৃত্তির ব্যাকরণ-প্রকরণ নিয়ে এই আলোচনায় কিছু বলছি না। সমবেত আবৃত্তি ও আবৃত্তির সংগঠিত আন্দোলন সম্পর্কে আমাকে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন। দু-এক জায়গায় আমি বলেছি-বা লিখেওছি। এ আলোচনার শেষেও সেই প্রসঙ্গে কিছু কথা রাখছি—নিতান্তই ব্যক্তিগত মতামত। আবৃত্তি আমার কাছে প্রধানত ব্যক্তিগত চর্চার জিনিষ, যদিও কে আবৃত্তি করছেন তার চেয়ে কি আবৃত্তি হবে সেটা আমার কাছে বেশি জরুরী—প্রয়োগক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন গান, ছবি আঁকা। আগেই আভাস দিয়েছি, কবিতাকে আমি আমার জীবনের প্রতিদিনের সঙ্গী মনে করি—তেমন ভাবেই চাই, গ্রহণ করি তেমন ভাবেই পাই। ব্যক্তিগত কবিতার দিকে আমার স্বাভাবিক আকর্ষণ, সেখানেই আমার আরাম আশ্রয়—অনেক যন্ত্রণার উপশম, অনেক বঞ্চনার সান্ত্বনা। আমার আবৃত্তিতে আমি বিষয় এবং শব্দের অন্বয়ে প্রয়াসী হই—শব্দের ব্যঞ্জনা আমাকে প্ররোচিত করে। আমি এই শব্দের ইমারত ভাঙি আর গড়ি—এই ভাঙা-গড়া প্রতিনিয়ত, নিত্য-নতুন—একই বিষয়েও। আমার কাছে তাই একই কবিতা কখনও পুরোন হয় না। কবিতার মধ্যে আমার এক নিজস্ব মজার নিত্য খোঁজার খেলা চলে। কখনও তা কারও ভাল লাগে কারও বা লাগে না। আগে এ নিয়ে মাঝে মাঝে বিচলিত হতাম। এখন অনেক নির্লিপ্ত হতে পারছি—কবিতার সঙ্গে একান্ত একাত্মতা আমার কাছে দিন দিন অনেক বেশি অমূল্য মনে হচ্ছে। তবে প্রত্যেক অনুষ্ঠানই আমার কাছে প্রথম অনুষ্ঠান বলে মনে হয়, সম্ভব হলে সেরকম প্রস্তুতির চেষ্টা করি। অবশ্যই সব সময় হয় না। যাক সে খেয়াল খুশির কথা, কিন্তু, এমন মেজাজে তো সমবেত আবৃত্তি চর্চা করা চলে না। সেখানে সবচেয়ে আগে চাই কর্ণধার, এক জোট করে সবাইকে এক সুরে কথা কওয়াবেন

বিনি। রোজ রোজ নতুন করে মত পাল্টালে তাঁর চলবে কী করে! তারপর বিষয় ও কবিতা নির্বাচন—সব কবিতা নিশ্চয়ই সমবেত আবৃত্তির হতে পারে না। সমবেত আবৃত্তি কিন্তু নতুন ব্যাপার নয়। সুপ্রাচীনকালে তো হতই। কেননা একক কণ্ঠে যা শোনা যায় না একাধিক কণ্ঠে তা জোরালো করে অনেকদূর পৌঁছে দেওয়া যায়। যেমন রবীন্দ্রনাথ অনেক ব্যক্তিগত এমন কি বিরহের গানও সম্মেলকভাবে করিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। কিন্তু তখন মাইক্রোফোন ছিল না তাই তার প্রয়োজন ছিল। আর সমবেত কণ্ঠ দীর্ঘদিনের অনুশীলনে শ্রোতার কাছে এমন নিখুঁতভাবে পৌঁছত যেন উচ্চকিত একক স্বর। এখনকার ব্যস্তজীবনে এত অনুশীলনের সময়, সামর্থ্য, ধৈর্য, কোনটাই তেমন সুলভ নয়। তাই সমবেত সংগীতে অনেক প্রতিষ্ঠিত সংস্থারও বিচ্যুতি অবধারিত। এইসব কারণেই শব্দ প্রকাশে সূক্ষ্ম কারুকার্যের ব্যাপারেও সমবেত উপস্থাপনায় স্বাধীনতা বা সুযোগ সীমাবদ্ধ। তবে 'হারমোনাইজ' করার পরীক্ষায় সুফল পাওয়া যায়। বক্তব্যধর্মী প্রতিস্পর্ধী প্রতিবাদের বা সংকল্পের কবিতায় আবার শব্দের প্রকাশে বিশেষ কারুকার্য থাকা উচিত নয় বলে মনে করি। তাতে শ্রোতা অলংকরণে আকৃষ্ট হয়, বক্তব্য অনুধাবনের অবকাশ মেলে না। এক্ষেত্রে শব্দ তাই সোজাসুজি শ্রোতার দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়া দরকার। ভাবের আতিশয্যে অর্থের না অভাব ঘটে—এ ধরণের আবৃত্তি মন্ত্রের মতো মন্দ্রিত হয়ে শ্রোতাকে স্পন্দিত, আন্দোলিত করবে—সমবেত আবৃত্তির এখানে অমোঘ সাফল্য। ব্যক্তিগত কবিতা প্রকাশে, যেহেতু আমি অবাধ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, যেহেতু সমবেত আবৃত্তির প্রাথমিক শর্ত হ'ল কর্মের প্রতি প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর স্থায়ী অবিচল নিষ্ঠা, সেহেতু আমার সংশয়, সমবেত আবৃত্তিতে ব্যক্তিগত কবিতার সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয়। কেউ যদি আমার এ সংশয় দূর করতে পারেন তাঁকে আমার আন্তরিক অভিবাদন জানাতে কখনই কুণ্ঠিত বোধ করবো না। দ্বিতীয় প্রশ্ন আবৃত্তির সংগঠিত আন্দোলন সম্পর্কে।

প্রশ্নটা আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। এক সঙ্গে আবৃত্তি করার জন্য সংগঠন? খুব ভাল কথা। এতে আপত্তি উঠবে কেন? সবার পক্ষে সব কবিতার বই কেনা সম্ভব নয়। কিন্তু, অনেকে মিলে তা সম্ভব। অনেকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায়—বিশেষত একই পথের পথিক হলে মত বিনিময়ে পরস্পরের চিন্তা চেতনা সমৃদ্ধতর হবার সুযোগ ঘটে। অনেকের স্থানাভাবে, উপযুক্ত সহায়ক পরিবেশের অভাবে কবিতাচর্চায় তেমন সুবিধা হয় না। একসঙ্গে অনেকে মিলে একটা জায়গা নেওয়া যায়, ছোট্ট গ্রন্থাগার গড়ে তোলা যায়, সবাই মিলে বলা

যায়, অনুশীলন করা যায়, প্রয়োজনে একে অন্যের নানারকম সাহায্য নেওয়া যায়, মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানও করা যায়—আরো অনেক কিছুই এমনি করা যায় আবৃত্তি সংগঠনের দৌলতে। কিন্তু তারপরও কিছু থেকে যায়—তা হল আমার মতে কবিতার সঙ্গে একান্ত একাত্ম সম্পর্ক গড়ে তোলা, যে জন্য ব্যক্তিগত চর্চার কোনও বিকল্প নেই। সুতরাং আমরা এরকম ভাবতে পারি যে আজকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক টানা-পোড়েনের দিনে সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত দু ভাবেই শিল্পচর্চা করতে হবে। তবু আবার বলছি, শিল্পের লক্ষ্য সামাজিক হলেও শিল্পী কিন্তু ব্যক্তিনির্ভর—নিছক সাংগঠনিক অস্তিত্ব নয়। এটা আমার ভাবনা, জানিনা ঠিকমত বলতে পারলাম কিনা। এরপর কিন্তু একটু খটকা লাগছে ওই 'আন্দোলন' শব্দটা নিয়ে—কিসের আন্দোলন? কার বিরুদ্ধে আন্দোলন? কি তার পথ ও পদ্ধতি? এ ব্যাপারে সংক্ষেপে আমার কথা বলি—আবৃত্তি কিন্তু এখনও যতটা ভাবছি ঠিক ততটা মানুষের মনে পৌঁচেছে কিনা আমি নিঃসন্দেহ নই এখনও। আমার কেমন যেন সন্দেহ, এখনও এটা মনের চেয়ে কানকে যেন একটু বেশি টানছে। এটা যত বেশি মনের দিকে ফিরবে তত এর দীর্ঘস্থায়ী আবেদন বা অবদান—নয়ত সুবাতাসের বদলে দমকা হাওয়া নিয়েই খুশী থাকতে হবে। ভালো কবিতা, গভীর মননের কবিতায় শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতে হবে। সে রকম কবিতাও যে সংখ্যায় অনেক তা নয়। এবং পুরোন কবিরা সব বর্জনীয় নতুন মাত্রই গ্রহণযোগ্য এ মনোভাবও এক ধরণের উন্নাসিকতা। আবৃত্তি যখন একটি প্রকাশধর্মী শিল্প তখন তার নিজস্ব কিছু মূল্যবোধের প্রতি সম্ভ্রমবোধ দরকার সবচেয়ে আগে। এই মর্যাদাবোধ না থাকলে আন্দোলনের ভিত্তি দাঁড়াবে কিসের ওপর? অন্যান্য আবৃত্তি সংগঠন, বিভিন্ন জায়গার সংস্থা ও শিল্পীদের একত্র করে সংঘবদ্ধ প্রয়াসে এগুনো যেতে পারে যাতে রেকর্ডে, বেতারে, দূরদর্শনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি প্রচারের ব্যবস্থা হয়। সরকার বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে সব সাংস্কৃতিক বিষয়ে শিক্ষার্থী-বৃত্তি দেন সেখানে আবৃত্তির স্বীকৃতি আদায়, একত্রে ভাষাবিদ্ উচ্চারণবিশারদদের সঙ্গে কাজ করে সর্বগ্রহণযোগ্য উচ্চারণবিধি নির্ধারণের চেষ্টা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক অনেক কিছুই আমাদের কার্যসূচীর অন্তর্গত হ'তে পারে। অন্যান্য শিল্প সম্পর্কে যেমন গ্রহণযোগ্য মান আলোচিত আছে, তেমনি আবৃত্তি নিয়েও আলোচনার জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতায় প্রকাশিত একটি পত্রিকা, তা হলে পাঠ বা আবৃত্তি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি কমবে, আশা করি হ্রাস পাবে আবৃত্তি নিয়ে নানাজনের অবুঝ অকারণ মন্তব্যও।

প্রতিবেশী বাংলাদেশে গ্রাহকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ অথচ এক ক্রমশ বিস্তৃত অভিনব সাংস্কৃতিক প্রয়াস 'শ্রোতার আসর'। ভাল গান—রবীন্দ্রসংগীত, দেশাত্মবোধক, লোকসংগীত, কবিতা অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে যার বাজারে কাটতি কম তার রেকর্ড বিশিষ্ট শিল্পীদের কণ্ঠে প্রকাশ করে বাজারের পণ্য হিসেবে হাজির না করে গ্রাহকের হাতে তুলে দেন। এমনি রেকর্ডক্লাব, শ্রোতার আসরের কথা, আমরা ভাবতে পারি না সবাই মিলে? ঢাকায় কবিদের কণ্ঠে পাঠ দর্শনীর বিনিময়ে শুরু হয়েছে। ক্যাসেট ত' বিক্রিও হচ্ছে ভাল। অথচ আবৃত্তির ব্যাপারে বাংলাদেশে এখানকার মত বিশাল বিচিত্র কিছু নেই। গ্রামোফোন রেকর্ড বলতে আলাদাভাবে কবিতার একটি রেকর্ডই আছে—৭৭ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের ২০জন কবির কবিতার আমার করা লং প্লে। আর সব এখান থেকে প্রকাশিত রেকর্ডের ক্যাসেট। আবৃত্তি নিয়ে ওঁদের ভাবনাও শুরু হয়েছে। আমরা সাহায্য নিতে বা দিতে পারি। কী সুন্দর শ্রদ্ধানম্র এই নিবেদন। অথচ অর্থকরী দিক থেকে সাংস্কৃতিক মূল্যেও কত কার্যকরী। অন্তত আবৃত্তি নিয়ে আন্দোলনের এই মুহূর্তে এর বেশি আর কিছু করার আছে কি? ও হাঁ, আর—সংগঠন বা শিল্পী যা বা যিনিই হোক বা হোন, পারস্পরিক কুৎসা প্রচার একদম বন্ধ করতে হবে—আবৃত্তি আন্দোলনের এটাই প্রথম এবং প্রধান কাজ।

কৃতজ্ঞতা:

ছন্দনীড়, সব্যসাচী, স্টেটব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া অফিসার্স এসোসিয়েশন—বেঙ্গল সার্কল, আবৃত্তি বিষয়ক পত্রিকা, হাওড়া ব্রাঞ্চ-এর প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানের স্মারকপত্র।

কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে

পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবৃত্তির কোনও স্বরলিপি নেই। রেলগাড়ির মত বাঁধা লাইনের ওপর দিয়ে আবৃত্তি চলে না। এ হিসেবে, বিষয়টি গানের থেকে শক্ত।

আমাদের ছোটবেলায়, স্কুলে আবৃত্তি ও পড়ার ওপর জোর দেওয়া হত। একটি ভিন্ন বিষয় হিসেবে আবৃত্তির পরীক্ষা হত।

প্রাচীন তপোবনের শিক্ষায় আবৃত্তির বড় জায়গা ছিল। দেহ-মনের সামগ্রিক পূর্ণতার উপাদান হিসেবে, বিষয়টিকে যোগ-ব্যায়ামের মত ধরা হত।

এর বৈজ্ঞানিক কারণ হল, আমাদের দেহ-মনের সজ্ঞান এবং অজ্ঞান সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড, মগজের আলাদা আলাদা নটি প্রকোষ্ঠে ভাগ করা হয়েছে। অংশগুলো একটা নরম থলথলে পিণ্ডের মধ্যে গায়ে গায়ে লাগা। এর যে কোনও একটা অংশ সক্রিয় হলে, মগজের সব অংশগুলোতেই তার ঢেউ লাগে। এতে পুরো মগজটারই ব্যায়াম হয়। মগজের এই অংশগুলোর সব থেকে বড় ভাগটাই আওয়াজ ও কথার। হুংকার না ছাড়লে সিংহের দেহযন্ত্রে একাগ্রতার সন্নিবেশ হয় না। মানুষের বেলাও, ভয়, দুঃখ, রাগ, অনুরাগ, এর সব কিছুই কোনও আওয়াজ, কী কিছু কথার সঙ্গে মিশে স্পষ্ট চেহারা নেয়।

দম এবং মুখগহ্বর আর কণ্ঠের পেশীর সাহায্যে, স্বর ও ধ্বনি উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত প্রভৃতি ভাগে ভাগে প্রকাশ পায়। মাত্র একশো বছর আগে এই কলকাতা থেকেই এই সব বিভাগ ও ব্যবহার সম্পর্কে বই ছাপা হয়েছে। সংস্কৃত উচ্চারণের ব্যাকরণ থেকেই মূলত এইসব চর্চা করা হয়েছে। সংস্কৃতে স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণগুলোই অনেকটা স্বরলিপির কাজ করে। বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে এলেও, বর্ণগুলো সেভাবে আর উচ্চারণ করা হয় না। শুধু তা-ই নয়, স্বরবর্ণের সঠিক উচ্চারণে আমরা এতো অনভ্যস্ত যে, কোনও বিশেষ প্রয়োজনের

ক্ষেত্রেও, সঠিক উচ্চারণটি আমাদের আসে না।

রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতায় সংস্কৃত উচ্চারণকে অপরিহার্য করার চেষ্টা করেছেন। যেমন: "কেন পান্থ এ চঞ্চলতা, কোন্ শূন্য হ'তে এলো কার বারতা,"—কবিতাটিতে।

সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের ক্ষেত্রে, বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সংস্কৃত ছন্দ আনতে চেষ্টা করেছেন। যেমন:

ধবল ফেনায় ফুটুক তোমার পাগল হাসির আভাস ফেনিল,

প্রলাপ তোমার বিলাপ তোমার আলাপ তোমার শোনাও হে নীল।

সংস্কৃতে এই ছন্দে আছে:

স্মরান্তকংপুরান্তকংভবান্তকংমখান্তকং

গজান্তকান্ধকান্তকন্তমন্তকান্তকংভজে।

শিশির ভাদুড়ী মশাই, স্বরবর্ণের উচ্চারণের হ্রস্বতা দীর্ঘতা আয়ত্তে রাখার জন্যে কিছু সংস্কৃত আবৃত্তির অভ্যাসের কথা বলতেন। বলতেন, ওতে জিহ্বার আড় ভাঙে।

অন্যান্য আচার আচরণের মত আমাদের বলায়ও নানা রকম মুদ্রাদোষ থাকে। এ মুদ্রা দোষ এক-একজনের এক-এক রকম। নিজে থেকে চেষ্টা না করলে অন্যের পক্ষে এই মুদ্রাদোষ বুঝিয়ে দেওয়া শক্ত। এর কারণ, নিজেদের কথাগুলো আমরা, কানের পর্দার বাইরের আর ভেতরের দুদিক থেকে শুনি। অন্যের কথা শুনি, কেবল কানের পর্দার বাইরের দিক থেকেই। একটা হাতঘড়ি মুখে চেপে, কানের বাইরের দিক বন্ধ করে একটু নিভৃতে বসলে—ঘড়ির টিক্‌টিক্ শোনা যাবে। কানের এই দুপিঠ থেকে শোনার অভ্যাস, অনুভূতি আর স্মৃতির সঙ্গে মিশে উচ্চারণকে এবং সেই সঙ্গে উচ্চারণের নিজস্ব মুদ্রা-দোষকেও এত আপন করে নেয় যে, উচ্চারণ হিসেবে তাকে আলাদা করে ধরা মুস্কিল হয়।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন, আমরা বেশির ভাগ মানুষই, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারেও মুদ্রাদোষে দুষ্ট। এই দোষই নাকি আজকালকার কতগুলি কঠিন রোগের মূল কারণ। আবৃত্তির ক্ষেত্রে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অর্থাৎ দমের ভূমিকা খুব বড়। মনে আছে, আমাদের বাল্যকালে, একজন মাস্টারমশাই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকভাবে নেওয়া এবং চুপ করে বসে চিন্তা করার একটি ক্লাশ নিতেন। ভাবনার বিষয় ছিল স্বপ্ন। অর্থাৎ কে কি স্বপ্ন দেখেছি তা ঠিকভাবে ভেবে বলতে হত।

গানের বেলা, কথাগুলির নিজস্ব অর্থ এবং যে কটি কথা একসঙ্গে মিলে একটি ভাবকে স্পষ্ট করে, এ নিয়ে গায়কের খুব একটা মাথা না ঘামালেও চলে। কিন্তু আবৃত্তির বেলা তা চলবে না। কথার অর্থ অনুযায়ী দম-কে ওঠাতে নামাতে হবে। আর, কয়েকটি কথার বিশেষ অর্থবোধক সমন্বয় অনুযায়ী, দমের মধ্যের একটানা ভাবকেও বজায় রাখতে হবে। যে-কোনও অবস্থায় দম-কে ভাঙা চলবে না। আবার এখানে অন্য মুস্কিলও আছে। তা হল, কোথাও জোরের সঙ্গে একটা কথা বলতে হবে, তখন আমরা স্বরে যত না জোর আনি তার থেকে বেশি জোর দিই মুখ গহ্বরের আর গলার পেশীতে। এই পেশীর জোরের সঙ্গে আবাল্য যারা অভ্যস্ত—নিজের দেহে ঐ জোরটা অনুভব না করলে, তাঁরা বুঝতেই পারেন না, কথাটা জোর দিয়ে বলা হল কিনা।

আবৃত্তির সঙ্গে মেলোড্রামা বলে যে কথাটা প্রচলিত, তাও, আবৃত্তি যিনি করছেন এবং আবৃত্তির শ্রোতা, এই দু-পক্ষেরই অভ্যাসের দোষ-গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আবৃত্তি করা ও আবৃত্তির সমালোচনা করা, কোনোটাই মুদ্রাদোষের আওতার বাইরে পড়ে না। কাজেই যিনি আবৃত্তি করবেন, তাঁকে যতটা সম্ভব নিজের মুদ্রাদোষ, উচ্চারণের যৌক্তিকতা এবং যে কবিতা আবৃত্তি করছেন, সেই কবিতার ভাষা ও ভাব প্রকাশের ভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন থাকতে চেষ্টা করতে হবে।

আমাদের দমের একটা সাধারণ দোষ, গোড়ার দিকে উঁচুতে থেকে শেষের দিকে নেমে যাওয়া। আবার অনেকের দম এমনভাবে ওঠা নামায় অভ্যস্ত থাকে যা কবিতার ভাবের কোনও তোয়াক্কাই করে না। দমের এই সব ম্যানারিজ্‌ম্‌ সম্পর্কে সতর্ক থেকে, ভাবটিকে আপন করে প্রকাশ করতে হবে। রচনার ভাবটির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে।

কবি লেখেন। আবৃত্তিকার তাকে অর্থময় ধ্বনির ওঠা-পড়া-থামা রেশ টানার মধ্য দিয়ে অনুভূত করে তুলবেন। কাজেই আগে দেখে নিতে হবে, কবিতাটি আবৃত্তির যোগ্য কিনা। কবিতা মাত্রেই আবৃত্তির উপযোগী নয়। যে সব কবিতা আমরা আবৃত্তি করি, সাধারণভাবে তা চারটি ভাগে ভাগ ক'রে নেওয়া যায়। ছন্দ প্রধান, সুর প্রধান, ভাব প্রধান, কাহিনী প্রধান।

ছাপার অক্ষরে, সব 'ক' সব 'খ' সব 'গ'-ই এক মাপের। আবৃত্তির বেলা কিন্তু সব অক্ষরই এক মাপের বা এক রকমের নয়। এই মাপের ভিন্নতার জায়গাগুলোই আবৃত্তির নিজের ক্ষেত্র।

"সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন" এই

ছন্দের তিনটি 'সব'-ই ছাপার অক্ষরে এক মাপের। অথচ আবৃত্তির ক্ষেত্রে এই তিনটি 'সব'-ই এক মাপের নয়।

প্রত্যেক আবৃত্তির আগে, এইসব বিশেষ মাপ বা ওজন সম্পর্কে স্পষ্ট করে বুঝে নিতে হবে।

ছন্দ প্রধান কোনও কবিতায়, ছন্দটাই একমাত্র শোনাবার বিষয়—তা কিন্তু নয়। কথাটা হল আবৃত্তির মধ্যে ছন্দটির যেন পরিচয়-থাকে।

"শক্তি মায়ের ভৃত্য মোরা নিত্য খাটি নিত্য খাই
শক্ত বাহু শক্ত চরণ চিত্তে সাহস সর্বদাই।"

এ ধরনের রচনায় ছন্দ এত প্রকট যে, যে-কোনও ভাবেই আবৃত্তি করা যাক না কেন তা স্পষ্ট হয়ে উঠবেই। কিন্তু যে কবিতায় একটি মিষ্টি অন্তঃশীলা ছন্দ প্রবাহিত, অথচ আবৃত্তিকালে অসতর্ক থাকলে ঐ মিষ্টত্বটুকু পাওয়া যাবে না, সেখানে ছন্দ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। এ ধরনের একটি কবিতা:

"পুণ্য লোভীর নাই হোলো ভীড়
শূন্য তোমার অঙ্গনে
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়
পার্বনক্ষণ নাই মুখরিল
ঘন জনতার গর্জনে
অতিথি ভোগের না রহিল সঞ্চয়…"

আবার: "আমলকি বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরুদুরু
পেয়েছে খবর পাতা খসানোর সময় হয়েছে শুরু।"

এখানে, "কাঁপে" আর "যেন তার" এই দুয়ের মাঝখানে খুব হুঁশিয়ার ভাবে, একটু ফাঁকও দিতে হবে, আবার একত্র ভাবটি রাখতে হবে। ঠিক এরকমের আর একটি দৃষ্টান্ত হল:

"রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন সত্যি হয় না আহা
ঠিক যেন এক গল্প হতো তবে;—"

এখানে "সত্যি হয় না" আর "আহা"-র মধ্যে ছন্দোময় ভাবেই একটু ফাঁক দিতে হবে।

আবার 'পুরাতন ভৃত্য', 'দুই বিঘা জমি' বা 'দেবতার গ্রাস' জাতীয় কাহিনী-প্রধান কবিতায়, ছন্দকে সচেতনভাবে ভেঙে দিয়ে কাহিনীকে স্পষ্ট ক'রে তোলাই আবৃত্তির কাজ।

সুরপ্রধান একটি কবিতার উল্লেখ করি—কেননা এর বেশি তো আর লেখায় করা যাবে না। যেমন বুদ্ধদেব বসুর 'সেরেনাদ' :

ঘুমাও, ঘুমাও ; আঁখি দুটি তব এসেছে ঢুলে,
কঙ্কাবতী !
ঘুমাও, ঘুমাও ; রেখো না জানালা রেখো না খুলে,
কঙ্কাবতী !
প্রদীপ নেবাও, নেবাও নয়ন—তন্দ্রা নামে,
তন্দ্রার ঢেউ সমুখে-পিছনে, ডাহিনে-বামে,
কঙ্কা, শোনো !
হাওয়ার আওয়াজ গান গেয়ে যায় তোমার নামে,
হাওয়ার আঙুল চুলবুল করে তোমার চুলে,
কঙ্কা গো !
মাতাল বাতাস কত কী যে কয় মনের ভুলে—
কঙ্কা, শোনো,
কঙ্কা গো !

ভাবপ্রধান ব'লতে যে ধরনের কবিতার কথা বলছি তা হল—যেমন :

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপনে চাই
বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে—"

ভাবপ্রধান, ছন্দপ্রধান, সুরপ্রধান বা কাহিনীপ্রধান, আমাদের আলোচনার সুবিধের জন্যে এই ভাগগুলো ক'রে নেওয়া হল। আসলে এমন নয় যে একই কবিতায় এই সব অংশগুলোই থাকবে না। তাও থাকতে পারে। এ ধরনের একটি কবিতা যা চট করে মনে এলো, তা হল, যতীন্দ্র বাগচীর 'কেয়া ফুল।' "কেয়া ফুল, চাই কেয়া ফুল"—কবিতাটি।

কবি যখন কবিতা লেখেন, তখন সব সময়ই তিনি আবৃত্তি সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থেকে লিখবেন তা কিন্তু নয়। যেমন "রানার" কবিতাটিতে যেখানে আছে—"রাত্রির পথে পথে চলে", সেখানে ছন্দের দিক থেকে ভাগটা হবে, "রাত্রির পথে—পথে চলে" এরকম। কিন্তু অর্থের দিক থেকে "পথে পথে" কথাটা একত্রে বলার দরকার। যদি থাকতো—"চলে রাত্রির পথে পথে" অর্থাৎ "চলে" কথাটা যদি পথের পরে না থেকে রাত্রির আগে থাকতো, আবৃত্তির দিক থেকে বেশি সুষ্ঠু হত। রবীন্দ্রনাথের ভারি মিষ্টি ছন্দের একটি কবিতায় আছে—

"গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন
দুমুঠো অন্ন তারে দুই বেলা দেন"

উচ্চারণের দিক থেকে সেনের সঙ্গে যে কথাটির মিল দেওয়া হয়েছে তা হবে স্তান। রবীন্দ্রনাথকে এটুকু কেউ ধরিয়ে দেওয়ায় তিনি নাকি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'সেন'টা পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে লেখা হয়েছে।

আবৃত্তি বিষয়টিকে দু একটি লোক সব সময়ই মূল্য দিয়ে আয়ত্ত ক'রে থাকতেন। কিন্তু জনসাধারণের সামনে বিষয়টিকে এককভাবে, আপন গৌরবের ভূমিকায় উপস্থিত করার প্রয়াস—সবে শুরু হয়েছে। স্কুলের পাঠ্যসূচীতেও এর ওপর সম্প্রতি কিছু নম্বর রাখা হয়েছে।

আমি বলবো—জাতিকে গড়ে তোলার দিক থেকে এটা একটা কাজের মত কাজ। মানবিক মূল্যবোধ জাগানোর উপাদান হিসেবে আবৃত্তি একটা বড় শিল্প।

প্রসঙ্গ : আবৃত্তি

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছন্দের সম্যক জ্ঞান না থাকলে যেমন একজন সম্পূর্ণ কবি হওয়া যায় না, তেমনিই যিনি সফল আবৃত্তিকার হতে চাইবেন তাঁকে সর্বাগ্রে ছন্দের বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হতে হবে। ছন্দের জটিল শিল্পের বিষয়ে একেবারেই কোন কিছু না জেনে একজন হয়ত সহজাত বুদ্ধির সাহায্যে সহজ মিল সম্বলিত একটি কবিতা বা কবিতা নামক রচনা অবিশ্বাস্য দক্ষতায় নিখুঁতভাবে পাঠ, এমনকি আবৃত্তিও করতে পারেন। কিন্তু ছন্দ নিয়ে যে কবিতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, ছন্দের জটিল কলাকৌশলের সঙ্গে যেখানে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত হয়ে থাকে কবিতার অন্বয়, সেক্ষেত্রে তার পাঠ ও আবৃত্তি এই ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত কারণেই মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। দুঃসাহস ও পাহাড়-প্রমাণ অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে তিনি যখন এ ধরনের কবিতা পাঠ করতে যান তখন ব্যর্থতা অতি দ্রুত এসে তাঁকে গ্রাস করে। তিনি যদি তাঁর অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করতে পারেন তাহলে ভালো। কিন্তু না পারলে অন্যের উচিত তাঁকে কিছু শিখিয়ে দেওয়া। আবৃত্তি শিক্ষিতের শিল্প বলেই এমনটি করা উচিত।

ছন্দের জ্ঞান না থাকলে সজাগ কানও সব সময় খুব একটা পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না। ছন্দের জ্ঞান থাকলে তবেই গদ্য কবিতা নিখুঁতভাবে পড়া যেতে পারে। নতুবা নয়। মনে রাখতে হবে আবৃত্তিই শুধু স্বনির্ভর শিল্প নয়, আবৃত্তিকারও এমন একজন শিল্পী যাঁকে সাহায্য করতে অন্যান্য শিল্পীর মত রঙ, তুলি, বাদ্যযন্ত্র, কালি কলম, মুখোশ, পরচুলা বা ইত্যাকার কোন বস্তুরই সৃষ্টি হয়নি আজ পর্যন্ত। তাঁর সম্বল শুধু নিজস্ব কণ্ঠ, কাব্যরুচি ও কবিতার খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে যথাযথ সচেতনতা, যার কোন একটির অভাবই তাঁর শিল্পী হওয়ার পক্ষে বেশ বাধার সৃষ্টি করতে পারে। মঞ্চে কবিতার প্রতি সুবিচারের দায়িত্ব আবৃত্তিকারের। কবির রচনা তখন সব অর্থেই

তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এ কথা ভেবেই আবৃত্তিকারকে দায়িত্ববান হতে হবে। কবিতার প্রতি, কবির প্রতি এবং সর্বোপরি শ্রোতাদের প্রতি।

ছন্দের পর আসে উচ্চারণের কথা। ছন্দ না জানলে কবিতার বিশেষ বিশেষ শব্দের উচ্চারণও ব্যাকরণসম্মত হয় না। তাছাড়া ছন্দের বাইরে সাধারণভাবেও উচ্চারণ সম্বন্ধে মনোযোগী ও সতর্ক হতে হবে। এখনও পর্যন্ত 'ই' এবং 'ঈ'-এর উচ্চারণে অনেকে ভুল করেন। ভুল করার চেয়েও যে ব্যাপারটি বেশ মারাত্মক তা হল ওই ভুল শুধরে নেওয়ার ব্যাপারে অনেকেই চেষ্টা পর্যন্ত করেন না। অনেকে আবার নিজস্ব অভিপ্রায় অনুযায়ী কবিতার অন্তর্বর্তী অনেক শব্দের উচ্চারণ তরঙ্গায়িত করে তোলেন। এখানেই আমার আপত্তি। কবিতার পাঠ মানে স্তোত্রপাঠ নয়।

এ তো গেল আবৃত্তির কারিগরি দিকের কথা। এ বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞান প্রতিটি আবৃত্তিকারেরই থাকা প্রয়োজন। না থাকলে তাঁকে আবৃত্তিকার হিসেবে স্বীকার করতে আমার বাধবে। কিন্তু কবিতার কলাকৌশল ও শৈলীর দিকটুকুই শুধু জানলে চলবে না, আবৃত্তিকারকে সমাজসচেতন হতে হবে, হতে হবে একেবারে হালফিলের কবিতা বিষয়ে ওয়াকিবহাল। আবৃত্তিযোগ্য কবিতা শুধু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা জীবনানন্দই লেখেননি, একেবারে অখ্যাত অজ্ঞাত কবিরাও এমন অনেক কবিতা লিখেছেন যার পাঠ বা আবৃত্তি জনপ্রিয় হতে বাধ্য। কিন্তু সচরাচর দেখা যায় আবৃত্তিকারেরা পরিচিত কবিতা নির্বাচনেই স্বস্তি পান। খুব একটা ঝুঁকি নিতে চান না তাঁরা। পরিচিত কবি ও কবিতার ক্ষেত্রটিকে আর একটু প্রসারিত করার চেয়ে, অপরিচিত বা অল্প পরিচিত কবির যোগ্য রচনাকে শ্রোতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে কৃতিত্ব অনেক বেশি। একেবারে হালফিলের কবিতার আবৃত্তি একই সঙ্গে নবীন কবিকুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রে যুক্ত করবে। এছাড়া তরুণদের কবিতার আবৃত্তির আরেকটি দিকও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যুগ ও সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে নতুন কবিতার ভাষা, ভঙ্গি ও বিষয়ও বদলে যাচ্ছে। সামাজিক পরিবর্তন ও তার খুঁটিনাটি বিষয়ের ছায়া পড়ে কবিতায়। সুতরাং যুগ ও সমাজের সঙ্গে যোগসূত্রের প্রয়োজনে আবৃত্তিকারকে নতুন টাটকা রচনা নির্বাচন করতেই হবে। মনে রাখতে হবে শিল্প কোথাও থেমে থাকে না। তার বহতা স্রোতে অবগাহন করতে হবে আবৃত্তিকারদের। পুরনো কবিতার ঐতিহ্যের পাশাপাশি নিজেদের যুক্ত করতে হবে নতুন কবিতার জীবন্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে। এটাই হবে তাঁদের সমাজ সচেতনতার পরিচয়। তাঁরা তার পরিচয় রাখতে পারলে জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষার

সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন। নতুবা ভাবীকালের কাছে তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে।

এবং শুধু কবিতা বা কাব্যনাট্য বা সুললিত কবিত্বময় গদ্যরচনাপাঠেই আবৃত্তিকারদের তৃপ্ত থাকা উচিত হবে না। বাংলায় নাটক পাঠের কোন ঐতিহ্য এখনও কোন অজ্ঞাত কারণে সৃষ্টি হয়নি। অথচ চারপাশে এখন বেশ ভালো ভালো নাটক লেখা হচ্ছে। অভিনয় ছাড়াও সেগুলি পাঠেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। আবৃত্তিকাররা এগিয়ে আসুন। সৃষ্টি করুন নাটক পাঠের নতুন ঐতিহ্য। তাঁরা উদ্যোগী হলে অচলায়তন পরিবেশে আস্তে আস্তে সাড়া জাগবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আজ আবৃত্তিকারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যার অভাব দেখি তা কল্পনাশক্তির। নতুন কিছু করার আগ্রহে তাঁরা ভরপুর। কিন্তু সেই তুলনায় নেই পরিকল্পনা ও সমকালীন সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ। এই যোগাযোগ থাকলে তাঁরা এতদিন নতুন কিছু করার পথ খুঁজে পেতেন। শুধুমাত্র প্রেম বা বিপ্লবের কবিতা বা তথাকথিত গণকবিতার আসরে গলা মেলাতেন না। আবৃত্তি স্বনির্ভর শিল্প হলেও অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে সে বিচ্ছিন্ন নয়। আবৃত্তিকারেরা তাঁদের শিল্পের স্বনির্ভরতা চেয়েছেন, কিন্তু নিশ্চয় বিচ্ছিন্নতা তাঁদের কাম্য নয়। কিন্তু তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন বলেই আমার ধারণা। অথচ আবৃত্তিশিল্পের সম্ভাবনা প্রচুর। নতুন নতুন সম্ভাবনার দিগন্তগুলি উন্মোচিত করেই আবৃত্তিশিল্প বাঁচবে। মনে রাখতে হবে স্বনির্ভরতা কখনই আবদ্ধতার সমার্থক নয়।

কবিতার শরীর ছুঁতে পারলেও আবৃত্তি কি শিল্প?

দিলীপ ঘোষ

এতো আমাদের খুব চেনা ছবি : একদিকে, দূরে, জাহাজ ভাসছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে সাগরজলে ; আর একদিকে, খুব কাছে, তটভূমিতে বসে একটি বালক, আপন মনে, অত্যন্ত যত্নে, গড়ে তুলছে তার বালির প্রাসাদ।

জাহাজ আমরা নির্মাণ করি প্রয়োজনে, আমাদের বাঁচার তাগিদে ; আর বালির ওপর বালকটির প্রাসাদ-গড়া তার প্রাণের তাগিদে, মনের তাড়নায়, প্রকাশের ব্যাকুলতায়।

আলোকিত পৃথিবীর কতটুকু প্রয়োজন আছে, সে হিসেব শিল্পী রাখেন না যখন তিনি তাঁরই বেদনার অন্ধকারে পরম যতনে ফুটিয়ে তোলেন ফুল। কত দূর যে ছড়িয়ে যেতে পারে তাঁর সৃষ্টির সুবাস তা পরিমাপ করার দুরূহ দায় সযত্নে এড়িয়ে যান যে-কোন প্রকৃত শিল্পী।

এই তো সেদিনকার কথা ; প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সামান্য মাত্র ক'জন দর্শক। মঞ্চের উপর দিয়ে প্রশ্রয়ে উড়ে যাচ্ছে দু' একটি আদুরে পারাবত। মঞ্চের এ-দিক থেকে ও-দিকে সম্ভ্রান্ত পদক্ষেপে হেঁটে যাচ্ছে দুগ্ধ শুভ্র একটি মার্জার। প্রাসাদ-আঁকা ছিন্ন-মলিন 'ক্যানভাস'-এর পর্দায় চোখে পড়ার মত বেশ বড় বড় ছিদ্র। সেইসব ছিদ্রে ধরা পড়ছে পর্দার ও-ধারে কোন মঞ্চ-কর্মীর অসাবধান চলন-ছবি। আর এই আভিজাতিক প্রেক্ষাপটে মঞ্চের উপরে দীনতায় অনুজ্জ্বল পোষাক-আশাক পরে রঙ্-চটা সিংহাসনে ব'সে আলমগীরের স্বপ্ন-দেখার অভিনয় করছেন অভিনেতা। বাহ্যিক জগৎ তখন তাঁর কাছে তুচ্ছ। তখন তিনি সম্রাট। সামান্য ক'জন প্রজা নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ তাঁর সাম্রাজ্য। অথবা আপন খেয়ালে, হৃদয়ের ব্যাকুলতায়, অভিনেতা অভিনয় করছেন যেন নিজেরই বৈঠকখানার ঘরে বসে। কেউ দেখুক বা না দেখুক, হাততালি পড়ুক বা না পড়ুক, কী বা আসে যায়!

এই রকম বিরল মুহূর্তে একজন অভিনেতা (ACTOR) হয়ে ওঠেন

শিল্পী (ARTIST) এবং তাঁর সৃষ্টি হয়ে ওঠে শিল্প (ART)। আমরা তো অনেকেই অভিনয় করি কিন্তু ক'জন হয়ে উঠতে পারি শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মত শিল্পী (ARTIST) ?

আমাদেরই অসাবধানে 'ART' বা 'শিল্প' শব্দটির প্রকৃত অর্থ থেকে আমরা স'রে এসেছি অনেকটা। শব্দটির 'ভাব'কে হালকা করে ফেলেছি হয়ত-বা আমাদেরই বহনের অক্ষমতায়। শিল্পীর খেয়াল-খুশি-মত তৈরি সব সৃষ্টিই যেমন 'আর্ট' হ'য়ে ওঠে না, তেমনই 'শিল্প' নিয়ে নাড়াচাড়া করে একনিষ্ঠ পরিশ্রমে সহস্র বিন্দু রক্তক্ষয় করলেও আমরা অনেকেই 'আর্টিস্ট'ও হয়ে উঠতে পারি না।

এমন একটা সময় যাচ্ছে যখন আমরা কিছুতেই বোধহয় মেনে নিতে পারছি না যে, 'আর্টিস্ট' হয়ে-ওঠা সহজ-সরল ব্যাপার নয়। 'আর্টিস্ট' হয়ে-ওঠার মধ্যে কী যেন একটা আছে যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। একজন কবি তো আমাদের শুনিয়েইছেন—'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি'। তাই কী 'আর্টিস্ট'—এই মোহময় অভিজাত শব্দটি দিয়ে আমরা নিজেদের চিহ্নিত করতে ভালবাসছি? কেননা এই শব্দটির দ্যোতনা আমাদের পৃথক করে ফেলতে পারছে চারপাশের আমাদেরই মত অন্য মানুষ-জন থেকে। এই কারণেই কী আমরা, যারা নিপুণ দক্ষতায় গান করছি, যন্ত্রে কোন সুর বাজাচ্ছি, অভিনয় করছি কিংবা কবিতা আবৃত্তি করছি, আনন্দে নিরানন্দে প্রেক্ষাগৃহের দর্শক-শ্রোতাকে হাসাচ্ছি-কাঁদাচ্ছি, নিজেদের চিহ্নিত করছি 'আর্টিস্ট' বলে? এবং সেই সুবাদেই কী আমরা PERFORMER-রা যা-যা উপস্থাপন করছি, ব্যাকরণিক শুদ্ধতার মারপ্যাচে তা সবই হয়ে উঠছে ART বা শিল্প? সবই কী উঠে আসছে আমাদের সেই বেদনার-অন্ধকারে-ফুটে-ওঠা-ফুল হয়ে?

এই ধন্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের নিশ্চিত করে জেনে নিতে হবে যে, আমরা যারা কবিতা পড়ছি বা আবৃত্তি করছি, নিজেদের কতখানি 'শিল্পী' করে তুলতে পারছি এবং 'শিল্পী' (!) রূপে আবৃত্তি করছি বলেই 'আবৃত্তি' যথার্থই একটি স্বতন্ত্র 'শিল্প' হয়ে উঠছে কিনা।

কোন ভুল থেকে গেলে, অকারণেই নষ্ট হবে আমাদের শ্রম এবং সময়। হাতছাড়া হয়ে যাবে অনেক করণীয় কাজ। সকলে মিলে-মিশে একটা কাজে নামার চেয়ে আর কী বা ভাল হতে পারে। কিন্তু যেহেতু মঞ্চে বা বেতারে বৃন্দগান (CHORAL SONG) কয়েক'টিমাত্র ক্ষেত্রেই শ্রোতাকে দাঁড়

করিয়ে দেয় ভিন্নরূপে, অভিজ্ঞতার ভিন্ন ভূমিতে, তাই কী, সমবেত কবিতা আবৃত্তির প্রচেষ্টা। এখানে বে-খেয়াল হলে চলবে না যে, গঠনে এবং সুরে 'কোরাল সং'-এর গোটা অবয়বটাই আলাদা। এমন দিন কী আমরা প্রত্যাশা করতে পারি, যখন কবিরা তাঁদের সেই বেদনার অন্ধকার থেকে এমন দু' একটি যন্ত্রের ফুল তুলে দেবেন আমাদের হাতে যার পাপড়িগুলো নিয়ে, আমরা, সমবেত প্রচেষ্টায়, আমাদের মত করে নতুন ফুল বানিয়ে তা 'শিল্প' বলে উপহার দিতে পারব শ্রোতাদের? বিভিন্ন মানসিকতার ক'জন কবির দু' একটি কবিতার কিছু কিছু বাছাই অংশ আমাদের বুদ্ধিমত জুড়েজাড়ে সাংগঠনিক ক্রমে সমবেত কণ্ঠে মঞ্চে, বেতারে বা 'টি ভি'-তে উপস্থাপন করলে কবিতাকে সঠিক মর্যাদায় সম্মানিত করা যাবে তো? ভেবে দেখার প্রয়োজন—এসব ক্ষেত্রে ভাবনা-চিন্তায় আমরা কোন ভুল করে বসছি না তো!

উত্তর খোঁজার সময় এসেছে—কেন একজন বিদগ্ধ দায়িত্ব-সচেতন কবি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন—আবৃত্তিকাররা কবিতা আবৃত্তি করেন, কেউ ঝাঁপিয়ে, কেউ লাফিয়ে, কেউ বা কাঁপিয়ে? কেন অনেকেই আবৃত্তিকে স্বতন্ত্র 'শিল্প' বলে মেনে নিতে নারাজ? কেনই বা ভুলে যাই, আপন মনে নিজের ঘরের কোণেই হোক বা জনসমক্ষে মঞ্চেই হোক, কবিতা আবৃত্তির তাগিদ আসে প্রাণের ভেতর থেকে, কবিতাকে বারবার নিজেকে শোনানোরই ব্যাকুলতায়? কেন আমাদের কবিতা-আবৃত্তি অনেক কবিরই অপছন্দ, মনের মত নয়? তবে কি আমরা বোধে এবং বুদ্ধিতে ছুঁতে পারছি না কবিতার পবিত্র শরীর? অসাবধানে এবং অবহেলায় কবিতা ভ্রষ্ট হচ্ছে আমাদের কণ্ঠে?

যে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর গান সবার কণ্ঠে কণ্ঠে ছড়িয়ে যাক জগৎ জুড়ে, সেই রবীন্দ্রনাথই, আমরা জানি, 'কয়েকজন' গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে তাঁর গান শুনে, ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বেশ। আমরা যেন ভুলে না যাই কবিতার 'পাখিছুঁচ'-এ সুতো পরাতে গেলে মনের নজর ও একাগ্রতার বড় বেশি প্রয়োজন।

নতুবা এক হাতের 'সূক্ষ্ম ছুঁচ' দু' আঙুলের টিপে ধরাই থাকবে, অন্য হাতের সুতো 'ছুঁচ'-এর এ-পাশ ও-পাশ করবে শুধু। অনুশোচনায় কখনও যেন আমাদের আবৃত্তি করতে না হয়:

কেন ছিঁড়ে গেল তার।
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে
দিয়েছিনু ঝংকার,
তাই ছিঁড়ে গেল তার। "দুরাকাঙ্খা" : 'চিত্রা'।

আবৃত্তি ও শিল্প

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আবৃত্তি শিল্প কী না, আবৃত্তিকার শিল্পী কী না, এ নিয়ে মাঝে মাঝে বিতর্ক হতে দেখি। যামিনী রায় না কী ফিলমকে শিল্প বলে মনে করতেন না (বিষ্ণু দে-র মুখে শুনেছিলাম)। কিন্তু এসব বিতর্কে না জড়িয়ে যদি কবি ও বিশিষ্ট আবৃত্তিকারদের মুখ থেকে ভালো কবিতার নিমগ্ন পাঠ শুনি, তাতে একথা উপলব্ধি করা যাবে,—এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা। নিজে মনে মনে পড়ার জন্য যে কবিতা লেখা, তার শব্দ বিন্যাসের মধ্যে যে এতো সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তা তো তখন বুঝে উঠতে পারিনি! যে যন্ত্রণাপিষ্ট-অনুভূতি-তাড়িত হয়ে কবিতাটির জন্ম তাকে অনুভব করতে পারলাম নতুন করে, একজন আবৃত্তিকারের চমৎকার নিবিষ্ট উচ্চারণের জন্যে, কবিতাটির সঙ্গে একাত্মতার জন্যে। অবশ্যই একথা জেনে রাখা ভালো, এ ধরনের অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতা সব সময়ে মেলে না। তাতেও এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করাও যায় না। একজন আবৃত্তিকার যখন একটি বহুস্তরবিন্যস্ত কবিতাকে অনুভব করে তা পৌঁছে দেন শ্রোতার কাছে, সঞ্চারিত করে দিতে চান তার উপলব্ধি, আর তা পারেনও, তখন তাকে শিল্পী হিসেবে মেনে নিতে বাধা থাকে না। যেমন পথের পাঁচালীকে সত্যজিৎ রায় নতুন করে উপলব্ধি করাতে পারেন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বা একজন দেবব্রত বিশ্বাস নতুন করে রবীন্দ্রনাথে আমাদের দীক্ষিত করেন বা সুবিনয় রায়।

আবৃত্তি একটি মন্ত্রের ধ্বনি, অনুরণন, আবহমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারে, তা একটি উৎকৃষ্ট কবিতারই হোক বা একগুচ্ছ গূহ্যাশ্রয়ী মন্ত্রকল্পর। আমরা যখন বেদ উপনিষদের সূক্ত বা গীতার শ্লোক আবৃত্তি শুনি একজন রাধামোহন-প্রতিম পাঠকের কণ্ঠ থেকে তখন তার অর্থ, ইঙ্গিত ও তাৎপর্য কতটুকুই বা ধরতে পারি? যদিও একথা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় মেলে, কোন এক যাদু যেন মুগ্ধ করে

রাখছে! শ্লোকের পর শ্লোক উচ্চারিত হচ্ছে, ঝরে পড়ছে সংগীত, চিত্রকল্প, ধ্বনি। শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই ধ্বনির সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে রাখে, অর্থ না জানলেও টান থামানো যায় না। শব্দের বিন্যাসগত কলাকৌশল ও শব্দের ধ্বনির সবটুকু সার ছেঁকে নিতে পেরেছেন বলেই কবির বা মন্ত্রদ্রষ্টার কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করে বসি, রচনার অনমনীয় বিরুদ্ধতা শান্ত পরাজয়ে গৌরব অনুভব করে।

ছেলেবেলায়, আমার বাবার গলায় উষালগ্নের চণ্ডী ও গীতা আবৃত্তি রোজই শুনতাম। বাবার এসব ছিলো কণ্ঠস্থ, আর এই সব গ্রন্থের অলৌকিক মাহাত্ম্যে তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস ধরা পড়তো সুললিত গম্ভীর উচ্চারণের সময়। আমি এখনো ত্রিশ বছর আগের বাবার গলার মন্ত্রোচ্চারণ শুনতে পাই, তা স্মৃতিতে গভীর গম্ভীর দাগ রেখে গেছে। ফলত, ছন্দের যে সীমানার পরে নীরবতা, তা অনুভব করতে পেরেছি যেমন, তেমনি শব্দসংস্থানের নৈপুণ্যে ধ্বনির তাল বা তানের সৌন্দর্য তখন থেকেই রপ্ত করে ফেলেছি। গীতা বা চণ্ডীর সেই অসম্ভব সুন্দর শ্লোকগুলির অর্থ অনেক পরে জেনেছি, কিন্তু এতকাল না জানা সত্ত্বেও, তাদের প্রতি তাদের ধ্বনিগত সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ আমার বিন্দুমাত্র কমেনি।

আমি বলতে চাইছি, সেই সময় এবং পরবর্তী দিনে অনেক অনেক শিক্ষিত মুগ্ধ মানুষের মন্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা শুনে আসছি, কিন্তু সেই ছেলেবেলার স্মৃতি এতটুকুও ম্লান করতে পারেন নি তাঁরা। বাবা আমার কানে শব্দের ধ্বনির সংগীতময়তা ও ব্যঞ্জনা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন, বা এভাবেও বলা যায়—তিনি তো জানতেন না, ভোর পাঁচটায় আপন তন্ময় উচ্চারণে যে জগতের দুয়ার তিনি খুলছেন, তা দিয়ে একটি ৭।৮ বছরের বালক প্রবেশ করছে চিরদিনের জন্য, তাকে কিছু না জানিয়েই।

যখন ছাপা পুঁথি পাওয়া যেতো না, কথকঠাকুরের মুখ থেকে শুনেই সাধারণ মানুষ মহাভারতের রামায়ণের নাটকীয় সুন্দর গল্পগুলোর রস বুঝে নিতো, আবার কবির শ্লোকবাঁধা ও তা পথের পাশে বা রাজসভায় দাঁড়িয়ে আবৃত্তি, তা শোনবার লোকের অভাব হয়নি তখন।

ভালো গলা যার আছে সে যেমন সংগীতশিল্পী হতে পারে, যদি তার থাকে অনুভব, প্যাশান ও গভীর রসবোধ। নিজে হয়তো গানটি লেখেন নি বা সুর দেননি; তেমনি, কবি না হয়েও ঐ একই গুণের অধিকারী হয়ে একজন আবৃত্তিকারও হতে পারেন আবৃত্তি-শিল্পী। একটি কবিতা একজন কবির

সৃষ্টিকালীন জন্ম-কম্পনের টেনশানে বাঁধা। তা তো একবারই হয়েছিলো, ঐ কবিতাটির জন্মের সঙ্গে তা ফুরিয়ে গেছে চিরকালের মত। কবি আবার নতুন কবিতার জন্মযন্ত্রণায় তাড়িত, ক্লিষ্ট। একজন আবৃত্তিশিল্পী ঐ কবিতার বারংবার উচ্চারণ ও ভোগের মধ্য দিয়ে পৌঁছে যেতে পারেন সেই জন্মকালীন মুহূর্তে, আর তখন তিনি কবির সঙ্গে সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদী বা একই প্রসূতি বেদনায় পাণ্ডুর ও ক্লান্ত। তিনি ঐ কবিতাটি উপভোগ, উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে পুনর্সংস্কারের চেষ্টা করে যান যদি, তা হলে শ্রোতা হিসেবে আমাদের যে অভিজ্ঞতা ঘটল তা বোঝানো কঠিন, যেমন একটি গভীর গানও আমাদের নিক্ষিপ্ত করতে পারে সেই একই তৃপ্তি ও অতৃপ্তির সীমানায়।

আমি এরকম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি, হয়তো অনেকেই হয়েছেন। শম্ভু মিত্র, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষের জীবনানন্দের কবিতা পাঠ, অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের গলায় জীবনানন্দ, কাজল চৌধুরী, পার্থ ঘোষ, মহিম ঘোষ, বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ, রজত বন্দ্যোপাধ্যায় বা গৌরী ঘোষের আবৃত্তি আমাকে ঐ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। দীপঙ্কর মজুমদার, কৃষ্ণকলি বসু, গৌতম দাসও কখনো কখনো তা করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে, এখনো ঐ দুর্লভ অভিজ্ঞতা ঘটে না, কেননা অনেক আবৃত্তিকারের ধারণা, গলা ভালো, এই যথেষ্ট। যে সব কবিতা এঁরা নির্বাচন করেন তা শিল্প হিসেবে উত্তীর্ণ নয়, এটুকু বুঝে নেবার ক্ষমতাও এঁদের অনেকের নেই। ভালো কবিতা বুঝতে পারেন না, ঝুঁকিও নিতে চান না, ফলত শ্রোতার কাছে ভীষণ বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা নিয়ে আসেন এঁরা। যেমন দেখছি রবীন্দ্রসংগীতের বেলা। গানের সময় ব্যঞ্জনা ও রস বুঝতেই পারেন না, এমন গাইয়ে নির্লজ্জের মতন গান গেয়ে যান, আর ঐ অসামান্য গানগুলোর নিবিড় আবেদনকেও ভোঁতা করে দিতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের গানের জগৎ ও ভাষার সঙ্গে একাত্ম না হয়েই পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে-ওঠা সংগীত শিক্ষালয়ে কয়েক বছর ধরে কসরৎ করে শিল্পী হয়ে যান। এদের গানের একঘেঁয়েমি নতুন শ্রোতাদের চটুল হিন্দি গানের দিকে ঠেলে দিচ্ছে দিন দিন।

আবৃত্তিকে শিল্পের স্তরে নিয়ে যেতে সুকণ্ঠের অধিকারী হলেই চলবে না। কবিতা নির্বাচন, কবিতা নিজে বুঝে নেওয়া ও তার পুনর্রচনা করার যোগ্যতা অবশ্যই আয়ত্তে থাকা চাই সংগীতের বস্তুহীন রস, ছবির নীরবতা, বস্তু ও ইঙ্গিতময়তা কবিতায়, যা উৎকৃষ্ট কবিতা, তাতে অনুস্যূত হয়ে থাকে, থাকে শব্দের নিজস্ব বহুবর্ণিল স্তরবিন্যাস। একজন কবির মতই আবৃত্তিকার তা

নিজের মধ্যে ধরে নেবেন, না হলে যে-কোনো গদ্য পাবে কবিতার মর্যাদা, উচ্চকণ্ঠে গোরগোলই আবৃত্তি বলে গ্রাহ্য হবে একদিন। যেমন এই কিছুদিন আগেও মাঠের মধ্যে ফেনা উদ্গীরণ করে 'আমি বিদ্রোহী' বলে পড়ে যেতে দেখেছি নামী আবৃত্তি শিল্পীকে। হাত পা ছুঁড়ে, গলায় বিকট আওয়াজ তুলে একশ্রেণীর আবৃত্তিকার আসর জমান, তারা ধরে নেন আবৃত্তিও নাটক। আবৃত্তি যে নীরব একক উপলব্ধির সঞ্চার, একটি কবিতার পুনর্জন্ম, তা এদের জ্ঞানগম্যিতে থাকে না। যে কোনো একটি গদ্য বিচিত্র সুরে অতিনাটকীয় ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে যান এরা। এর ফলে সাধারণ কবিতা-শ্রোতার রুচির ঘটে অবনমন। ভালো কবিতা ও তার শিল্পী এই অচল টাকাদের চাকচিক্যে সাময়িকভাবে হারিয়ে যেতে পারেন।

শিল্পিত কবিতা

অজিত বসু

যখনই বন্ধন, তখনই ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার আকৃতি। এইখানে বেদনা। ধূমায়িত বাষ্প মাটি ফাটিয়ে বের ক'রে আনে উচ্ছ্বসিত প্রবাহ—ঝর্ণা। ভেতরের আত্মার আর্তি এইভাবে ফেটে ফাটিয়ে ফুটিয়ে তুলছে বুকের পুষ্প—যেখানে শান্তি। জীবনে শান্তি নেই, বাঁধনের মধ্যে আঁটোসাঁটো যন্ত্রণা, তারই বুক চিরে দুঃখের অশ্রু বয়ে এসেছে চিরদিন। আর সেই দুঃখ থেকেই শিল্পের প্রতি অনন্ত টান মানুষকে, জীবনকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ক্ষুদ্রের সীমা থেকে দিগন্তহারা অসীমে। হারিয়ে, অনুসন্ধানে এই বিচ্ছুরিত জ্যোতি চিন্ময় হয়ে যায়, তখনই তো বিস্তারিত ভূমায় অণু রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে যায়, বিশ্বকে পায়, আর বিশ্বের অন্তর্লীন আনন্দকে। এইজন্যই শিল্প বার বার ঘরের বাইরে ডাক দিয়েছে, ঘর থেকে বাইরে, বাহির থেকে উধাও বিশ্বে—বিশ্বে, মহাকাশে, ব্রহ্মাণ্ডে। দুঃখের শীর্ণতা নয়, দুঃখের পরিণতি, রসঘন অনাবিল নির্মল জ্যোতির্ময় আনন্দলোকে।

একটা অনাবশ্যকতার আকাশ আছে—অবকাশের আকাশ—রবীন্দ্রনাথ চিনিয়েছিলেন সেই আকাশকে, সে এক অমোঘ আহ্বান—মোহাচ্ছন্ন ধ্যান—তারপর নির্মোহ অবাঙ্‌মনসোগোচর তমসাবিদারী অরুণবরণের মুখোমুখি—কিংবা চরণতলে, দুঃখের জলে। বাইরে যাবার এই ডাক আছে শিল্পে—ছোট্ট সীমায় যখন হাঁসফাঁস, তখন সৌন্দর্যের এই হাতছানি মানুষকে আত্মজিজ্ঞাসার ক্ষুরধার পথে ভাঙতে ভাঙতে নিয়ে চলে প্রশান্ত টলটল গভীরতায়।

সো অহং। হ্যাঁ, নিজের কাছেই সব, বন্ধন বদ্ধতা, মুক্তি আনন্দ। আকাশ আছে, বস্তুর বদ্ধতাও আছে। যা নেবে! এক জায়গায় বেঁচে থাকার জন্যে কাড়াকাড়ি মারামারি—অন্য জায়গায় দিওয়ানা, ফকির। দুটি শূন্য হাতে পরিপূর্ণতার অভীপ্সা। শিল্প এই হাত পূর্ণ করে দেয়—কিন্তু থামিয়ে দেয় না, নিয়ে চলে, ভাসিয়ে কাঁদিয়ে তখন

কোথা হতে যেন শুনতে পাওয়া যায় অজানিত সংকেত, পরতে পরতে পর্বে পর্বে সৌন্দর্যের ঘোমটা খোলা।

সেই সভ্যতার সূচনা থেকে এইভাবে চিত্রকলা, সংগীত, ভাস্কর্য, নাট্যকলা মানুষকে নিজের বাইরে বার করে এনে সৌন্দর্য ও দুঃখের সম্মুখীন করেছে। জীবন, এই ছোট্ট জীবন, তারই বেদনায় ভাবিত হয়ে এক শিল্পী—রসিকের চোখে জাগিয়েছে বিস্ময়, শক্তি করে তুলেছে তাকে যাবতীয় দুঃখবেদনার, এইভাবে সঞ্চারিত হয়ে অনাদি যুগ, তার সম্ভাবনা, শিল্পের স্বপ্নের গ্রাসে ধরা পড়েছে। ভুলে গেছে মানুষ তার অভাব, তার বঞ্চনা—দেখেছে, ভেবেছে, চলেছে।

তারপর আরও কতকাল গড়িয়ে গেল। নাট্যাভিনয়ের কোল ঘেঁষে গড়িয়ে এল চলচ্চিত্রশিল্প—ছবি নয়, ঘটনা, জীবন—বিন্যাসে মাধুর্যে যা শিল্পস্বীকৃতি পেল। পাশাপাশি সমান্তরালে অন্তঃশীলা ছিল আর একটি শিল্পমাধ্যম—তা হল আবৃত্তি। সেই বেদ-উপনিষদের কাল থেকে অস্ফুট বেদনা কিংবা চিৎকৃত বিলাপ বা শোকে শ্লোকের গায়ে লাগল সুর—গান হল না, গান হওয়া না হওয়ার মাঝে আর একটি শিল্পমাধ্যম—আবৃত্তি। মন্ত্র, স্তোত্র ইত্যাদি পাঠে সমর্পণের নতি বিনতির সমস্ত আবেগ ঝরে পড়ল সুর হয়ে—কিন্তু ঠিক সুর নয়, কথাকেই অনুভূতির রসে জারিত করে বার করে আনা, আনতে গিয়ে দেখা গেল আর্দ্র হয়ে গেছে, আর্দ্র আর রসান্বিত। এ যেন সম্পূর্ণ অজান্তে কী থেকে কী হয়ে গেল!

এইভাবেই সূত্রপাত। তারপর কত কবি এল—শব্দঝংকার ইত্যাদিতে বন্যা হল, তাণ্ডব হল, ধীরে ধীরে বিশেষ করে বাংলা কবিতা আবৃত্তিতে সুর ব্যাপারটা ঝরে পড়তে লাগল। সমান্তরালে হিন্দী কবিতাপাঠের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত সুর ছাড়া ভাবাই যায় না। যে কোনোরকম একটা সুর গায়ে লেগে থাকা চাই। ঐ তা নাহলে পাঠ যেন জমে না। আর এই যে সুর, তাও পাঠক তারতম্যে বদলে যাচ্ছে। ফলত একটা ঘ্যানঘেনে একঘেয়ে ভাব। আর একটা জিনিস লক্ষ করার এই যে, সুরের জন্যে হিন্দী কবিতা আবৃত্তিতে ভাবটা ঠিকমত ফুটে উঠতে পারে না, সুরই আবহাওয়া গ্রাস করে থাকে। অপরদিকে বাংলা কবিতায় কি হল? আরোহন অবরোহন—অনেকক্ষেত্রে গলা কাঁপিয়ে, ঢঙঢাঙ নাটকীয়তায় রগরগে হয়ে উঠল আবৃত্তি। গিরিশবাবুর আবৃত্তি আমি শুনিনি—ভার্স-ড্রামা আবৃত্তির কথা বলছি—দানীবাবুরও শুনিনি, কিন্তু নির্মলেন্দু লাহিড়ীর 'দেবতার গ্রাস', রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের আবৃত্তি অনেক শুনেছি। নাট্যাচার্যের আবৃত্তিতে নাটকীয়তা এবং ব্যক্তির অভিপ্রকাশ ও প্রাধান্য। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর আবৃত্তিতে ভাবাবেগের উত্তাল লাগামছাড়া ভাব—নাটকের

স্বত আরোহন অবরোহনের যথেচ্ছ অসংযত ব্যবহার—উচ্চারণেও হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর সবসময় ঠিক থাকে না। পুরনো যুগের আবৃত্তিকার হিসেবে সাহিত্যিক প্রবোধ সান্যালের কথা অনেকে বলেন—তাঁর রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তি নাকি সত্যিই মর্মস্পর্শী ছিল। আমি শুনিনি, কাজেই আমার পক্ষে কিছু না বলাই ভাল। রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে আবৃত্তির একটা বিশেষ মাধুর্য আছে। নজরুলের আবৃত্তিতে প্রাণ আছে, আছে আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর আবৃত্তি উচ্চকিত পাঠ ও আবৃত্তির মাঝামাঝি একটা ধোঁয়াশায় আটকে থাকে। 'পনেরোই অগাস্ট' বা অন্যান্য আবৃত্তিতে আবেগের থরোথরো ভাব এবং তাৎক্ষণিক আবেদন ছাড়া কিছু নেই। অবশ্য আশ্চর্য ব্যতিক্রম বেতারের 'মহিষাসুরমর্দিনী'। সেখানে সবই আছে,—সংযম, অপূর্ব সুষম বিস্তার এবং আরোহন অবরোহনের সৌন্দর্য। বাংলা আবৃত্তির ক্ষেত্রে চল্লিশ বছরের বেশি এই প্রভাতী অনুষ্ঠানের যে ঐতিহ্য, তার ছাপ অন্তত দৃষ্টান্ত হিসেবে আবৃত্তিকারদের সামনে থাকবে। অবশ্য এক্ষেত্রে সুরের ঠেস্ আবৃত্তিকে অনেকটা সহায়তা করেছে। এই সুরের ব্যাপারটা নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।

যে কথাটা ফেলে এলাম, সেটা হলো ভাব। আবৃত্তির ক্ষেত্রে আসল ব্যাপার হল এই ভাব। এটাকেই কণ্ঠ, উচ্চারণ, যতি, বিরতি, মাত্রা এবং স্বর পরম্পরার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আবৃত্তিকারকে প্রথমেই বিচার করতে হবে কবিতার মুড্। প্রয়োজনবোধে কবিতাটি লেখার পেছনে যদি কোনো পশ্চাৎপট থেকে থাকে, থাকেই, সেটা জেনে নিতে হবে। সামগ্রিকভাবে কবির জীবনদর্শন এবং বলার ভঙ্গি সম্পর্কেও একটা সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন। তারপর দেখতে হবে কণ্ঠে ভাবপ্রকাশের জন্যে কি কি কৌশল অবলম্বন করা দরকার। 'কৌশল' কথাটা একটু ব্যাপক অর্থে ধরতে হবে। ভাবকে ছাড়তে হবে অন্তঃকরণের স্বাভাবিক ধর্মে, আবার তীক্ষ্ণ নজরে রাশ টানতে হবে, এইভাবে অভ্যেস করতে করতে, পরিশীলিত হতে হতে একটা জায়গায় স্থির হয়ে আবৃত্তিকার দর্শক বা শ্রোতাকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করবে। আবৃত্তির ক্ষেত্রে সুকণ্ঠ খুবই প্রয়োজন, আবার সেই সঙ্গে কণ্ঠের বিভিন্ন খেলাও দেখাতে হবে পারঙ্গমতার সঙ্গে। কণ্ঠকে সব সময় খাদে রাখলে চলবে না, প্রয়োজনবোধে ভাঙতে হবে, প্রয়োজনবোধে পর্দা কম বেশি করতে হবে, সবটাই দরকার। ছেদ, যতি, কমা, সেমিকোলন এবং বিশেষত আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে পংক্তির প্রবহমানতার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। আবৃত্তিকারের সাংগীতিক জ্ঞান থাকলে, হারমোনিয়ামের মাধ্যমে কোন্ স্কেলে তিনি কথা বলবেন, তা সুস্পষ্টভাবে ঠিক করে নিতে সুবিধে হয়। এক্ষেত্রে

কণ্ঠের ওপর আবৃত্তিকারের একটা কন্ট্রোল থাকে। আবৃত্তিকারকে তাঁর কণ্ঠের চরিত্রস্বভাব, দক্ষতা এবং মেজাজ বুঝে কবিতা নির্বাচন করতে হবে। আর সুর—সেটা ভেতরে থাকবে—বাজবে—বাইরে অভিব্যক্তি এবং শব্দ খুঁজতে হবে—তলিয়ে যেতে হবে—কিন্তু সাবধানে, হারালেও হারালে চলবে না, তলাতে হবে, কিন্তু তলিয়ে গেলে চলবে না। ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে ডুবুরির মত ডুব দেবে—কিন্তু লক্ষ্য হবে মণিমুক্তো কুড়িয়ে আনা। সবচেয়ে বড়ো কথা, গানের মতই, যে কোনো লেখার মতই, আবৃত্তিকারকে ধরতাই থেকে দর্শক বা শ্রোতাকে পাকড়ে নিয়ে চলতে হবে—এবং ছেড়েও দিতে হবে ঠিক জায়গায়। হাততালি কুড়োনোর লোভে অনেক আবৃত্তিকারকে মঞ্চে হাত পা ছুঁড়তে দেখেছি, অনেক আবৃত্তিকারকে দেখেছি চেঁচিয়ে-মেচিয়ে অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করতে বা সেন্টিমেন্টে পিঁপড়ে লাগিয়ে দিতে। না, ওসব চাতুরি ছাড়তে হবে। শিল্প অর্থেই শিল্প—যথার্থ শিল্পের মর্যাদা পেয়েছে আবৃত্তি—সুতরাং শিল্পসৃষ্টিই আবৃত্তিকারের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শ্রোতা একদিনে তৈরি হবে না, আধুনিক কবিতার এতদিনের ইতিহাসের পরেও অনেক লোক আধুনিক কবিতার নামে নাক সিঁটকোন; তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হবে কবিতার মাধুর্য, তাঁদের তৈরি করে নিতে হবে। তৈরি হচ্ছেও। নইলে আবৃত্তির অনেক অনুষ্ঠান কীভাবে বাণিজ্যিক সাফল্য অর্জন করছে? গ্ল্যামার? না, শুধু গ্ল্যামারে কাজ হয় না। আরও কিছু চাই। এখনো পর্যন্ত গ্ল্যামার দিয়েই আসর অনেকটা মাত হচ্ছে, কিন্তু দিন আসবে—ওপর আস্তরের মেকি চাকচিক্য খসে যাবে—যাবেই—মহাকালের এই নিয়ম।

২.

মূলত আবৃত্তিকার হিসেবে কাদের পাচ্ছি—শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, সবিতাব্রত দত্ত, পরলোকগত কাজী সব্যসাচী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী ঘোষ, প্রদীপ ঘোষ, পার্থ ঘোষ, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর ঘোষ, শাঁওলি মিত্র, দিলীপ ঘোষ, নীলাদ্রিশেখর বসু, অশোক পালিত, জগন্নাথ বসু ও কাজল চৌধুরী। এঁদের পাশাপাশি পাচ্ছি মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের কিছু গ্ল্যামার। ব্যাপারটা অনেকাংশেই এঁদের আয়ত্তের বাইরে—দু একজন ব্যতিক্রম আছেন—যেমন বসন্ত চৌধুরী ও বিকাশ রায়; তাও সীমিতসংখ্যক কিছু কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে এঁদের যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'নহবৎ'-খ্যাত অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বুক ভাসিয়ে ভাবপ্রবণ কবিতা আবৃত্তি করেন।

অপেক্ষাকৃত তরুণদের মধ্যে আবৃত্তিকার হিসেবে এসেছেন বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ, মুরারি সেনগুপ্ত, অরুণাভ গঙ্গোপাধ্যায়, উৎপল কুণ্ডু, সৌমিত্র মিত্র, তুলসী রায়, প্রণতি মিত্রমুস্তাফী, অমিতাভ বাগচি, সবুজ বিশ্বাস, অরুণাংশু বিশ্বাস, কৃষ্ণকলি বসু প্রমুখ—কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী, মুরারি এবং অরুণাভ ছাড়া আর কেউই বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারেননি। আসলে বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত দিগ্বিজয়ী যে ধারা সৃষ্টি করেছিলেন শম্ভু মিত্র এবং ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীরা, পরবর্তীকালে তা ক্ষীণ হয়ে এসেছে—অনেক ক্ষীণ, অন্তত কাজী সব্যসাচীর প্রয়াণের পর।

বাংলা আবৃত্তির ক্ষেত্রে একটা সুস্পষ্ট বাঁক এসেছিল 'মধুবংশীর গলি' থেকে। শম্ভু মিত্রর কণ্ঠে এই আবৃত্তি কিংবদন্তী হয়ে আছে। তারপর শম্ভু মিত্র অনেক কবিতা আবৃত্তি করেছেন—জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথ—সব আবৃত্তিই যে ভাল লাগে তা নয়—কিন্তু আবৃত্তির প্রকরণে শ্রীমিত্র সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। সব শিক্ষা পাওয়া যায় তাঁর আবৃত্তি থেকে—গলা কীভাবে রাখতে হবে, কীভাবে খেলাতে হবে—ভাবকে কেমন করে সংযত এবং পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করতে হবে, উচ্চারণ কীভাবে নিখুঁত করা যায়—ছন্দ, যতি, মাত্রা ইত্যাদির সুষম বিন্যাস—আবৃত্তিজগতে সম্রাটের মত তিনি রয়েছেন। ভোলা যায় না বেতারে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে 'আমাকে ঘুমোতে দাও ছায়ার গভীরে'—এই অংশের আবৃত্তি। অন্তত আমি তো কখনোই ভুলতে পারব না।

গ্রামোফোন রেকর্ডে উৎপল দত্তর 'জেলখানার চিঠি' শুনে স্বাভাবিকভাবেই আবার নতুন ভাবনা পেয়ে বসে। বেশ যেন গুছিয়ে বসা গিয়েছিল, হঠাৎ অগোছালো হয়ে গেল, এমনি ভাব। দ্রুতগতি, বলিষ্ঠ দৃপ্ত কণ্ঠ, অবশ্য এ কবিতার মেজাজটাও ঐরকম, তবু যেন অন্য স্বাদ, 'প্রিয়তমা' উচ্চারণের মধ্যে ঢং বা ন্যাকামোর বালাইমাত্র নেই। চমৎকার—দৃপ্ত মহিমময় উচ্চারণ। বিন্যাসের ভঙ্গিটি যেন অন্য ঘরাণার—অন্যরকম—আলাদা। পাশ্চাত্যমত দ্রুত উচ্চারণ উৎপলবাবুর অভিনয়ে সর্বত্রই আছে—আবৃত্তির ক্ষেত্রেও তা বাদ যায়নি। অন্তত এই ধরনের আবৃত্তি একটা শিক্ষা দেয় যে, বিনিয়ে বিনিয়ে সুড়সুড়ি লাগানো নয়, সেন্টিমেন্টকে খপ্ করে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া যায় দৃপ্ততায়। সাজানো ছক নয়, ছক উল্টে দেওয়া, গোলমাল লাগিয়ে দেওয়া—কিন্তু রসনিষ্পত্তিতে কোনো অসুবিধে নেই।

ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে, আয়োজন করে রসসৃষ্টি, আর আয়োজন না করে। কোনটা ভালো? আজকের মানুষ নিশ্চয়ই বলবেন দ্বিতীয়টা। কারণ ইল্যুশন দিয়ে ধাঁধিয়ে কী লাভ, ভেঙে দুমড়ে যা আছে সত্যি সত্যি,

তাকেই স্বরূপে ফুটিয়ে তোলা। নাটকেও তাই হচ্ছে—আবৃত্তিতেই বা তা হবে না কেন?

এঁদের পরবর্তীকালে বিশেষ জায়গা করে নিলেন প্রয়াত কাজী সব্যসাচী ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিলাদের মধ্যে নিঃসংশয়ে গৌরী ঘোষ। কাজী সব্যসাচীর খোলা আওয়াজ যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন বাঁক নিতে পারে। দোলা, খেলা, সাপট্—সবই ছিল তাঁর গলায়। গতিও ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। আর কণ্ঠ? এরকম কণ্ঠসম্পদ আর এল কই? এঁরই ধারায় এলেন প্রদীপ ঘোষ, নীলাদ্রিশেখর বসু ও অরুণাভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রদীপ ঘোষ কাজী সব্যসাচীর ধারার বাহক হলেও তাঁর দ্বারা গুরুতরভাবে আক্রান্ত। কণ্ঠ ও উচ্চারণ পরিষ্কার হলেও, শ্রোতাদের জয় করলেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য খুব একটা স্পষ্ট নয়। নীলাদ্রিবাবুর মোটাদাগের দিকেই বেশি নজর, বোধ বোধগম্যতায় পৌঁছয় না। তাঁর আবৃত্তিতে বড্ড আতিশয্য, আসর মাৎ করার দিকেই দৃষ্টি। অরুণাভ তো সব্যসাচীর প্রোটোটাইপ—স্বাতন্ত্র্য অর্জনের কোনো চেষ্টাই তাঁর নেই। দেবদুলালবাবু কিন্তু চরিত্র অর্জন করতে পেরেছেন। সবাইয়ের হয়ত তাঁর আবৃত্তি পছন্দ হয় না, আবার অনেকেরই বেশ ভালো লাগে। তাঁর নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম অনেক সময়েই তাঁকে সফল করে তোলে। কণ্ঠমাধুর্য ছাড়াও বাচনভঙ্গির বিশেষ একটি স্টাইল সৃষ্টি করার জন্যে দর্শক বা শ্রোতা তাঁকে নিঃকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করেন। তাঁর আবৃত্তিতে প্রায় সব সময়ই লক্ষ করেছি একটা সুর লেগে থাকে। এদিক দিয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অতীতের ঐতিহ্যবাহী। মহিলাদের মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন গৌরী ঘোষ। সন্তোষকুমার ঘোষের ভাষায়: 'গৌরী ঘোষের কণ্ঠে গদ্য যেন গান হয়ে ওঠে।' গ্রন্থনা ও আবৃত্তিতে গৌরী দর্শক ও শ্রোতার কাছে এক বিশেষ আকর্ষণ। তাঁর স্পষ্ট নিখুঁত উচ্চারণ এবং অপূর্ব কণ্ঠ বিশেষ করে রোম্যান্টিক ও লিরিক্যাল ক্ষেত্রে অনবদ্য হয়ে ওঠে।

গীতিধর্মী কবিতায় নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছেন আরও দুজন—অমিয় চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্কর ঘোষ। অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের পরিশীলিত উচ্চারণ এবং শঙ্কর ঘোষের কণ্ঠের স্বাচ্ছন্দ্য শ্রোতাদের আবিষ্ট করে রাখে।

সব শেষে বলি, পার্থ ঘোষের কথা। খুবই জনপ্রিয় আবৃত্তিকার। কণ্ঠও আছে, যে কণ্ঠে তিনি আবৃত্তি করেন না, একটু মোটা কণ্ঠে আবৃত্তিই তাঁর পছন্দ। তাঁর আবৃত্তিতে ধৈর্য কম, নগদবিদায় হাততালির দিকেই লক্ষ। স্থায়ী শিল্প, যা ঐতিহ্য সৃষ্টি করে, তার জন্যে আরও পরিশ্রমী এবং ধৈর্যশীল

হতে হবে, সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, নইলে ঐ তালেগোলে হরিবোলা। স্টার্ট, চটকদারি ভাব, ভঙ্গিসর্বস্বতা ক্ষণিকের; একে অতিক্রম করতেই হবে, নইলে জয় কখনো সম্পূর্ণ হয় না। সাময়িক দখল হলেও হাতছাড়া হতে বেশি দেরি লাগে না। আবৃত্তির স্ফুলিংও চলছে—কিন্তু যোগ্য শিক্ষকের অভাব। সরকারী প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী দায়িত্বভার নিলে কিছু হতে পারে। নতুন কিছু আবৃত্তিকার পেতে পারি আমরা, যার দ্বারা আবৃত্তি-আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে সঠিক পথে চলতে পারে। এ কাজটি বেতার মারফতও হওয়া সম্ভব। বেতার কর্তৃপক্ষ কি একটু ভেবে দেখবেন? বেতারে নিয়মিতভাবে আবৃত্তির অনুষ্ঠান চালু হতে চলেছে, শুনতে পাচ্ছি—খুবই আশার কথা—হলে খুবই আনন্দিত হব।

এসব মিলে মোটামুটি অন্ধকার কিছুটা কাটছে। একটু যেন ফ্যাকাশে আলো দেখছি। অনেক সংশয়, ধোঁয়া ধোঁয়াশা পথ চলতে, আগুয়ান হতে, ঠিক নাচের ছন্দ ঠিক পঞ্চমে যেন বাজিয়ে তোলা যাচ্ছে না। তবে আকৃতি রয়েছে—পথে নেমে পড়া গেছে—সুতরাং ঐ পৌঁছোনোর রাস্তায়ই চলেছে। দেরি হবে—কিন্তু পর্বে পর্বে ইতিহাস ঠিকই সিঁড়ি ভেঙে চলেছে।

৩.

আবৃত্তিতে সুরের একটা ভূমিকা আছে—একটা অন্তঃপ্রবাহ—কিন্তু আবৃত্তিকারকে সচেতন থাকতে হবে, সুরটি যেন ঘ্যানঘ্যানানিতে পর্যবসিত না হয়। সুরটা ভেতরে অনুভব করতে হবে—তারপর আবেগ অনুভূতি ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে ছুঁয়ে যাওয়া চাই। শ্রোতাকে মুগ্ধ করার ব্যাপার নিশ্চয়ই থাকবে, এজন্য কণ্ঠের প্রকাশকে কখনো নিয়ন্ত্রিত, কখনো আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততায় ছেড়ে দিতে হবে। আবার কখনো শান্তভাবে মীড় মূর্ছনা এবং ছোট ছোট সূক্ষ্ম কারুকাজও করতে হবে সুযোগ এবং পরিবেশমত।

নাটকীয় কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে নাটকীয়তা কিছুটা প্রশ্রয় পেতে পারে, কিন্তু আবৃত্তিকারকে ভুললে চলবে না তিনি মূলত একটি কাব্যময়তাকে প্রকাশ করছেন। গীতিধর্মী কবিতায় আরও সংযম প্রয়োজন—কণ্ঠ সেখানে অনুসন্ধানী, খুঁজে চলেছে, চলেছে, চলেছে। ইদানীং দীর্ঘ কবিতা লেখার চল হয়েছে। না, ইদানীং কেন, দীর্ঘকবিতা তো রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ থেকে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ দশকের অনেক কবিই লিখেছেন। তবে প্রবণতাটা আবার এসেছে বলা যায়। এ কবিতাগুলি আবৃত্তির পক্ষে ভাল, কারণ

এসব কবিতায় আবৃত্তিকার নিজেকে প্রকাশ করার ব্যাপক সুযোগ পান, একজায়গায় কেস করলেও অন্য অনেক ক্ষেত্রে অনেকভাবে ফসকানো তীর পুনরায় লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে—ভুল বললাম, একটা তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও, অন্য তীর ছোঁড়ার সুযোগ আছে। কিন্তু সাধারণ ছোট কবিতাতে একেবারে মাপা ব্যাপার। যা কিছু করতে হবে ভেবে, বুঝে এবং যথাযথ, একটু ফসকালে চলবে না।

ইদানীং ওদেশে আবৃত্তিকাররা অনেকক্ষেত্রেই নেপথ্যসংগীতের সাহায্য নিচ্ছেন। অনেকের ধারণা, এতে আবৃত্তিকারের নিজস্ব ক্ষমতা কিছুটা ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু আমি নিজে আবৃত্তিভিত্তিক কয়েকটি বেতার অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতে গিয়ে দেখেছি, নেপথ্যসংগীত আবৃত্তির মেজাজকে বেশ খুলে দিতে পারে এবং তাতে আবৃত্তিতে একটা নতুন ডাইমেনসনও যুক্ত হতে পারে। অনেক ভাব, যা প্রকাশের অসম্পূর্ণতার মধ্যে ছটফট করে, তাকে মুক্তি দিতে পারে নেপথ্যসংগীত। তাছাড়া মুড্ তৈরির ক্ষেত্রেও সংগীতের এই ঠেস্ আবৃত্তিকারের প্রেরণাস্বরূপ হতে পারে। পশ্চিম বাংলায় অবশ্য আবৃত্তিকাররা খুব একটা সংগীতের সাহায্য নেন না (গ্রামোফোন রেকর্ডের কিছু আবৃত্তির কথা বাদ দিলে), নিলে কেমন হয় পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। গ্রামোফোন রেকর্ডে নেপথ্যসংগীতসহযোগে যে সব আবৃত্তি রয়েছে, তা কি খারাপ লেগেছে?—বোধহয় না। তাছাড়া আরও একটা কথা, সুরের ঠেস্ আবৃত্তিকারকে তাঁর কণ্ঠের স্কেল ঠিক রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করে—যার ফলে হারানো রাস্তায় চলে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে এবং আবৃত্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

সমবেত আবৃত্তির ক্ষেত্রে কণ্ঠ-বৈচিত্র্য আবৃত্তির সৌকর্য বাড়ায়। এক্ষেত্রে অনেক সুযোগ রয়েছে। একই কবিতা, একটি কণ্ঠে যত সুন্দর শোনায়, এমন অনেক কবিতা আছে, যা এইভাবে চার-পাঁচটি কণ্ঠে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে উপস্থিত করলে শ্রোতা নতুন মুড এবং কোণ পেতে পারেন। পেতে পারেন না, পেয়ে থাকেন—খুবই সম্ভব সেটা। আবার ধরুন কাব্যনাট্য—সেক্ষেত্রে যতোই নাটক করা হোক না কেন, কাব্যগুণটিকে অভিনয়ে ধরে রাখতেই হবে। অন্যথা দাপাদাপি চলবে না।

মঞ্চে এবং নাটকে তৃপ্তি মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি অনেক শুনেছি। শ্রীমতী মিত্রর 'ঝুলন' কবিতা আবৃত্তির মধ্যে যতটা না কাব্য তার চেয়ে নাট্যগুণই বেশি। অবশ্য কবিতাটির মধ্যেও সেরকম ব্যাপার

আছে। তবে আরোপিত নাট্যগুণ দিয়ে জয় করার প্রয়াসও লক্ষ করা যায়। সবিতাব্রত দত্তর ক্ষেত্রেও এই একই কথা। কিন্তু নিজে কবি বলেই হোক, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আবৃত্তির বিশুদ্ধতাটি বেশ বজায় রাখতে পারেন। এজন্যই মনে হয়, আবৃত্তিকারদের বোধহয় একটু আলাদাজাতের হতে হয়। এই স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যমটি বুঝে তাঁরাই একমাত্র সুষম শিল্পসম্মত ব্যাপার ঘটাতে পারেন। এখানে প্রশ্ন আসে, তাহলে কবি নিজেই একমাত্র ভাল আবৃত্তিকার হতে পারেন কি না? না, তা পারেন না। অনেক ঘাটতি থাকে, তাছাড়া অধিকাংশ কবিরই সেরকম কণ্ঠসম্পদ নেই, সেজন্যে ব্যাপারটা পাঠপর্যায়ের মধ্যেই আটকে থাকে। অবশ্য এই পাঠ ব্যাপারটারও একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কবিকে বোঝার পক্ষে আবৃত্তিকারদের সামনে তা একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ। সেটাও কম মূল্যবান নয়। প্রসঙ্গক্রমে বলছি, উল্লেখযোগ্য সমস্ত কবির কণ্ঠ অবিলম্বে রেকর্ডে ধরে রাখা উচিত। যেমন কবির স্বাক্ষর, হাতের লেখা, বাসস্থান এবং জীবনচর্যা দলিলের মত ধরে রাখা হয়, তেমনি এটাও করা হলে সেই ব্যক্তিত্বকে অনেকটা বুঝে নেওয়া আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হবে। কবিদের মধ্যে স্বরচিত কবিতা ভাল আবৃত্তি করতে পারেন বা পারতেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে প্রয়াত মনীশ ঘটক, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সলিল চৌধুরী, শঙ্খ ঘোষ এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

সলিল চৌধুরীকে আমরা কি হিসেবে জানি? বিশিষ্ট সুরকার হিসেবে তো? কিন্তু স্বরচিত কবিতার আবৃত্তিকার হিসেবেও তাঁকে দেখা গেল কলকাতা দূরদর্শনের একটি অনুষ্ঠানে। সেদিন সুরকারকে দেখলাম অন্য এক রূপে—দূরে ফেলে আসা কবিতার ভুলে যাওয়া অক্ষরকে পুনরায় নিবিড় একাত্মতায় অনুভব করতে লাগলেন কবি—মুখে সলজ্জ কুণ্ঠা—চোখে দীপ্তি—কণ্ঠে ঋজু দৃপ্ত ভঙ্গি—কখনো বা গাঢ় তন্ময় প্রণয়মুহূর্ত—কখনো মুখোমুখি প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়ানো। এই সব কবিতা কিছু কিছু অন্য আবৃত্তিকারদের মুখেও শুনতে পাওয়া যায়—কিন্তু সলিলবাবুর মত যথাযথ বিন্যাস, আবেগ-সঞ্চার এবং মেজাজটি ঠিক ঠিক বোধহয় কেউই তুলে ধরতে পারবেন না। এ অনুষ্ঠান সত্যিই এক অভিজ্ঞতা!

আর একজন ছিলেন অকালে চ'লে গেলেন,—তুষার রায়। তাঁর 'ব্যাণ্ডমাস্টার' কবিতার আবৃত্তি রীতিমত এক অনুষ্ঠান। কণ্ঠের সঙ্গে ইনি অঙ্গও ব্যবহার করতেন। চাপল্য ছিল, কিন্তু ঝাঁঝও ছিল, শ্রোতা বেশ উপভোগ করতো। আসলে জীবন নিয়ে খেলা, ভাঙনের নেশা ছিল তাঁর, মৃত্যু নিয়ে ছেলেমানুষের মত সে ভেথ, ভেথ, খেলতে পারত। এ খেলা ঐ আবৃত্তিতে ফুটন্ত, তাই কোথায় যেন আপাত

হাসির আড়ালে চিকচিক করত একবিন্দু জল। শ্রোতা উপেক্ষা করতে পারত না।

কবিদের মধ্যে শ্রোতাকে চমকে দেওয়ার আবৃত্তি করেন অমিতাভ দাশগুপ্ত। চমকের সঙ্গে ম্যানারিজমও এসে যায়। এ প্রসঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'অবনী বাড়ি আছো' কবিতাটির আবৃত্তির কথা স্মরণ করছি। তিনি আগাগোড়া কবিতাটির মুড্ ফুটিয়ে তোলার দিকেই ব্যস্ত থাকেন এবং ফুটিয়ে তুলতে পারেন। 'দেয়ালে দেয়াল কার্নিসে কার্নিস'—হাঁ, আবৃত্তিকারের সঙ্গে একাত্ম হওয়া ছাড়া নান্য পন্থাঃ! জয় সেখানেই।

শ্রদ্ধেয় বিষ্ণু দে এবং বুদ্ধদেব বসুর আবৃত্তিতে আর্টিকুলেশন এবং ম্যানারিজম—অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আশ্চর্য ব্যতিক্রম—তাঁর কঠিন কবিতাগুলি তিনি সযত্নেই আবৃত্তি করেছেন এবং সেক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি খুব একটা চোখে পড়ে না।

পুরনো যুগের কবিদের মধ্যে আবৃত্তিতে রীতিমত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এবং কিছুটা প্রেমেন্দ্র মিত্র।

ইদানীং সত্তরের কবিরা বেশ একটা নিজস্ব পদ্ধতিতে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। সকলেরই প্রয়োজনীয় কণ্ঠ বা মাধুর্য নেই, কিন্তু মুডটি ফুটিয়ে তোলার নিজস্ব ভঙ্গি আছে। ভাবের আতিশয্য একেবারে নেই, বক্তব্যের ধাক্কা, ঐতিহ্য ভেঙে গুঁড়ো করে উল্টো উজানে চলা। স্বাদে ভঙ্গিতে স্বতন্ত্র। অনেক ত্রুটি, অনেক খামতি, প্রকরণগত অনেক ভুল সত্ত্বেও কিন্তু এরা নিজস্ব জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে স্বাধীন পতাকা হাতে নিয়ে। আসলে কবিতার কর্ম যেমন, তেমনি বক্তব্য, তেমনিই আঙ্গিকও যথেষ্ট বদলে যাচ্ছে। সত্তরের কবিদের জেহাদ এই বিধ্বংসী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাঁদের অনেকের আশ্রয় যৌনতায়। যেমন ছিল 'কল্লোলে'। তেমনই, কিন্তু ঠিক তেমন নয়। মোদ্দা একটা জিনিস লক্ষ করা যাচ্ছে, আবেগের শিহরণের জন্যে গলাকাঁপানো সুরেলা ঘ্যানঘ্যানানি মোটেই নেই। দর্শক বা শ্রোতাকে একটা শিল্পের সামনে যথাযথ স্থির দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে শাসনের ভঙ্গিতে। ভাসিয়ে দেওয়া নয়, যত সময়ই লাগুক, এই চঞ্চল কবির দল তাদের ভাবাবেই—তারপর ভালোমন্দ। সে অনেক ভেবে বুঝে তারপর।

অডিও ব্যাপারটার সঙ্গে যদি ভিস্যুয়াল ইমেজ যুক্ত হয়, তাহলে বোধহয় আবৃত্তি আরও সুন্দর রূপ নিতে পারে। বাংলাদেশের দূরদর্শনে এরকম কিছু কিছু পরীক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখা যাচ্ছে। সেখানে আবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আনুষঙ্গিক বাস্তব ছবি—কখনো জেলখানা, কখনো বা শহীদ-স্তম্ভ, কখনো বা সোনালী ধানের

ঢেউ, কখনো নির্জন ঘাটে বাঁধা নৌকো, কখনো দেখছি অনেক দূরে চলে যাচ্ছে জাহাজ, দূর থেকে ভেসে আসছে তার ভোঁ, কখনো এই পথের মধ্যে বেদনার্ত হয়ে যাচ্ছে প্রণয়ীযুগলের বিদায়মুহূর্ত; আবার কবিতা যেখানে বিমূর্ত, ব্যক্তিগত চেতনায় ভরপুর, সেখানে বিমূর্ত পেন্টিংস ব্যবহার করা হচ্ছে কবিতাকে নতুন ডাইমেনসন দেবার জন্যে। এর সঙ্গে আছে নেপথ্যসংগীত। কবিতাকে এইভাবে সংগীত, শব্দপ্রক্ষেপণ এবং চিত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা যাচ্ছে অনেক রহস্য, দুর্বোধ্যতা কেটে গিয়ে কাব্যের জগতে সকলকেই টেনে আনা যাচ্ছে। দুর্বোধ্যতার বেড়াজাল থেকে পাঠক এবং দর্শককে উদ্ধার করে আনবার জন্যে এধরণের নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। অনেকে অবশ্য একে বাহুল্য মনে করতে পারেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের রুচিবোধ তৈরি করার জন্যে এবং কাব্যমন গড়ে তোলার জন্যে এরকম বাহুল্যেরও বোধহয় প্রয়োজন আছে।

গদ্যপাঠও কি আবৃত্তির পর্যায়ে পড়ে? আমার তো মনে হয়, নিশ্চয়ই। কেননা, সেখানেও প্রবহমানতা, যতি, ছন্দ, মাত্রা, ভাবের ক্রমপরিণতি—সবই রয়েছে। দেবদুলালবাবুকে নজরুলের 'ক্ষুদিরামের মা' এবং শম্ভু মিত্রকে সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'অশ্বমেধের ঘোড়া' পড়তে দেখেছি। দুটিতেই ভিন্ন ধরনের আবৃত্তির মেজাজ পেয়েছি। এত কথার পরেও থেমে দাঁড়িয়ে ভাবতে গেলে দেখি, যুদ্ধ এখনো চলছে। জয় সম্পূর্ণ হয়নি, অধিকার—সেও কিছুটা। অনেকটাই দখলের বাইরে। চেষ্টা চলছে—অধিকার বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হচ্ছে। চলুক। এগিয়ে চলুক। তারপর কোনো একদিন দেখব, উৎসব। সানাই বাজছে—আর উড়ছে বিজয় বৈজয়ন্তী! সেই দিনের দিকে তাকিয়ে আছি।

শিল্পে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও আবৃত্তি

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যেক মানুষের আবৃত্তি সম্পর্কে একটা ধ্যানধারণা আছে। আমি ছবি আঁকি, আবৃত্তিই করি। আবৃত্তি সম্পর্কে আমার ধ্যান-ধারণার কথা বলি।

কোন শিশুর জন্মমাত্র উদ্গত শব্দ—আবৃত্তি। আর এই আবৃত্তি সে করে চলেছে সারাজীবন ধরে, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। আমরা যে সর্বদাই একটা আবৃত্তির বাতাবরণের মধ্যে আছি, এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পারলে আবৃত্তির তাৎপর্য অনেক সোজা হয়ে যায়। আবৃত্তি হচ্ছে অন্তরের অনুভূত জ্ঞান, উপলব্ধি—আবেগ প্রকাশ। আমি কোন বাদানুবাদের ভিতর না গিয়ে একটি কথাই বলতে পারি, আবৃত্তি আজকে যে অর্থে সাধারণ মানুষের মনে আর হৃদয়ে গাঁথা হয়ে আছে, আবৃত্তি আসলে তা নয়। আবৃত্তি পুনরুচ্চারণ নয়, আবৃত্তি হচ্ছে উচ্চারিত ধ্যানধারণা আর ভাবনার সঙ্গে নিজেকে হারিয়ে ফেলা। 'মা' একটি এমন আবৃত্তি, যে আবৃত্তিতে উভয়েই জগজ্জননীর অনুভূতিতে পূর্ণ হলেন, কিন্তু উচ্চারিত ধ্বনি বা আবেগের অনুকরণ ছিল না, শ্রীরামকৃষ্ণ বা রামপ্রসাদে। আমি মনে করি আবৃত্তি হচ্ছে অন্তরে বিশেষ ভাব-ভাবনার জন্ম। আর সেই ধ্বনিকে অবলম্বন করে রূপ পায় ছবিতে, গানে, নাচে, লেখায় আরও অন্যান্য শিল্পরসে। আমরা সত্যিই যদি একটু ভেবে দেখি, তাহ'লে কি দেখবো? আবৃত্তি হচ্ছে মনের প্রথম প্রকাশের একমাত্র শুদ্ধ স্ফুটন, এবং তা আবহমান কালের। বাল্মীকির হৃদয়ে যে জ্ঞানের উদ্ভাসিত আলোর উন্মেষ তা কিন্তু আবৃত্তির ভিতর দিয়েই অনুভূত হয়েছিল, অবচেতন মনের এই বার্তা শুনে কবি চমকে উঠেছিলেন। 'হত্যা'—একটি বাহ্যদৃশ্যের পটভূমিতে অন্তরের অনন্ত ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটেছিল। আমরা অনেকেই খুবই সহজে বলে থাকি 'অমুক কবির কবিতা আবৃত্তি কর তো।' খুবই যথাযথ। কিন্তু যথার্থ আবৃত্তির পরিণামে এবং পরিবেশে পুনঃপ্রচারের কোন অবকাশ

নেই। যে অনুভূতিরসে আপ্লুত হয়ে আত্মমগ্ন ও রসস্থ কবি তাঁর কাব্য রচনা করলেন, সেই সৃষ্টির অনুরণনে অভিষিক্ত হয়ে যে কোন শিল্পী সেই বিশেষ আবৃত্তিতে লীন হতে পারেন। সেখানে তিনি কার কবিতা পাঠ করলেন, এর কোন স্থান নেই, কথা শুনে বেয়াড়া বোধ হলেও এটাই আবৃত্তির সৎ এবং সত্য নির্ধারণ। থাক সে কথা। আবৃত্তি আর কিছু নয়, আমি মনে করি, অন্তরের গভীরতম অনুভূতির ছন্দসংগীত। এ সংগীত ছন্দের দোলায় চলে, এই ছন্দই পরে এসে ছবি হয়, কবি তখন চিত্রকর। একইভাবে তিনি হচ্ছেন সংগীতপ্রবর, তিনিই নর্তক। মূল উৎস কিন্তু ঐ এক—আবৃত্তি। আবৃত্তির ছন্দ, ঝোঁক এসে পড়ল পটে, রঙে, রসে মনের খবর সবার জন্যে প্রসারিত হয়ে ধরা দিল। যাঁর হৃদয়ে প্রসারিত ভাললাগার ছোপ পড়ল, তিনিও ওই পটের ছবির একজন হলেন। তখন চিত্রকর স্রষ্টা হিসেবে প্রথম হলেও একান্ত ভোগসত্ব তাঁর আর রইল না, আসলে যথার্থ আবৃত্তি হচ্ছে সবার এবং সেইটেই সত্য। কাব্য-আবৃত্তিতে শব্দের অন্বয়ী একটা আবেগ আছে, মাধুর্য আছে, গতি আছে, সমাধান আছে, একটা গন্তব্যের নির্দেশ আছে, আর বুকে আছে অনেক আন্তর-অনুভূতির সূক্ষ্ম কারুকাজ। তেমনি আছে চিত্রে! আমায় আপনারা একটা বিশেষ বাঁধনে বেঁধে দিয়ে সীমায়িত করতে নিশ্চয়ই চাননি, কিন্তু 'আবৃত্তি' শব্দটি এতই স্বতোৎসারিত যে এ সম্বন্ধে নিয়ম থাকা বড়ই কঠিন। যদিও আমার যা কাজ তাতে শব্দগত আবৃত্তির স্থান নেই, কিন্তু শব্দ আর বর্ণময় চিত্রশব্দের মূল একই, কাজেই আমরা উভয়ে একই রসগ্রহণে একে অপরের সঙ্গে অঙ্গীভূত। আমার বৃত্তি বিষয় বাঁধনে সাহায্য করেছে। আমার ক্ষেত্রে বৃত্তি আর প্রবৃত্তি একই মোহানায় মিলিত হয়েছে, কোথাও দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। কিন্তু বৃত্তিটা এমন একটা জায়গায় যে প্রবৃত্তির সঙ্গে মিল খায় না। অফিসের টেবিলে বসে কবিতা এক লাইন লিখে দু-লাইন অঙ্কের হিসেব করতে হল, একটা সংগ্রাম চলে। মোটামুটি আমরা বঙ্গসন্তানরা, একটু আলস্যপ্রিয়তায় ভুগি। সম্পূর্ণ কবিতার জন্য যদি জীবনটা দিই, তা হলে, কতটা কবিতা লিখতে পারতাম সন্দেহ আছে, তবু জীবনে সংগ্রাম আছে বলে, একটা ভালো লাগাকে টেনে ধরে থাকি যে, আমাকে কবিতা লিখতে হবে, গান গাইতে হবে, ছবি আঁকতে হবে। অবশ্য আমার কোন দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই, কখনও মানিয়ে নিয়ে ত্যাগ ও গ্রহণের ব্যবধানে চলতে হয়নি এ পর্যন্ত। আপনারা আমার কাছে চেয়েছেন, আবৃত্তি ও চিত্রশিক্ষা বিষয়ে কিছু বেশি সময় দিই। বিষয় বড় কঠিন আর এ এমন শিক্ষা যে প্রতিজনে তফাৎ ঘটে। তাই এ বিষয়ে পরিষ্কার করে ভাল লাগিয়ে বলা দূর অস্ত্। ছবির একটা

দিক্, তা হল ভাল লাগল কী লাগল না। তবু ছবি যখন আবৃত্তি হয়, তখন বোধ্যতার একটা সহজ পরিমণ্ডলের পরিবেশ রচনা করে। আবৃত্তির আর এক নাম শক্তি, কী সে শক্তি? এক জায়গায় 'আবৃত্তি' হয়েছে নাদব্রহ্ম। এ ধর্মকথা নয়, 'নাদ' অর্থাৎ উদগত শব্দ এখানে সত্যের সত্তা। অহেতুক বিস্তারিত করে সময় নেব না। আমার ভাবনাগুলো আপনাদের কাছে নানা চিন্তা-চর্চায় পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহ্য-অগ্রাহ্যের সীমানায় এসে দাঁড়াতে পারে, তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু একটা সত্য আমাদের স্বীকার করতেই হবে, আবৃত্তি কেবল নিজে একটা বিশেষ শিল্পই নয়, সব শিল্পের উৎস। আবৃত্তি হল ঘনিষ্ঠ ভাবনা। সৃষ্টির জগতে আমরা চিত্রকরেরা ভাস্করেরা কি করি, ভাবটাকে নিজে আবৃত্তি করে তবে তাকে পটে স্থাপনা করে ভিন্নজনের দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলি। এর এই চিন্তা-ভাবনায় চিত্রটি প্রত্যক্ষ আবৃত্তিতে জন্ম নেয় পটে। মোটামুটি আমাদের এবং সাধারণ মানুষের ধারণা, যথাযথকে উপস্থাপন করাটাই হল শিল্প। তাই নয়, চাক্ষুষ দেখার সঙ্গে অ-দেখাকে অনুভব করার অনুভূতিটাই আবৃত্তির প্রথম পাওয়া। কবিকৃতিকে যেমন দেখছি তাই নয়, বাহ্যদৃষ্টি দিয়ে—অন্তর্দৃষ্টির ভিতর দিয়ে আর একটি দৃষ্টিজীবনে উন্মোচনই হল শিল্প—আবৃত্তি। অবশ্য এই অন্তর উন্মোচনের পিছনে ভালবাসা, মমতা আর অভ্যাসের একটা অসাধারণ অধ্যায় আছে, শিক্ষা যার সঙ্গে যুক্ত। যা দেখছি তাকেই নিছক বলাটা হবে পুনরাবৃত্তি। আবৃত্তিকার হবেন রসিক, রসস্থ, প্রেমিক। তাঁর থাকবে ত্যাগীর একটি উন্মনা মন, আর যা দেখছি তাকেই নিছক বলাটাকে পুনরাবৃত্তি বলে। তাতে হৃদয় কাজ করে না, মন আচ্ছন্ন হয় না, আর তাই তা সবসময় আবৃত্তির মূল শর্তে অনুত্তীর্ণ। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের একটি সহজ সরল কথনের উল্লেখ করলে নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমরা Drawing নিয়ে এত কথা বলি, অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, যা দেখছি কেবলি সেই বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধরাটা হল Medical Drawing, আর শিল্পী যা দেখে, নিজের ভাবনা ভালবাসার ভেতর দিয়ে আঁকে, সেটি হল Artistic Drawing। সহজ সমাধান। আসলে, আবৃত্তি হচ্ছে একটা সত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রকাশ, যা অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভাবতে চাই না। প্রতিদিনের আলোর মধ্যে যে তারারা বর্তমান একথা আমরা কতটুকু মনে রাখি? রাত্রির গভীরে গাঢ় নীলের আঁচলে সারা আকাশ জুড়ে পেতে দিলেই তাদের স্পন্দন লক্ষ ও অনুভব করা যায়। আবৃত্তি কারও সঙ্গী নয় বরং বিপরীত। আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গী হয়েই ছবি, মূর্তি, গান, নাচ, সাহিত্য সব পুষ্ট হয়ে আছে। আমি আবৃত্তির ব্যাকরণগত বা তত্ত্বগত মিল বা অমিলের তর্কে যেতে চাই না।

কেননা, যাতে আমার অধিকার নেই, তা থেকে আমি বিরত থাকছি। আমি মূলত শিল্পশিক্ষার্থী, ছবি আঁকি। রোজ দেখি। রোজ দেখার চেষ্টা করি—প্রতি দিনের প্রতিটি বস্তুকে তার স্বমহিমায়, স্ব-বিচিত্রতায় এবং তার স্ব-মর্যাদায়। আর তাকে আবৃত্তি করি নিজের অন্তরে, যাতে সে আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রতিষ্ঠা পায় পটে। সব সময় জিং হয় না, চালাকি আর অহমিকার জন্য হার মানি। যাকে যেভাবে দেখতে চাই, সেভাবে ধরা দেয় না। আর তাই আবৃত্তি আবেগ-সঞ্চারী হয় না, মনে গিয়ে বাসা বাঁধে না। আমরা শব্দ নিয়ে 'আবৃত্তি' রচনা করি না, আমরা চোখ নিয়ে অনুভবে 'আবৃত্তি' করি তাতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণকে প্রতিষ্ঠা করি না, অবশ্য যে বর্ণ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করি পটে সেই বর্ণ চিত্রকরের মনের বর্ণ।

আবৃত্তির সঙ্গে আর একটি বিশেষ গুণ জড়িয়ে আছে, তা হলো আবেগ। আবেগের কম বেশিতে একটি ধারণা, একটি সম্পূর্ণ চিন্তার উপস্থাপনার বেঁচে থাকা কিংবা মৃত্যু।

এ পর্যন্ত একজন শিল্প-শিক্ষার্থী হিসাবে 'আবৃত্তি'কে আমি যে ভাবে ভাবি তাই বলে চলেছি। কিন্তু আলোচনার বিষয়ে আমার শিরোনাম "শিল্পে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং আবৃত্তি।" আমি এ বিষয়ে আলাদা করে কিছু বলব না। আমাকে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে সেই সব প্রশ্নের উত্তরেই প্রাসঙ্গিক বিষয় আপনা থেকে তার জায়গা করে নেবে। শিল্প আর শিক্ষার্থী এমন এক সেতুবন্ধ যার মূলে রয়েছেন শিক্ষক। শিক্ষকের জীবনপাঠের উপর নির্ভর করছে এই সেতুর ভিত ও স্থায়িত্ব। আসলে আমার মনে হয় শিল্পশিক্ষার সবচেয়ে বড় দিক প্রত্যেকের জন্যই তার আলাদা আলাদা করে আসন তৈরি করে দেওয়া। এই হচ্ছে সৃজনশীল শিল্পীর শিক্ষার অন্যতম আদর্শ (আমার মনে হয়)। শিশুর মুখে আমরা যেমন এমন কিছু তুলে দিই না যাতে তার শরীর খারাপ হতে পারে, শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রেও এটি একটি সঞ্জীবনী চিন্তা। আমার ধারণা সব শিক্ষার মূল এই সত্যে রয়েছে। শিল্পশিক্ষার মূল শর্ত হল, শিক্ষার্থীকে চোখ খুলিয়ে চিনিয়ে দেওয়া—কে, কেমন, কী আর কোথায়। শিল্পের সঙ্গে আবৃত্তির সম্পর্ক—এসব কয়েকটি শব্দ সমন্বয় আমার কাছে খুব ভাল মনে হয়। শিল্প ও আবৃত্তি একই সত্যের সহজ উচ্চারণ। আপনাদের কাছে সময় পেলে, আবার কটা প্রশ্নের উত্তর দেবো, চোখ তুলে। আমি সবচেয়ে মূল্যবান যে শর্ত মানি না, অথচ যা একান্তভাবে মানা উচিত, আবৃত্তির সেই শর্ত হচ্ছে দেখে পাঠ না করা। ভরসা, চিত্র-আবৃত্তিকার হিসেবে মোটামুটি শিল্পের এই কঠিন সত্যটি

নিষ্ঠার সঙ্গে রোজ পালন করার চেষ্টা করে থাকি। আমি বিশ্বাস করি, এই নিষ্ঠাই আমাকে আরও কোন সত্যের সন্ধান দেবে। আমার চিন্তার কয়েকটি দিক মেলে ধরলুম। আপনাদের ভিন্ন ভিন্ন পথের দিক দেখার আগ্রহে, শোনার আগ্রহে অপেক্ষা করবো। কিন্তু একথা আমরা সবাই মানবো যে সেই এক ধ্রুব পথ বেয়ে আমরা সবাই চলেছি সেখানে আবৃত্তি-যজ্ঞের এক মধুর অনাহত অনুরণন চলেছেই আর সেই যজ্ঞের নিমন্ত্রণ আমরা সবাই পেয়েছি।

আবৃত্তির আর এক নাম 'ধ্যান'। নির্জনে অনুধ্যানের মধ্যে দিয়েই আবৃত্তির পূর্ণতার পথ তৈরি করতে হবে। আসল কথা, তর্ক নয়, বাদানুবাদ নয়, যাকে পেতে হবে তার জন্য ব্রত নিতে হবে, তবেই সে ধরা দেবে। সবশেষে বলি, আবৃত্তি শখ নয়, শৌখিনতার নিবিড় হালকা আচরণে তার জন্ম নয়। এ হচ্ছে সত্যের কঠিন সাধনা। তার প্রতিষ্ঠা সত্যে। এখানে সত্যকে অনুভব করার মন্ত্রগুলি সে শিখিয়ে দিচ্ছে।

আবৃত্তি সম্পর্কে আমার যা ধারণা হয়তো আরও অনেক লেখা যেত, যাই হোক আমি একে সাধনা মনে করি। আমি মনে করি এ জীবন থেকে আর একটা জীবনে উত্তরণের এটা একটা পরিবাহী পথ। শিল্পটা কতটা সভা-সমিতিতে প্রশংসিত হচ্ছে বা হচ্ছে না যেমন একটা দিক্‌, আমি কতটা পরিবাহিত হলাম এক সত্যের দিকে, সেটাও একটা মস্তবড় দিক্‌। যেটার জন্য চাই হৃদয়। আমাকে এক উত্তরণে পৌছতে হবে, আমার সঙ্গে যারা রইলেন তাঁরাও সেই উত্তরণে গিয়ে হাজির হলেন। চৈতন্য ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন, অদ্বৈতকে আমরা ভুলে যাই নি। সে রকম যে কোন হৃদয়ের সঙ্গে আর একটি হৃদয় একীভূত হলে সে এক সত্যের অনুভব করতে পারবে।

আবৃত্তি মানে কেবলি কবিতা, এটা আমি মানিনা। একটা গাছ, সেটাও একটা আবৃত্তি। সমগ্র জগৎ জুড়ে আবৃত্তি, প্রত্যেকটা বিষয়ে যুক্ত আছে, আমাকে কে কীভাবে ধাক্কা দিচ্ছে সেটা বড় কথা। কী ভাল লাগছে সেটা বড় কথা, সেই ভালো লাগার ওপর আমি কি অনুভব করছি, কি বলছি, সেইটাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে সৃষ্টি এবং 'আবৃত্তি' আমরা যেটা বলি, (এটা নিশ্চয়ই আলোচনা করলে বোঝা যাবে···) পুনরাবৃত্তি নয়, একজন কবির (রবীন্দ্রনাথের) কবিতা বললাম বলে সেখানে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে থাকলেন তা নয়।

নন্দবাবু একটা কথা বলতেন, 'বনে যাওয়া' (নিজের হয়ে যাওয়া)। যখন নজরুলের কোন কবিতা বলেন তখন কি নজরুলকে মনে থাকে? থাকে না। কলম দিয়ে যখন কিছু লিখি তখন কি কলম হাতে থাকার বোধ থাকে? না,

কলম হাতে—এই বোধটা থাকলেই লেখা আড়ষ্ট হয়। কবিতা কার? এই বোধটা থাকলে আমি তাতে আত্মস্থ হতে পারি না—(এটা 'আমি' মনে করি)। প্রকৃতই যখন 'আমার' করে নিতে পারি তখনই সেটা সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। যাই হোক, প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া যাক।

প্রথম প্রশ্ন : একজন প্রাপ্তমনস্ক মানুষ, যিনি নিজে কিছু আঁকতে পারেন, শিল্পশিক্ষা করতে এলে তাঁকে কোন্‌খান থেকে শুরু করতে হয়? কি কি ধাপে এগোতে হয়? রঙ-রেখা ব্যবহারের সরলতম থেকে জটিলতর প্রক্রিয়া কি তাঁকে ক্রমশ শিখে নিতে হয়? না কি বিষয়ের গুরুত্বই ক্রমপর্যায়ের লক্ষ্য? একটি শিশুর শিল্পশিক্ষা পদ্ধতি নিশ্চয়ই পূর্ণবয়স্কের তুলনায় ভিন্ন কিছু। কি তারতম্য?

শেষ দিয়েই শুরু করি। একটি শিশুর সঙ্গে বয়স্কের শিক্ষার তারতম্য হবেই। আমরা অনেক সময়ই বাচ্চাদের গান, বাচ্চাদের ছবি আঁকার খুব প্রশংসা করি, 'অসাধারণ এঁকেছে',—তার সারল্য দেখে। আমরা কিন্তু অপর পারে দাঁড়িয়ে ভুলে যাই, শিশু কিন্তু তার পরিপূর্ণ ক্ষমতা দিয়েই একটি ছবি এঁকেছে। সে যথাযথ গাছই করতে চেয়েছে, যথাযথ নদীই করতে চেয়েছে, যথাযথ মানুষই করতে চেয়েছে। তাকে যদি সরলীকরণ করতে চাই, সরলীকরণের দেখাটা হচ্ছে আমার। এটা হচ্ছে প্রথমত এক প্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তকে দেখার যে তফাৎ সেটাই বললাম। দ্বিতীয়ত, শিশু শিক্ষার্থী এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীর দুটি দিক আছে—এক ধরনের শিক্ষার্থী আছেন, যাঁরা কিছু কিছু শিখে এলেন, আরো কিছু শিক্ষার জন্যে। আর একদল শিক্ষার্থী আছেন, কিছু না শিখে শিখবার বাসনায় উপস্থিত হ'ন। যাঁরা কিছু না শিখে আসে তাঁদের শেখানো অনেক সহজ। যাঁরা কিছু শিখে আসে, সেই শেখাকে ভুলিয়ে দিয়ে নতুন করে শেখানো বড় কঠিন। যেমন, যে বাজাতে জানে না, যন্ত্রটি হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, যে একটু বাঁধতে জানে, যন্ত্রটি ভাঙার সম্ভাবনা। এটা হচ্ছে বড়দের সঙ্গে ছোটদের তফাৎ। তবে (এই বক্তব্যগুলো কিন্তু একান্তই আমার) শিল্পজগতের শিক্ষার ভিত্‌ হচ্ছে (আমি আশা করি, গানের জন্যও তাই। আর অন্য কোন শিল্পের ব্যাপার জানি না) প্রত্যেকটা হৃদয়ের জন্য প্রত্যেকটি মন্ত্র আলাদা। যে মানুষ আঁকতে পারে, নক্সা জানেনা, তাঁকে মানুষ আঁকিয়ে নক্সার ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হবে, যে নক্সা আঁকতে পারে তাকে নক্সার ভিতর দিয়ে মানুষে পৌঁছে দিতে হবে। আসলে শিক্ষকের এটা বোঝা দরকার যে মালভূমি থেকে হিমালয়ের মাথায় চড়া যায়। মাথায় চড়ে মালভূমির লোককে বলা উচিত হয় না যে ডানদিক বাঁদিক করে পথ দিয়ে এসো। আরো সোজা করে বলি। একটি শিশু খাতা, পেন্সিল, রং নিয়ে

আমার কাছে এসে হাজির হয়েছে, আমি চারতলার দাঁড়িয়ে 'ডানদিকে যাও; আচ্ছা বাঁ দিকে ঘোরো'—না! আমাকে নেমে আসতে হবে, সে পৌঁছনোর আগেই আস্তে আস্তে হাতটা ধরে টেনে নিয়ে যেতে হবে। এটা আমার কর্তব্য। শিক্ষা ব্যবসা নয়। অর্থের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। শিক্ষার্থী খুশী হয় দিয়ে। আমাদের দেশে একটা রীতির প্রচলন আছেই যে, কিছু না দিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়না, এটা অন্ধ সংস্কার। কিন্তু শিক্ষা কখনোই নির্ভর করেনা, আমি কি পাচ্ছি তার ওপর। শিক্ষকের কর্তব্য কি? আমাকে ছাত্রকে দেখতে হবে, ছাত্র আমাকে দেখলো কিনা সেটা তার কর্তব্য। আমার পাশ দিয়ে চলে গেল (ছেলেবেলায় ছাত্র ছিল) আমার সঙ্গে কথা বলল কি বলল না সে-টা তার কর্তব্য। আমি তার সঙ্গে সে দ্বন্দ্বে যুক্ত হব না। আমি সর্বদাই জিজ্ঞেস করবো 'কেমন আছো'? আমি মনে করি এটা শিক্ষকের কাজ। শ্রদ্ধাটা পেতে জানতে হয়। আমি শিক্ষকতা করি, আমি মনে করি পিতা-মাতাকে সন্তানের কাছে যে সংযম দেখাতে হয়, শিক্ষকের ছাত্রের প্রতি তার চেয়ে বেশি বা কম সংযম দেখাতে নেই। আমার কোন অশ্লীল বই পড়তে ইচ্ছে হতে পারে, অশ্লীল সিনেমা দেখতে ইচ্ছে হতে পারে, চক্‌রাবক্‌রা পোষাক পরতে ইচ্ছে হ'তে পারে, কিন্তু যেহেতু আমি শিক্ষক, আমি পারি না। আমার শিক্ষক জীবনের শুরুতেই এসব পরিত্যাগ করেছি। আমার ছাত্র আমায় দেখে ভাবতে পারে, 'আচ্ছা! রামানন্দ দা—এই সিনেমায় চলে এলেন!' আমাকে মনে রাখতে হয়, চলা বলা সবকিছু অন্য একজনের চোখ দিয়ে দেখা হচ্ছে, আমার চরিত্র দিয়ে আমার ছেলেরা তৈরি হবে তো!

আর একটা দিক হচ্ছে ছবির সঙ্গে সঙ্গে কবিতা, গান, সাহিত্য এই দিকটা তাকে ধরিয়ে দিতে হবে! শুধু প্যাস্টেল নিয়ে করছি তা নয়। এই ছবি দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে দু লাইন লেখো তো! এ-ও কবিতা। সেই ছেলেই যখন অক্ষর লিখছে তখন আর একটা ধারণা হচ্ছে। একই হৃদয় থেকে দুটি জিনিস বেরোচ্ছে। যখন রঙে বেরোচ্ছে এক জিনিস, যখন শব্দের অনুরণনে বেরোচ্ছে আর এক জিনিস।

ছেলেদের শিক্ষার ভেতর অনেকের ধারণা আছে, কিছু বলার দরকার নেই যা ইচ্ছে তাই করুক। আমি বলি, না। শিক্ষার পদ্ধতিটা পাল্টাতে বলি। একটি ছেলে আমার ক্লাসে আকাশ কালো এঁকেছে। আমি তাকে বলব না আকাশ কেন কালো এঁকেছ? আমি তাকে রাত্রির অন্ধকারে আকাশটি কালো দেখিয়ে, সকালে সূর্যের আলোয় আকাশ লাল দেখাবো, দুপুরে দেখাবো আকাশ উজ্জ্বল

নীল। এই দেখিয়ে দেওয়া—এটাই শিক্ষকের কাজ। শিক্ষকের কাজ হল ছাত্রকে নাড়িয়ে দেওয়া—এই ক্ষমতা আছে তোমার ভেতর। শিক্ষকের সংযম হল, নিজে আরোপিত না হওয়া ছাত্রের উপর। আমি প্রভাবিত করতে চাই না তাকে। আমার ছাত্র যদি আমারই copy হয়ে ওঠে আমার দুঃখ পাওয়া উচিত। আমার শিক্ষায় অগভীরতা আছে, মনে করা উচিত। এর জলন্ত প্রমাণ হচ্ছেন নন্দলাল বসু। একই হাতে রামকিংকর, বিনোদবিহারী, কৃপাল সিং—প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আসন। অবনীন্দ্রনাথকে দেখুন—নন্দলাল, অসিত হালদার, সুরেন ঠাকুর প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আসন। এই হচ্ছে গুরু। আমরা গুরু হতে পারছি না। আমরা চাই আমার মতন লোক্। শিক্ষা নিয়ে আজকে আন্দোলন হচ্ছে। কেন হচ্ছে? আমরা আলো দিতে চাই না বলে। আলো দিতে চাইলে তো আলো অন্য জিনিস—আলো তো অন্ধকার দেখে ঢোকে না। উৎসারিত হ'তে থাকে। শিক্ষকতার এটা একটা প্রধান গুণ হওয়া উচিত—যেন আমি না হয়ে ওঠে। প্রত্যেকের চেহারা যেন আলাদা হয়। অবশ্য প্রথম প্রথম যেহেতু আমাদের এসব কাজ সৃষ্টিমূলক, ভীষণ প্রভাব পড়ে। আসলে নির্ভর করছে (আমি জানি না আমি আপনাদের বিষয়ে কথা বলছি) স্বর দেখে কবিতা বেছে দেওয়া, এ কবিতা এর জন্যে। পাথর দেখে ভাস্কর্য সৃষ্টি হওয়া। একটা বস্তু দেখে কি করব মনে হওয়া। আমি বলছি বিষয় নির্বাচনের কথা। সেই জন্যেই আবৃত্তিটা। যখনই একজন আর একজনের প্রতি আরোপিত হয়ে পড়ে, গলার স্বর বা প্রক্ষেপণের যদি চরিত্র বিচার করা যায় তখন চিহ্নিত করা যাবে এটা এর জন্যে এটা ওর জন্যে ইত্যাদি।

সব কবিতা সব ছেলের জন্যে নয়। সব স্বর সব কবিতার জন্যে নয়। সব আবেগও নয় সবার। তা হলে বৈষ্ণব, তন্ত্র এসব বিভাগ হতো না। প্রত্যেকে একই লক্ষ্যে পৌঁছবে কিন্তু প্রত্যেকের অধিকারভেদে বিষয় বা পথ দিয়ে দেওয়া—এইটা হচ্ছে শিক্ষকের কাজ।

এরপর হচ্ছে বড়দের ছবি আঁকা শেখানো। বড়দের প্রথম কথা হচ্ছে, একটু বুদ্ধিমান। একটু বড় হয়ে গেলেই তার বিশ্বাসটা চলে যায় তো। বিশ্বাসটা আনাতে হয়। তারা শিক্ষককে একটু হয়তো নেড়েচেড়ে দেখে। স্যার, 'শ' হবে না 'স' হবে—এই রকম একটা ব্যাপার আর কি! যেটা হয়তো আমার ভিতরেও ছিল। সেইটা পার হয়ে বিশ্বাস জাগানো। এই প্রথম কাজটা কঠিন কাজ। দ্বিতীয়ত আমাদের এই অসুবিধাটা হয় যে ছবির ড্রইং যদি একবার হাতে ধরে যায় কোন বয়স্ক শিক্ষার্থীর, তাকে ভোলানো খুব শক্ত, আবার

শিক্ষার্থী খুব বদি পিপাসু না হয় তাহলেও মুস্কিল। ধরুন ভ্যান গঘ বা গঁগ্যা প্রচুর বয়সে ছবি আঁকা শিখেছেন। পিপাসু ছিলেন, আর শিক্ষার সঙ্গে সাধনা তো থাকতেই হবে। যেমন আবৃত্তির আর একটা দিক হল অভ্যাস, হয়তো বলবেন 'এইতো আপনি বললেন, আবৃত্তি সৃষ্টিমূলক কাজ, আবার বলছেন অভ্যাস?' অভ্যাসের আবৃত্তি করতে করতেই সত্য আবৃত্তিতে পৌছনো যাবে। কেন অভ্যাস করতে বলি? মন যখন এসে হাজির হবে হাত তখন তৈরি থাকবে না। অসম্ভব কষ্ট হয় তখন। আপনি যদি স্বরক্ষেপণ তৈরি না রাখেন, রোজ যদি না করেন, যেদিন ভাবটা এসে উদয় হবে, তখন হয়তো গলা দিয়ে ঠিক স্বর বেরোবে না, তার থেকে কষ্ট আর নেই।

প্রশ্ন ওঠে যে আবৃত্তি খুব একটা পপুলার হচ্ছে না কেন? বললাম, ঠিক কথা, তোমাদের দিক থেকে। কিন্তু আবৃত্তি কারো অপেক্ষা রাখে না। রামায়ণ মহাভারত আবৃত্তি করলে এখনো হাজার হাজার লোক শোনে। আর একটা কথা তো সত্যি, এটা তো মানতে হবে যে, সভা-সমিতিতে কিছু কিছু আবৃত্তির অনুষ্ঠান আজকাল দেখা যাচ্ছে, সেটা ছিল না। এটা তো এগিয়ে যাওয়া। একেবারে যদি হুই চই করে হয় তাহলে পড়ে যাবে। এতে পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। ঠাট্টা করে বলা যায়, সরকার এমন একটা ব্যবস্থা করুন, আবৃত্তির জন্য তিন নম্বর থাকবে! সব স্কুলেই আবৃত্তির টিচার দরকার হবে। বাড়িতে বাড়িতে ছাত্র ভরে যাবে। এটা আর কিছু নয় আমাদের সমাজ ব্যবস্থার দোষ। আমাদের ছবি আঁকার স্কুলে যে এত ভিড় কারণটা কি? আমার ছেলে আঁকায় বড় কম নম্বর পাচ্ছে, এই দু নম্বর বেশি পেলে ফার্স্ট হতে পারে মাস্টার মশায়!'

শিল্পশিক্ষায় রঙের কথা বলা আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে রং বলা পছন্দ করি না। তোমার হৃদয়ে একটা লোক লাল রঙে ধরা দিতে পারে, আমার হৃদয়ে হলুদ রঙে। তুমি আমার রঙটা নিতে পারলে না বলে তোমার ছবি ঠিক নয়, এটা বলি না। এতো অঙ্ক নয় যে ৩+২=৫ না লিখে ৪ লিখলে তুমি শূন্য পাবে। তোমার যেদিন মনে হবে যে লালটা একটু বেশি হয়েছে কমাতে হবে, সেদিন তোমার চোখই চিনে নেবে মানুষটার ঠিক রং কোন্‌টি। আমি যখন নন্দলাল বসুর কাছে যেতাম উনি আমায় বলেছিলেন, "তুমি বড্ড লাইন দাও, একটু লাইন কমাও।" আমি কমাই নি। আমি চেয়েছিলুম আমার চোখ যেদিন বলবে লাইনটা বেশি হচ্ছে, সেদিন কমাব। আজ বুঝতে পারি, মাস্টারমশাই লাইন কমাতে বলেছিলেন, তাঁর বলার শর্তটা কি ছিল! কিন্তু আমি যদি তৎক্ষণাৎ

জেনে নিতাম, জানতে পারতাম না বেশি লাইন দেওয়ার ক্ষতিটা কি। আমার মনে হয় শিল্পে শিক্ষাটা কখনো আরোপিত হওয়া উচিত নয়। অনেক সময় শিল্প শিক্ষার্থী এসে জিজ্ঞাসা করে, 'আমার কিরকম ইচ্ছে হচ্ছে বলুন না!' এই হাওড়া থেকে দুই ছাত্র এসেছিল, বললে, 'আমার খুব রঙ দিয়ে কাজ করতে ইচ্ছে হয়।' বললাম, 'তা ইচ্ছে হয় করো।' 'না, কিরকম হবে?'

'সে তুমিই বলে দেবে কি রকম হবে।'

ছেলেবেলায় হাতের লেখা দেখলে এখন তোমার হাসি পায়। ছেলেবেলার আঁকা দেখে পরে তুমিই বুঝবে হচ্ছে কি হচ্ছে না। তোমার জুতো ঠিক হচ্ছে কি না তোমাকেই বলতে হবে। তোমার ছবি আঁকা হচ্ছে কিনা তোমাকেই বুঝতে হবে। আমি বড়ো জোর বলতে পারি, 'তোমার জুতোর শুকতালাটা ছিঁড়ে গেছে।' তুমি দেখলে যে না ঠিক আছে। তবে ঠিকই আছে। তুমি যদি মনে কর, 'রামানন্দদা বলছেন, সত্যিই, ছিঁড়ে গেছে।' ব্যাস্, তা হলে আমার সঙ্গে মিলে গেল। শুকতালাটা সেঁটে নাও। এই হচ্ছে শিক্ষা। এই আমার মত। এর পরে এই ভাবে আরো চর্চা চলতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শিল্পী যত প্রতিভাবানই হোন্, নিয়মিত অনুশীলন বা কাজ করার অভ্যাস তার শিল্পে বাড়তি কিছু যোগ করে কি?

করে। আমি নিজের কথা বলে ফেলছি বলে কিছু মনে করবেন না। আমি রোজ সকালে উঠে একটা করে কাজ করি। একটা খাতা আছে আমার। আমার সাধনা আমার ছবি। আপনাদের যদি জীবনে 'আবৃত্তি'ই সব কিছু হয়, সকালে উঠে আবৃত্তি করবেন। সেইটেই সব। যিনি মালী তিনি ফুল তুলে পূজারীর হাতে দিলেই তাঁর ঠাকুরকে দেওয়া হয়ে গেল। কিন্তু কোন পোকা যদি ভাগ্যবান হ'ন, সেই ফুলের সঙ্গে দেবতার মাথায় গিয়ে চড়েন। কোন পাথর যদি ভাগ্যবান হ'ন, পাথরে দেবত্ব আসে। একটা চাঙর থেকে শিল্পী সৃষ্টি করলেন দেবতা, তিনি পূজো পেলেন। আমাদের রোজ পূজো করতে হবে। রোজ আবৃত্তি করতে হবে। কার আবৃত্তি করছি, কার কবিতা—এটা আমার কাছে বড় কথা নয়। আমি একটা অনুভূতিকে বার বার বলছি।

আর একটা কথা। এঁরা বলেছিলেন, 'শিল্পে শিক্ষার প্রয়োজন আছে কী?' আছে। আবৃত্তি করতেও শিক্ষা প্রয়োজন আছে বৈকি। সাধু হতে হলে বারো বছর ব্রহ্মচারী থাকতে হয়। চণ্ডীপাঠ করতে গেলে শুদ্ধাচারী হতে হয়। আর আবৃত্তি করতে গেলে শিক্ষা লাগবে না? শিল্পের বেলায় শিক্ষা লাগবে না? আপনা থেকেই হবে? আপনা থেকে নিয়ে আসে, মাজতে হয় ঘসতে হয়, আরো

স্বন্দর হয় সে। এতো অস্বীকার করা যাবে না। আর আমি যদি সত্যি তাকে সত্যে পৌছে দিতে চাই, তাকে তৈরি করতে হবে। আবৃত্তি যে পথ দিয়ে আসবে, ছবি যে পথ দিয়ে আসবে, সে পথ যদি পরিষ্কার করে না দিই, তবে তো সে হোঁচট খাবে। তবে আর পূর্ণতা হল না। আমার বিশ্বাস, এই লেখক, গায়ক বা সৃষ্টিধর্মী যে কোন কাজের লোকেরা রোজ 'আবৃত্তি' করেন। আমি আবৃত্তিই বলছি, আমি ছবি বলছি না, গান বলছি না। আবৃত্তি মানে ধ্যান, একটা বিষয়কে ধ্যান করা, সকালবেলা উঠে আমি গাছের একটা ছবি আঁকছি, মানে কি? আমি গাছকে আবৃত্তি করছি। যিনি গাছের সম্বন্ধে একটা কবিতা পাঠ করছেন, তিনিও আবৃত্তিই করছেন গাছকে।

প্রশ্ন: বিষয়ের যথার্থ প্রতিভানই কি শিল্প প্রকাশ ক্ষমতার পক্ষে যথেষ্ট? না কি অনুশীলিত প্রয়োগদক্ষতা ছাড়া যথার্থ প্রকাশ সম্ভব নয়?

অনুশীলিত প্রয়োগ দরকার। না-হলে যথাযথ অনুভূতিতে পৌছনো যাবে না। চর্চার ভেতর দিয়ে একটা জায়গায় পৌছনো যায়। আমি যেমন বলি, তীক্ষ্ণরেখা, সাপের মত একটা দাগ। একটা থালায় ক্যাঁচ করে শব্দ হচ্ছে, সারা শরীরটা শিউরে উঠছে, কেন? রোজ চর্চা না করলে তীক্ষ্ণতা আসতে পারে না। কিছুতেই পারে না। মনের বলিষ্ঠতা যদি হাত দিয়ে কী কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ করতে হয়, প্রতিদিনের চর্চা দরকার। মনে হয় না কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবেন।

কোনো কবিতাই মৃত নয়। সুনীল একদিন পুরুলিয়ায় একটা কবি সম্মেলনে বললেন (নীরেনবাবু-টাবু সবাই ছিলেন) কেন আজকালের ছেলেরা বর্তমান কবিদের লেখা পড়ছে না, জানছে না? সুনীল বলেছিলেন, "ছেলেদের পড়ার বইগুলো মৃত কবিদের কবিতা দিয়ে ঠাসা।" সুনীল যখন ফিরে এলেন, আমি বললাম, একটু শুধু আপনি শুধরে দিন, 'মৃত কবিদের জ্যান্ত কবিতা দিয়ে ঠাসা।' এই কথাটা ছেলেদের কাছে অমন করে বলতে নেই। কবিতা যা সত্য, চিরকালই সে জীবিত। অজন্তা আজও জীবিত। তাই বলে অজন্তায় ফিরে যেতে হবে তা বলছি না। একটা জীবিত বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি ফেরাচ্ছি। যা জীবিত মানুষকে আনন্দ দেয়, তাই জীবিত।

কে কোনটা গ্রহণ করতে পারছে বা পারছে না সেই দিকে তাকিয়ে আমার রুচি যেন নিম্নগামী না হয়। আস্তে আস্তে একটা জিনিসকে তুলে ধরতে হবে। সময় লাগবে। 'কষ্ট হয়, ঠিক সফলতা না এলে।

কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর:

প্রশ্ন : Art এবং Industry দুটি শব্দই শিল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আবৃত্তি কি Art না Industry ?

উত্তর : যারা Artটাকে Industry করছে তারা তো এই দলে নয়। Industry is Industry. Art কোনদিন Industry হতে পারে না। Industrialist-রা কায়দা করে Art-এর সঙ্গে ওটাকে জুড়েছে। আমরা যারা শুদ্ধতার সঙ্গে শিল্পের চর্চা করছি তার সঙ্গে ওর কোনো ব্যাপার নেই।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। ওঁর "কলকাতার যীশু" কবিতাটা Calcutta Corporation ব্যবহার করেছে দেখে, লিখেছিলাম যে আপনার মাথায় কি করে এটা এল যে কবিতাটা ওদের বিজ্ঞাপনে দেওয়া যায়। কবিতা পড়ে যে অনুভব হয়েছিল বিজ্ঞাপন দেখে সে অনুভবের সঙ্গে কিছুতেই তো একে মেলানো যাচ্ছে না। এই হচ্ছে, Industry ব্যবহার করলো কবিতাটা। কবিতাটা শুদ্ধ। আবৃত্তিও শুদ্ধ। আমাকে আবৃত্তি একটা জায়গায় পৌছে দেবে। এটা ধর্মকথা নয় কিন্তু, আমি বলি, আমি আমার শিল্পী বন্ধুদের বলি, আমরা কি সেই ছবি আঁকতে পারছি, যেমন, একটা মানুষের হৃদয় দুঃখ পেলে বা আনন্দ হলে নদীর কাছে গিয়ে বসে, গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় তেমন করে সে আমার ছবির কাছে যাবে।

প্রশ্ন : বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কিছু ব্যক্তি নির্দিষ্ট পাঠক্রম বা ধারণায় শিক্ষিত হয়ে শিল্পী হন। বিভিন্ন শিল্পে এই দুইপ্রকার শিল্পীরই স্বীকৃতি আছে। আবৃত্তি শিল্পের ক্ষেত্রেও এই সমন্বয় বোধহয় সম্ভব। এ সম্পর্কে আপনার কি মত ?

উত্তর : শিক্ষিত হয়ে আবৃত্তি করা আর অশিক্ষিত হয়ে আবৃত্তি করা, আমি 'অশিক্ষিত' কথাটা ঠিক ব্যবহার করতে চাইছি না। আমি বলি যে শিখেছে তাকে আর একটু জানিয়ে দেওয়া, চোখ খুলিয়ে দেওয়া। যে জানল না, যে করছে না, অশিক্ষিত নয়। আমার কথাই বলছি, আমি ৩০ বছর ছবি আঁকছি। আমার মাস্টারমশায় বলেছিলেন আমায় যে, ম্যূরাল করতে হলে ম্যাসেনাইট বোর্ডে জল দিয়ে এবং বালি দিয়ে ঘসতে হয়। আমি ১৫ বছর পরে দেখলাম যে এটা ভুল। এতে সময় যায়, বোর্ডটা নষ্ট হয়ে যায়। এমারেল্ড দিয়ে ঘসলে সেই একই জিনিস আসে। এই হচ্ছে এগিয়ে দেওয়া। নিজের চেষ্টায় যে শেখবার চেষ্টা করেছে, তাকে একটু আমার জানা বিষয়টা ধরিয়ে দেওয়া। কতকগুলো সিঁড়ি ধাপে ধাপে ওঠা। শিক্ষিত অশিক্ষিতের কোনো প্রশ্ন নেই।

তবে একটা জিনিস অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত হয়, ঠিক পথটা যদি বলে দেওয়া যায় তবে তাকে ঘুরতে হয় না। দ্রুত সত্যে পৌঁছতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তো M. A পাশ করেন নি, তবে কি শিক্ষা আটকে ছিল তাঁর? একটা পথে কেউ যাবে, তো তাকে জানিয়ে দেওয়া এ পথে যাবে একটা গর্ত আছে, লাফিয়ে যেও ভাই। এইটুকু তো শিক্ষা।

শিল্পের ক্ষেত্রে কম জানা বেশি জানার কোনো আলাদা গুরুত্ব নেই। সে বিচারের দায়ও নয় আমাদের। আমাকে অনেকে বলেন, আপনি Academy-তে Exhibition করেন, এখানে বোঝার লোক বড় কম আসে, বিড়লাতে বোদ্ধা লোকেরা আসেন। আমি বলি, আমাকে তো কোনো অধিকার দেন নি ভগবান, বোঝার বা না-বোঝার লোক বেছে বেছে Exhibition করতে। আমার ভালো লাগা আমি টাঙিয়ে দিলুম, যার হৃদয়ে গ্রহণ করার সে করবে। একটা লোক যদি নাটক দেখতে এসে আমার ছবি দেখে একটু আটকে যায়, সেটাই আমার পাওয়া, আমাদের দায়িত্বই হলো যাঁরা ভালোবাসেন না, তাঁদের ভালোবাসিয়ে দেওয়া।

আমাদের কাজ হ'ল তৈরি করে দেওয়া, ধরিয়ে দেওয়া। কাছে টেনে নেওয়া। কেউ হয়তো বোঝে না, না বুঝে চলে যায়। সততার মূল্য দেয় না। এসব গ্রহণ করে নিয়েই তো কাজ।

প্রশ্ন: আমরা ওঁর কাছ থেকে একটা নতুন জিনিস শিখলাম। বিশেষ এবং নির্বিশেষ বলে যে কথাগুলি আছে, উনি আবৃত্তির একটা নির্বিশেষ সংজ্ঞা দিলেন। এটা আমাদের ধারণায় ছিল না, আমরা এই ব্যাপারে লাভবান হ'লাম। এ বিষয়ে আর একটা প্রশ্ন আছে, সব শিল্পেরই Form এবং Content আছে। চিত্রশিল্পে ও আবৃত্তি শিল্পে এগুলি কি কি? এবং কোথায় এদের সাযুজ্য বা পার্থক্য?

উত্তর: Form এবং Content—কোনো শিল্পে এ দুটোরই কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যে Content-কে যে যেরকম Form-এ ধরে। আমি নির্বিশেষ অর্থে আবৃত্তির কথা বলেছি। আর একটা দিক হল। ধরুন, একটা সূর্যোদয় দেখে আবৃত্তিকার সেই অনুভবটাকে শব্দে স্বরে, আবেগে প্রকাশ করলেন। আমি ছবিতে 'লাল' লাগালুম। আহা কী লাল! আপনিও বললেন, খুব সুন্দর লাল। এইখানে তফাৎ, এইখানেই মিল। Form বলতে রঙের বর্ণ, শব্দের বর্ণ। Content একই হতে বাধ্য। সূর্যোদয়ের Content তো আলাদা হবে না।

প্রশ্ন : আবৃত্তিকার কবিতার চিত্রকল্প তুলে ধরেন। কণ্ঠের সাহায্যে কবিতার অর্থকে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেন। ঠিক একইভাবে একটি কবিতার চিত্ররূপ কি চিত্রকরের তুলির আঁচড়ে শ্রোতার কাছে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে সাহায্য করে না?

উত্তর : এটা পুনঃপ্রচার। একে Illustration বলা চলে। কোনো কবিতা আমাকে আঁকতে দিলে আমি সরাসরি করব না। সেই কবিতা আমার হৃদয়ে যে অনুভূতির অনুরণন তোলে সেইটাকে পটে তুলে ধরবো। কারণ প্রত্যেক মাধ্যমের নিজস্ব ভাষা আছে। কবিতায় যদি থাকে "দূরে গাছ, নদী চলে, ভালে সূর্য……"। তবে ঐ সবটা মিলিয়ে যে অনুভব সেটাই ছবিতে থাকবে, হুবহু নয়। আমার বক্তব্যটা বললাম, যে কোনো চর্চার মূল কথাই হ'ল, যেটা করতে চাইছি তার সমগ্র অনুভূতিটা আমার মধ্যে এনে আমার মাধ্যমে নিজের করে প্রকাশ করা, তাতে আমিও থাকছি, তিনিও থাকছেন। আমি তিনি হয়ে যেতে পারি না। এই হচ্ছে চিত্রচর্চা আর Illustration-এর তফাৎ।

প্রশ্ন : কোনো কবিতা আবৃত্তি করার সময়ে যদি সেই কবিতার চিত্ররূপ দিয়ে মঞ্চ সাজানো যায় তবে সেই পরিবেশ কি কবিতার ভাব বিষয়ে শ্রোতা বা দর্শককে আগ্রহী করে তুলবে না?

উত্তর : কোনোটাই দেখবে না। ছবি দেখলে কবিতা শুনবে না, কবিতা শুনলে ছবি দেখবে না। এই ধারণা ঠিক নয়। ছবি দেখে দেখে বুঝতে হবে, কবিতা শুনে শুনে বুঝতে হবে। কোন সৃষ্টিমূলক কবিতা ছবি দিয়ে দিয়ে দেখালে মূল রসটা বিঘ্নিত হয়। যেমন হয় বই দেখে কবিতা পড়লে, কিছুতেই শ্রোতার সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায় না। মতের পার্থক্য থাকতে পারে। আমি মনে করি, একটা সৃষ্টিকে স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করাই শ্রেয়। অনেক Exhibition-এ বাজনা বাজে। কেন? আমার এতে খুব আপত্তি আছে। এতে বাজনাটাকে অপমান করা হয়। বাজনা কি এক্ষেত্রে সৃষ্টিমূলক ছবিতে কিছু add করে?

প্রশ্ন : একজন মঞ্চস্থাপত্যকার যেভাবে একটা নাটককে সাহায্য করেন, সেইভাবে আবৃত্তিকারকে চিত্রকর কোনো সাহায্য করতে পারেন কি না? নাটকের ক্ষেত্রে তো দর্শক মঞ্চস্থাপত্যকে আলাদা করে দেখেন না, সেটা নাট্যপ্রয়োজনারই অঙ্গ, সেইভাবে।

উত্তর : সহায়তা করার কথা আলাদা। সেক্ষেত্রেও, পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলে ধরা তো হয় না। সমগ্র নাটকের অনুভূতি থেকে কেউ সেই স্থাপত্যটা সাজান।

আবৃত্তি যখন শুনি তখন তো আমরা আগ্রহ হয়ে পড়ি তখন দৃশ্যটা কতটা কাজ করে? আবৃত্তি তো আসলে চোখ বন্ধ করে শোনার জিনিস। সেদিক থেকে দেখলে আবৃত্তি আরো অনেক বড় ব্যাপার, গভীর ব্যাপার।

তাছাড়া সত্যিকার শিল্পী যারা তাঁদের একসঙ্গে দুটো সৃষ্টির সংস্পর্শে এলে ক্ষুণ্ণ হয়, এটা 'আমার' মনে হয়।

আবৃত্তি—প্রয়োগ : প্রথম ধাপ

উৎপল কুণ্ডু

আবৃত্তি প্রয়োগ শিল্প। আবৃত্তি সম্বন্ধে এই বিশ্লেষণটা খুব চালু আছে। যদিও আবৃত্তি সত্যি কোন শিল্পমাধ্যম কিনা এ বিষয়ে এখনো অনেকের সন্দেহ আছে, তবু আবৃত্তি বিষয়ে কিছু বলতে গেলে এই বিশ্লেষণকে বিশ্লেষণ করাই ভালো। প্রয়োগ শিল্পে প্রয়োগের কিছু উপাদান বা মাধ্যম থাকে। যেমন, কবিতা সৃষ্টি করাকে যখন প্রয়োগশিল্প বলা হয়, তার উপাদান হল শব্দ। এই শব্দ সাজিয়েই কবি তাঁর যা কিছু কারুকার্য—ভাব, ছন্দ, ভাষা, চিত্রকল্প সৃষ্টি করেন। আবৃত্তিকারের কাছে সেই উপাদানটি কি ?

কণ্ঠস্বর। এই স্বরের সূক্ষ্ম প্রক্ষেপণ তারতম্যে বা বৈচিত্র্যে যে ধ্বনিমণ্ডল গড়ে ওঠে—তাই থেকে কখনো তৈরি হয় চিত্র, কখনো ছন্দোসংগীত, কখনো উন্মাদনা বা নানা ধরনের অনুভূতি। কাজেই সঠিক শব্দটি খুঁজে না পেলে যেমন কবির তৃপ্তি হয় না, তেমনি সঠিক স্বরটি (গ্রাম, স্থান, প্রখর, মেজাজ, ভঙ্গি সব মিলিয়ে) প্রক্ষেপণ না করতে পারলে সৎ আবৃত্তিকার তৃপ্তি পান না।

আবৃত্তি করার জন্য প্রথমেই জানা দরকার সেই স্বরটাকে, যেটা দিয়ে শিল্পটা—এই ধ্বনিরূপটা সৃষ্টি করা হবে।

সাধারণত, প্রক্ষেপণ স্থান অনুযায়ী আমাদের স্বরকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় :

১। অ্যাবডোমেন বা নাভি থেকে বলা

২। লিপটাং বা মুখগহ্বর থেকে বলা

৩। হুইসপারিং বা ফিস্ ফিস্ করে বলা

৪। ন্যাজাল বা নাকের সংস্পর্শে প্রক্ষেপণ

৫। হেড রেজিস্টার বা মস্তিষ্ক ছুঁয়ে, নাক, মুখ, জিভ দিয়ে প্রক্ষেপণ

যখন আমরা গম্ভীর হয়ে কথা বলি বা গভীর স্বরে কোন কথা বলতে চাই কিংবা দীর্ঘশ্বাস ফেলার সঙ্গে কোন কথা ভেতরে থেকে উচ্চারণ

করি তখন সরাসরি নাভি থেকে স্বরক্ষেপণ হয়। এইভাবে স্বরটিকে চিনে নেওয়া গেল। আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তা বলার সময় আমরা মুখগহ্বর বা কণ্ঠজাত স্বরই প্রক্ষেপণ করি। অন্যের কাছ থেকে গোপন রাখার জন্য বা আবেগে গলা বুজে এলে যেভাবে স্বর প্রক্ষেপণ করা হয়, যাতে volume প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, সেইটা হল ফিস্‌ফিস্ করে বলা। দূরের কাউকে ডাকার সময় আমরা একটু নাক-ঘেঁষা স্বর প্রক্ষেপণ করে থাকি, আবদার বোঝাতেও এরকম স্বর প্রযুক্ত হয়। যন্ত্রণা বা আর্তি বোঝাতে বা অসহ্য ক্রোধ বোঝাতে যে ধরনের স্বর প্রয়োগ করা হয় তা যেন আমাদের নাক, মুখ সব স্থান দিয়েই বেরোতে থাকে, কিন্তু মস্তিষ্কের সঙ্গে তার একটা সরাসরি সংযোগ থাকে। এই রকম মস্তিষ্ক ছুঁয়ে নাক, মুখ জিভ দিয়ে স্বরপ্রক্ষেপণকে বলে হেড রেজিস্টার। "রাজা অয়দিপাউস" নাটকে রাজার এরকম স্বরপ্রক্ষেপণ অনেক শোনা যায়। এইভাবে বিজ্ঞান প্রদর্শিত পাঁচটি প্রক্ষেপণ স্থান জেনে নেওয়া গেল। কার্যক্ষেত্রে, এই সব স্থানের মাঝামাঝি অংশ দিয়েও স্বর প্রক্ষেপণ করা হয়। এইভাবে সব কটা স্থান দিয়ে প্রক্ষেপণ অভ্যাস করলে প্রয়োজন মত কাজে লাগানো যায়।

এই স্বরগুলিকে এবার অন্যদিক থেকে দেখা যাক। সুরসপ্তক বা স্বরসপ্তক বলে গানে যে কথা চালু আছে এবং তার বিভিন্ন পর্দা এবং Octave, যেমন, শুদ্ধ, কড়ি ও কোমল বা উদারা, মুদারা, তারা—এই সব পদ্ধতি যে শুধু গানে প্রযোজ্য তাই নয়, আমাদের গলা বা স্বরযন্ত্র দিয়ে যে সমস্ত আওয়াজ বেরোয় তার কোনোটাই এই সব মাপের বাইরে যায় না। যখন যায় তখন যে আওয়াজ বেরোয় তাই শ্রুতিকটু, বেসুরো বা ভাঙা হয়—যেমন কৌতুকাভিনয় করার সময় মাঝে মাঝে ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়ে থাকে কিংবা গলা খারাপ থাকলে হঠাৎ হঠাৎ সেরকম স্বর বেরিয়ে পড়ে।

আমাদের গলা থেকে বুক পর্যন্ত শ্বাসনালীটি একটি দুমুখ খোলা নলের মত। আমরা নিতান্ত শারীরিক যোগ্যতাবশেই এই নলটিতে ও তার নিচের বা ওপরের অবশিষ্ট ফাঁপা অংশে ইচ্ছামত বায়ু-ধরে রাখতে বা ছাড়তে পারি। এই দুমুখ খোলা নলে নিয়ন্ত্রিত বায়ুস্তম্ভকে গলার নিচের দিকের দু একটা পেশী সংকুচিত করে শ্বাসনালীর মুখে অবস্থিত দুটি পাতলা পর্দার (vocal chord) সাহায্যে কাঁপানো (vibrate) যায়। ধরে রাখা এই বায়ুস্তম্ভের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী এই কম্পন থেকে যে ভিন্ন ভিন্ন অনুনাদ (Resonance) সৃষ্টি হয় তাই ওই স্বরসপ্তকের এক-একটি নির্দিষ্ট পর্দা বা ধ্বনি। আমরা যখন

কোনো লোকের গলাকে 'সুরেলা' বলি তার অর্থ এই যে, লোকটি কথা বললেই কোনো না কোনো নির্দিষ্ট অনুনাদ সৃষ্টি হয় বা সব সময়েই স্বরযন্ত্রের কোনো না কোনো পর্দা দিয়ে সে স্বর প্রক্ষেপণ করে থাকে। কিছু লোকের মধ্যে এটা জন্মগতভাবেই থাকে। বাকিদের গলায় রেওয়াজের মাধ্যমে এই অভ্যাস তৈরি করে নিতে হয়। কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর করার জন্য তো বটেই, ঠিক সুরে ঠিক কথাটি বলার জন্যও আবৃত্তিকারের এই স্বরের সাধনা ও স্বরকে চেনা প্রয়োজন। মনে হতে পারে, এসব গানের কায়দাকানুন গানেই প্রযোজ্য। কারণ গান হচ্ছে সুরের ব্যাপার, আবৃত্তি কথার। এই রকম, একটা কথার চল আছে যে আধুনিককালে আবৃত্তি আর সুর করে করা উচিত নয় একেবারে কথার মত বলা উচিত। এই প্রসঙ্গে দুটি ভাবনার কথা উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমত, আমি বলেছি যে গলা সুরেলা হলে তবেই সে কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি, তা গান, আবৃত্তি, অভিনয়, বক্তৃতা যাই হোক, শুনতে ভালো লাগে এবং সুরেলা গলার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি তাও বলেছি। দ্বিতীয়ত, আমরা দৈনন্দিন যে কথাবার্তা বলি, তাও সুরেই বলা হয়, যদিও গানের সুর থেকে তার কাঠামো আলাদা, কিন্তু কণ্ঠনিঃসৃত কোনো স্বাভাবিক ধ্বনিই উপরোক্ত ধ্বনিনিয়মগুলের ব্যতিক্রম নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইচ্ছাকৃতভাবে বা অন্য কোনো কারণে বেসুরো আওয়াজ বেরিয়ে পড়ছে। অবশ্য অনুশীলন না থাকলে আমাদের স্বর একেবারে ঠিক ঠিক স্থান দিয়ে প্রক্ষেপণ করা যায় না—ফলে 'সুরেলা' হয় না। আসলে, 'সুর না করে বলা' বলতে যা বোঝাতে চাওয়া হয় তা নিশ্চয় শ্রুতিকটু স্বরে বলতে বলা হয় না, তা হচ্ছে, শব্দগুলির উচ্চারণে বেশি বিস্তার না করা, টেনে টেনে না বলা বা জোর করে কিছুটা অতিরিক্ত সুর চাপিয়ে না দেওয়া। এইবার, দেখা যাক, গানের সুর আর আবৃত্তির সুরে পার্থক্যটা কি? দুটোই আসলে স্বরের নিরবচ্ছিন্নতা (continuty)। রাগ-সংগীতে কথা নেই বললেই হয়। সেখানে শুধু ওই সব স্বরগুলির নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বইয়ে দেওয়া নানাভাবে উঠিয়ে নামিয়ে, দাঁড়িয়ে দৌড়ে ইত্যাদি—যেখানে যেমন নিয়ম। কাব্যগীতিতে ওই সুরের গতির মধ্যেই কথাকেও উচ্চারণ করতে হয় কিন্তু সেখানে কথার দাবির চেয়ে সুরের দাবিই বড়। সুরের প্রাধান্যের জন্য কথার ফাঁকে ফাঁকে কথার স্বর ছাড়াও অনেক বেশি বিস্তার বা ফাঁক থাকে যে জায়গাটাতে সুর বা স্বরই থাকে শুধু। কখনো দুটি শব্দের ফাঁকে, কখনো বা একই শব্দের বর্ণের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে মাঝখানে সুরকে জায়গা করে দেওয়া হয়। কাজেই, কথা সেখানে তার ধর্মানুবর্তী না হয়ে সুরের অনুগামী হয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বা অন্যান্য সচেতন স্রষ্টার গানে কথার প্রকাশের

(Expression) সঙ্গে সঠিক স্বরের মিলন ঘটিয়ে কথার আধিপত্য গানে বজায় রাখার চেষ্টাও দেখা যায় এবং এই ধরনের সহজ স্বরের কাব্যগীতি সহজতর হলে তা অনেকটা সুর করে কবিতা পড়ার মতই শুনতে লাগে। অর্থাৎ অর্থের ফাঁকে ফাঁকে স্বরের আতিশয্য যতই কমে এসে কথাগুলিকে বা শব্দের বর্ণগুলিকে কাছাকাছি দাঁড়াতে দেয়, ততই গান কবিতা পড়ার পর্যায়ে চলে আসে। আবৃত্তিতে তাই এই স্বরপ্রয়োগের ব্যাপারটি খুব মাপা। এতই মাপা যে কথাগুলো ঠিক দাঁড়িয়ে থাকে, বর্ণগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না—এইমাত্র। নতুবা, গানেও যেমন স্বরের বৈচিত্র্য দরকার, আবৃত্তিতেও তেমনি। চলতি উদাহরণ নিয়েই দেখা যাক। মনে করুন, আপনি কোন ছোটছেলেকে ভয় দেখাচ্ছেন, "ওই—ভূ—ত!" গম্ভীর গলা করে এটা বলুন। দেখুন আপনার স্বাভাবিক স্কেলের নিচের দিকে মন্দ্র সপ্তকের কোন স্বর নিশ্চয়ই লাগছে। বা "মৃদু গভীর রবে মেঘের গুরু গুরু" পংক্তিটি গম্ভীর আওয়াজে ধ্বনিত করার চেষ্টা করুন—ওই ধরনেরই নিচু স্বরগুলি লাগবে। তেমনি, দূরে একটা ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে, চেঁচিয়ে ডাকলেন, "ট্যাক্সি—।" আরও দূরে চলে গেল ট্যাক্সি, আরও দূর থেকে আপনার স্বর শোনা যাচ্ছে। "ট্যাক্সি—।" এইভাবে আপনি ক্রমাগত পেছনে পড়ছেন ও ডাকছেন। এটা বোঝাবার জন্য পরপর যেভাবে আপনি ট্যাক্সি উচ্চারণ করবেন, লক্ষ ক'রে দেখুন আপনার স্বর ক্রমশ স্বাভাবিক সপ্তস্বর ছাড়িয়ে উর্ধ্বসপ্তকের 'সা'কে স্পর্শ করছে বা আরও উঁচুতে যাচ্ছে। স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে বলতে দুঃখের কথা এসে পড়লে স্বর কেমন দু এক পর্দা নেমে যায়। এইভাবে, আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তাতেই নানাভাবে স্বরগুলির ব্যবহার হয়ে থাকে। আর কবিতা তো এসবের বাইরে কিছু নয়, তার মধ্যেও নানা স্বর গচ্ছিত আছে। চিনে নিতে হয়, প্রয়োগ করতে হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, দৈনন্দিন কথাবার্তায় তো এত ভেবে চিন্তে স্বর লাগাতে হয় না, ওসব মানুষের আপনা আপনিই হয়ে যায়। আমি যখন বই দেখে নিজের আবেগ অনুযায়ী কবিতা পড়ি, আমার বন্ধুবান্ধব তাতেই বেশ বুঝতে পারে। অত স্বরের কায়দায় কাজ কী! ঠিক আছে, এবার দ্বিতীয় ভাবনায় আসা যায়।

সাধারণ কথাবর্তার চাইতে নাটকে একটু যেন বাড়াবাড়ি হয়, নাটকের চাইতে যাত্রায় আরও অনেক বাড়াবাড়ি হয়। এইভাবে শিল্পভেদে কথার নিয়ন্ত্রণের মাপ আছে। আবৃত্তির ক্ষেত্রে কবিতার ভাব ও ছন্দের গণ্ডির মধ্যে তার একটা অন্তর মাপ আছে, সেটা ঠিক রাখতে গেলে প্রথমেই স্বরকে দখলে আনতে হবে, চিনতে হবে, খুঁজে দেখতে হবে কোথায় কোন্ স্বরের প্রয়োগ যথোপযুক্ত। তা নির্ণীত

হবে শুধু কবিতার ভাব ও অর্থের উপর ভিত্তি করেই নয়, সেই পংক্তিটিতে কী ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার ধ্বনিব্যঞ্জনায়, সেই অংশের বা সামগ্রিক কবিতার ছন্দ, সেই অংশের চিত্রকল্প ও কবি-মানসিকতার ওপরও বটে।

যে কোনো মানুষ তাঁর স্বাভাবিক স্কেলের সাতটি স্বর ও তার কোমল স্বরগুলির যে কোন একটিতে স্বরকে দাঁড় করিয়ে কবিতার লাইন বলে যেতে পারেন কথার স্বাভাবিক উচ্চারণকে একটুও বিকৃত না করেও এবং উপযুক্ত অভ্যাস থাকলে কথার শব্দগুলিকে একটুও টেনে না বাড়িয়ে।

'দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবীমঞ্জরি
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল—'

'শা-জাহান' কবিতার এই পংক্তি ক'টি আপনার স্বাভাবিক স্কেলের প্রথম চারটি পর্দায় দাঁড় করিয়ে বলুন। সা, রে, গা, মা—চারটি স্থান দিয়ে। দেখুন, কোন্‌টিতে ধ্বনিব্যঞ্জনা ও স্বরমাধুর্য সর্বাপেক্ষা বেশি হয়? অর্থ বা ভাব তো এর যে কোনোটি দিয়েই প্রকাশিত হতে পারে অন্তত এক্ষেত্রে। আমি ব্যক্তিগতভাবে দশ বারোজনকে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি 'মা' (মধ্যম) দিয়ে বললেই পূর্ণ মাধুর্যটুকু আদায় হয়। একই ধরনের অনুপ্রাসধর্মী শব্দশৈলী জীবনানন্দে কোথাও থাকলে আমরা হয়তো মধ্যম পর্যন্ত ওঠার চেষ্টা করতাম না, তখন খাদের দিকের কোনো স্বর খুঁজতে হত। আবার পরবর্তী পংক্তিটি :

বিদায় গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।

নিশ্চয় ওই স্বরেই বলে যাওয়া হবে না। স্বর একটু নিচু পর্দায় নামবে। ধরা যাক, স্বাভাবিক (মধ্যসপ্তক) 'সা'-তে এসে বলা হল। এখন, এই নামার পদ্ধতিটা কি রকম হবে? সরাসরি মাঝের পর্দাগুলো বাদ দিয়ে, না প্রতিটা ছুঁয়ে, না দু-একটা ছুঁয়ে? এই নামা-ওঠার পথগুলো, কবিতাভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে বাধ্যই এবং যিনি আবৃত্তি করছেন তাঁর মেধা অনুযায়ী এই প্রয়োগের যাথার্থ্য ও সাফল্যের তারতম্য হবে। কিন্তু ব্যাপক অভিজ্ঞতা, পরিষ্কার বোধ ও স্বর নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট ক্ষমতা ছাড়া এই ধরনের কাজ গলার অনর্থক জিমন্যাস্টিকে পরিণত হতে পারে।

এই হল, স্বরের প্রক্ষেপণ ব্যাপারে প্রয়োগচিন্তার কিছু গোড়ার কথা।

কিন্তু আবৃত্তিতে প্রয়োগ বলতে তো শুধু স্বরের ঝরেলা ওঠানামাই নয়, প্রতিটি ধ্বনের প্রক্ষেপণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কথার ভঙ্গি, প্রকাশের ডিগ্রী, আবেগের মাত্রা অথবা এই সবের প্রয়োজনেই স্বর প্রয়োগের বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয়। এছাড়া, শুধু 'উচ্চারণ'ই আবৃত্তির প্রয়োগচিন্তার একটা বিরাট উপাদান। উচ্চারণের শুদ্ধতাই তো শুধু নয় উচ্চারণের কৌশলে ও যত্নে শব্দ তার অর্থাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা অর্জন করে, আবার আনাড়ির জিভে সেই কৌশলই কবিতার মৃত্যু ঘটায়। 'ছন্দ' প্রয়োগের আর এক উপাদান। কিভাবে ধ্বনিকে গড়াতে দিলে, তার ঝোঁক নিয়ন্ত্রণ করলে বা থামালে ছন্দের সংগীতটি বা ধ্বনিজাত ছন্দোময়তাটি রূপ পরিগ্রহ করবে তা নিয়মিত প্রয়োগের অভ্যাস না থাকলে 'তালছুট' হতে বাধ্য। তেমনি ছন্দবন্ধনের মধ্যে বা সমতল কবিতায় বিরতির ধরন ও পরিমাপও প্রয়োগের উপাদান। এরকম আরও উপাদান আছে। এগুলির প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রয়োগচিন্তার কথা উদাহরণ সহযোগে আলোচ্য। কিন্তু এ প্রবন্ধে আমি স্বর-প্রয়োগের কথাই বলতে চেয়েছি। ছন্দকে অনুরণিত করতে, চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে, ভাবপরম্পরা গ্রথিত করতে বা আধুনিক কবিতার বিচ্ছিন্নতাধর্মী 'মন্তাজ'গুলিকে সামগ্রিক একটা বোধগম্য বন্ধনে টেনে আনতে—প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বরের প্রকাশভঙ্গির আবেগ নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা আছে। প্রকাশ ব্যাপারটা যে যার নিজস্ব। আমরা তো প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় আমাদের আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতিগুলো প্রকাশ করি। কাজেই সর্বত্র এইসব প্রকাশভঙ্গি ছড়িয়ে আছে। জীবন থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আবৃত্তির সময় স্বরের ও আবেগের মাপটা ঠিক রেখে বসিয়ে দিলেই হল। তবে ভালো আবৃত্তি শুনলে ও অভিনয় দেখলে (শুনলে) কিভাবে প্রাত্যহিক সাধারণ 'প্রকাশ'কে সেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে তার কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়। এইভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রেও প্রয়োগের ভাণ্ডার বাড়ানো যায়। কিন্তু এসব তো চলতে শেখার পর কখন ছুটবো, কখন দাঁড়াবো, কী কুড়িয়ে নেবো, কোন্‌পথে যাবো সেই সব কথা। তার আগে স্বরকে তার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কৌশলটা আয়ত্ত করতে হবে। এইটেই এ প্রয়োগকর্মের প্রথম শর্ত হওয়া উচিত।

আবৃত্তি ও পাঠ

সুজন চন্দ

'পুনঃ পুনরর্থানুসন্ধানং আবৃত্তিঃ'—অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কোন শব্দ উচ্চারণ করে তার অর্থ অনুসন্ধান করার নামই আবৃত্তি। 'এক শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকেচ কামধুগ্ ভবতি'—অর্থাৎ একটি শব্দ যদি সুপ্রযুক্ত হয়, সম্যকজ্ঞাত হয়, তাহলে সেই শব্দটি ইহলোক ও স্বর্গলোকে কামধুক্ হয়। অর্থাৎ এক কথায় শব্দ-উচ্চারণকারীর ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কেন না, শব্দই ব্রহ্ম। সুতরাং এই আবৃত্তির ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

বারংবার অনুশীলনের দ্বারা লব্ধ বাগ্‌যন্ত্রের একটি অভ্যাস হল আবৃত্তি। 'It is a habit of the vocal machinery learned through repeated trials (rehearsals), according to the laws of habit formation'—Memory : I. M. W. Hunter। শুধু বাগ্‌যন্ত্রের অভ্যাসই নয়, আবৃত্তিকারকে বিষয়বস্তুর মূল সুর অধিগত করতে হবে। তবেই সেটা হবে সত্যিকারের আবৃত্তি। বই দেখে পাঠ করার ফলে যে বিদ্যা অর্জন হয় তাকে বলা হয় 'পুস্তকস্থা বিদ্যা'। আর আবৃত্তি হল 'অধিগত বিদ্যা'। 'পুস্তকস্থা বিদ্যা' সম্পর্কে চাণক্য বলেছেন : পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা

পরহস্ত গতং ধনম্।
কার্যকালে সমুৎপন্নে
ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥

অর্থাৎ পুস্তকের বিদ্যা আর পরের হাতের ধন একই কথা। প্রয়োজনে কোন কাজেই লাগে না।

আবৃত্তি সম্বন্ধে ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ গভীর ও ব্যাপক আলোচনা করেছেন। তাঁদের আবৃত্তির উদ্দেশ্য অবশ্যই রসিক মনের চিত্ত বিনোদন ছিল না, মন্ত্র ও স্তোত্র আবৃত্তি করে তাঁরা দেবতার কৃপা প্রার্থনা করতেন। অধ্যাত্ম অভীপ্সার যোগ হেতু আবৃত্তিকে তাঁরা ধর্মীয়

অনুষ্ঠানের মর্যাদা দিয়েছেন। স্মৃতি ও শ্রুতি এই দুইয়ের মধ্যেই আবৃত্তির জন্মকথা লুকিয়ে আছে।

পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে তার পরিবেশন স্মৃতির কাজ। সেক্ষেত্রে স্মরণ ক্রিয়া একটি সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। যোগ্য ব্যক্তির স্মরণ ক্রিয়া তাই নান্দনিক (aesthetic) বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হ'তে পারে। তা বলে, স্মরণ ক্রিয়া ও আবৃত্তি এক জিনিস নয়। শুধু স্মৃতি থেকে পাঠ আবৃত্তি নয়, পাঠ্যবিষয়কে অধিগত করতে হবে।

এবার পাঠ ও আবৃত্তি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় আসা যাক। পাঠ-কর্ম পাঠকের সচেতন মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। এতে আবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না। ধরে নেওয়া যায়, বিষয়বস্তু স্মৃতির অধিগত নয় বলেই কিংবা পূর্ব প্রস্তুতি নেই বলেই পাঠের প্রয়োজন। পাঠে স্মৃতির ভূমিকা গৌণ, বর্তমানই সত্য। পাঠকালে মনঃসংযোগেও বিচ্ছিন্নতা আসে। একটি পংক্তি পাঠ করতে করতে স্বভাবতই পরের পংক্তির দিকে নজর চলে যায়। সেক্ষেত্রে পরবর্তী স্তর অর্থাৎ ভবিষ্যত প্রত্যাশা পাঠককে চঞ্চল করে। ফলে, পাঠ্যবস্তুর প্রতি তার ভাবতন্ময়তা বিঘ্নিত হয়। St. Augustine-এর স্মৃতি সম্পর্কিত মন্তব্যে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন : "The past is memory the future expectation. the present attention. Or more precisely, since the present is the only one which exists, it follows that the present contains within if the past as present memory and the future as present expectaion." তাই বলা চলে পাঠ বিশেষত অনুশীলনহীন পাঠ আবৃত্তির চাইতে নিকৃষ্ট। তাছাড়া, আবৃত্তিকার যদি নিজের দৃষ্টি এবং মনোযোগ কবিতার বই বা কাগজের প্রতি নিবদ্ধ রাখেন তাহলে শ্রোতার সঙ্গে একটি মানসিক সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে বাধা পান। পরন্তু, শ্রোতার মনে বিরক্তিকর একটি ধারণা জন্মাবার সম্ভাবনা থাকে। সম্ভাবনা থাকে ছন্দ পড়ে যাবার ও উচ্চারণ অশুদ্ধ হবার। আবৃত্তিকারের পক্ষেও সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে কবিতার জন্য প্রয়োজনীয় ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না—"It is practically impossible when one speaks with passion or fervour, to devote his eyes and mind to the lines in book."

অপরপক্ষে, শ্রোতার মনোজগতে ভাবের অনুরণন সৃষ্টি করে তাকে সুরের ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে উপলব্ধির স্তরে উত্তীর্ণ করে দেওয়াই কবিতা বা গদ্য আবৃত্তি করার উদ্দেশ্য। কবিতার অর্থ মনের কাছে স্বতঃই প্রকাশমান হয় এবং ভাবের সূক্ষ্ম

অনুভূতি চেতনায় ধরা পড়ে সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে তা আবৃত্তি করার মাধ্যমে। তাই আবৃত্তিকারকে কবিতার ভাববস্তু ও সুর অর্থাৎ কবিতার মূল সুর হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যাতে কবিতার ভাষা ও সুরের ধারাটি অব্যাহত থাকে। আবৃত্তির উদ্দেশ্য কবিতা বলার মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের সম্মুখে কবিকে উপস্থিত করা।

নিখুঁত মুখস্থের মধ্যেও ত্রুটি থাকতে পারে। স্মৃতি যতই প্রখর হোক কিছু অনিবার্য স্খলন ও চ্যুতি আবৃত্তিতে এসেই পড়ে। অভিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ এটা সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁরা আবৃত্তির প্রারম্ভে আরাধ্য দেবতার কাছে সম্ভাব্য ত্রুটি সম্বন্ধে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিতেন। তাঁরা যেসব ত্রুটির উল্লেখ করেছেন সেগুলি ধ্বনিবিজ্ঞান ও উচ্চারণ রীতি সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের পরিচায়ক।

'যদ ক্ষরং পরিভ্রষ্টং। মাত্রা হীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ ॥
যন্মাত্রা বিন্দু। বিন্দু দ্বিতয়ঃ ॥
পদ পদন্বম্ব। বর্ণাদিহীনঃ ॥
প্রবচন বচনাৎ। বাক্রম অবাক্রম ॥
মোহাৎ অপঠিতম্। অজ্ঞানত পঠিতম ॥ ইত্যাদি।

অর্থাৎ আবৃত্তিকালে অক্ষরের ভ্রষ্টতা, ভুল মাত্রায় উচ্চারণ, বিসর্গের অনুচ্চারণ কিংবা অযোগ্য স্থানে বিসর্গস্থাপন, সমাসের ভুল, বর্ণ বিলোপ, স্মৃতির অনধিকার প্রবেশ হেতু পূর্ব পরিচিত শব্দের ভাব নিরপেক্ষ উচ্চারণ, অস্পষ্ট উচ্চারণ কিংবা কোন অক্ষর অনুচ্চারিত থাকা, অনর্থক উচ্চারণ ইত্যাদি।

প্রাণ বা শ্বাসবায়ু সংযমের ব্যর্থতা থেকে মহাপ্রাণ বর্ণ অল্পপ্রাণ, অল্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ বর্ণ হয়ে যেতে পারে। যেমন দুধ হয় 'দুদ', গর্দভ হয় 'গর্দব'।

কবিতার বিষয়বস্তু অধিগত করে মূল সুর অক্ষুণ্ণ রেখে যথাযথ স্বরক্ষেপণ ও প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে শ্রোতৃবর্গের নান্দনিক তৃষ্ণা মেটানোই আবৃত্তি। এক্ষেত্রে, 'ছন্দ' ও 'যতি' সম্পর্কেও আবৃত্তিকারকে সতর্ক থাকতে হবে।

শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, 'আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী'—অর্থাৎ সর্বশাস্ত্র পাঠে যে বোধ বা জ্ঞান অর্জিত হয় আবৃত্তিতে তার চাইতেও অনেক বেশি জ্ঞান লাভ হয়। আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েই আবৃত্তি এই মর্যাদা লাভ করেছে। এর মানসিক ও দৈহিক ব্যাখ্যানও তাৎপর্যময়। কিন্তু একজন শম্ভু মিত্র বা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা অন্য কোনও আবৃত্তিকারের আবৃত্তির অন্তরালে প্রেরণারূপে প্রায় ক্ষেত্রেই বিন্দুমাত্রও আধ্যাত্মিক অভীপ্সা

নেই। তাঁরা সম্পূর্ণ সম্মুখে উপবিষ্ট শ্রোতাদের নান্দনিক তৃষ্ণা মেটাতে পারলেই সন্তুষ্ট হন। তাই দেখি, ব্যক্তি ভেদে একই কবিতার বিভিন্ন ভঙ্গির উপস্থাপনা। সেক্ষেত্রে একই কবিতা বিভিন্ন ব্যক্তির কণ্ঠে নূতন ভাবরূপ লাভ করে যদি তা রসিকজন-চিত্তবিমোহন হয় তবেই তা সার্থক। তবু বলব, আবৃত্তির সম্ভাব্য ত্রুটিগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকলে এই সফলতা অর্জন আরও সহজ হতে পারে।

আবৃত্তির বিভিন্ন দিক

কলহন

সাধারণ অর্থে বুঝি 'আবৃত্তি' হ'লো কবিতা-পাঠ। এবং অনুমান করি কবিই হলেন কবিতার প্রথম পাঠক। অবশ্য স্বীকার করি, অধুনা 'আবৃত্তি' অর্থে সাদামাটা ভাবে কবিতা-পাঠই বোঝায় না, আরও বেশি কিছু বোঝায়। শব্দটির অর্থের আরও প্রসার ঘটেছে। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে একটু ভূমিকা সেরে নিই।

স্কুল-কলেজে যখন পড়ি, অভিনয় ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ খ্যাতি লাভ ঘটেছিল। এবং সেই সুবাদে প্রায়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করবার ডাক পড়ত। সেই সময় আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল, ঘরোয়া-আসর ছাড়া আবৃত্তি কেউ শুনতে চায় না। আবৃত্তি শ্রোতার কাছে ক্লান্তিকর এক বস্তু। কিন্তু হালে কিছু অনুষ্ঠানে দেখলাম, আবৃত্তি আর আগের মতো সেই ক্লান্তিকর বস্তু নেই। শ্রোতার কাছে তার আবেদন যথেষ্ট, এমন কি কখনো কখনো গানের থেকেও বেশি। আবৃত্তি এখন একটি স্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে চিহ্নিত। আগে অভিনয়ের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন, আবৃত্তি ছিল তাদেরই দখলে। সম্প্রতি লক্ষ করলাম এমন কয়েকজনের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা শুধুই আবৃত্তির চর্চা করেন। গত কয়েক বছরে আবৃত্তির চর্চা বেড়েছে, শ্রোতাও বেড়েছে অনেক। ফলে আবৃত্তির একটি শিল্প-রূপ এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেহেতু আবৃত্তিকে একটি শিল্প হিসাবে চিহ্নিত করছি, সেই হেতু শিল্পীভেদে আবৃত্তির রূপভেদও ঘটবে নিশ্চিত। তবু আবৃত্তি-শিল্পীকে কিছু প্রাথমিক শর্ত পূরণ করতেই হয়।

প্রথমত, আবৃত্তিকারের লক্ষ্য থাকবে শ্রোতার হৃদয়ে কবিতার বোধকে সঞ্চারিত করে দেওয়া।

দ্বিতীয়ত, কবিতার প্রতিটি শব্দ নিখুঁত ভাবে উচ্চারণ করা প্রয়োজন। কেন না শিক্ষিত মার্জিত রুচির লোকেরাই আবৃত্তির প্রধান শ্রোতা। উচ্চারণ নিখুঁত না হ'লে যে কবিতা-পাঠই শ্রুতিকটু হ'য়ে

উঠবে তা নয়, শব্দের ব্যঞ্জনাও মাঠে মারা পড়বে।

শ্রোতার হৃদয়ে কবিতার বোধটিকে সঞ্চারিত করে দেবার জন্য আবৃত্তিকারের সর্বাগ্রে যে জিনিসটি জানা প্রয়োজন, তা হ'লো কবি ও কবিতার মেজাজ সঠিক ভাবে চিনে নেওয়া, আত্মস্থ করা। কবি এবং কবিতার তারতম্য ভেদে আবৃত্তিরও তারতম্য ঘটবে। প্রতীকী বর্ণ বা শব্দের চেয়ে ধ্বনির শক্তি অনেক বেশি। কাজেই ধ্বনির সাহায্যে যা বলা সম্ভব, শব্দের সাহায্যে তা নয়। বর্ণ বা শব্দ ধ্বনির লেপা প্রতীক ঠিকই, কিন্তু শব্দ নিয়ে যাঁরা কারবার করেন তাঁরা জানেন, প্রতিটি শব্দের একটি আলাদা চেহারা এবং চরিত্র আছে। আবৃত্তিকারকে স্বরগ্রামের নানা কলা-কৌশল প্রয়োগে সেই চেহারাটি ফুটিয়ে তুলতে হয় কবিতার বোধটিকে নিখুঁত ভাবে শ্রোতার হৃদয়ে সঞ্চারিত করার লক্ষ্য সামনে রেখে। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, 'হাঁফায়' বলতে আবৃত্তিকারকে হাঁফাতে হবে, বা 'ক্রুদ্ধ' বলতে রাগত ভাব আনতে হবে মুখে। কবিতার ছন্দ জেনে নিয়ে শব্দের মাত্রা এবং যতি-চিহ্নের প্রতি সুবিচার করতে হবে। সর্বোপরি কবিতায় ফাঁক পূরণের জন্য, প্রাণ সঞ্চারের জন্য, ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য চাই স্বরগ্রামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য। এবং মাইক্রোফোনের সামনে স্বর-প্রক্ষেপণের কলাকৌশল, যার সামান্যতম কম বেশি মাত্রা প্রয়োগে কবিতা তার সমস্ত রসমাধুর্য হারাবে।

অনেক জায়গায় জজিয়তি করতে গিয়ে প্রতিযোগীদের কাছ থেকে একটা কথা প্রায়ই শুনতে হয়েছে, আবৃত্তিতে অঙ্গভঙ্গি করা চলবে কি না। অভিনয় যখন করতাম, দেখেছি নতুন অভিনেতাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়াতো তার হাত দুটো। প্রতি কথার সঙ্গেই তো আর হাত নাড়ানো যায় না। সে সময় হাত দুটোকে নিয়ে কী করা। এ-ব্যাপারে আমার উপদেশ থাকত, হাত নিয়ে মাথা না ঘামানো। আবৃত্তির ওই প্রতিযোগীদের প্রতিও আমি একই কথা বলে আসছি, অঙ্গভঙ্গি যদি স্বাভাবিক হয় তবে চলবে, আর যদি তা চেষ্টাকৃত এবং বিকৃত হয় তবে অবশ্যই নম্বর কাটা যাবে আপনা থেকেই। কেন না, তখন কবিতার চেয়ে কবিতার পাঠক দর্শনীয় হয়ে উঠবেন। উদ্দেশ্য মারা পড়বে, বিধেয় বড়ো হয়ে উঠবে।

আবৃত্তিতে অঙ্গভঙ্গি চলা উচিত কি না—এই নিয়ে নামী আবৃত্তিকারদের মধ্যেও দুটি মত আছে। একদল বলেন যে, আবৃত্তি অভিনয় নয়, সেই হেতু অঙ্গভঙ্গি আবৃত্তিতে নিষিদ্ধ। আর একদল বলেন, কোন্ শাস্ত্রে লিখেছে যে আবৃত্তিতে অঙ্গভঙ্গি অচল? আমি বলি, অভিনয় এবং আবৃত্তি নিঃসন্দেহে দুটি স্বতন্ত্র শিল্প। তাই দুটোর রূপদানও ভিন্নতর হবে। আবৃত্তিতে সেইটুকুই

অঙ্গভঙ্গি করা চলে, যেটুকু তার স্বাভাবিক অঙ্গ। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, কথা বলার সময় মানুষ অচেতন ভাবেই চোখ মুখ হাত নাড়ায়। এটাই তার স্বাভাবিক ধর্ম। আবৃত্তিকারদের কাছে এই স্বাভাবিকত্বটুকুই প্রত্যাশা করি, তার বেশিও নয়, কমও নয়। বেশি হলে আবৃত্তি অভিনয়ের অঙ্গনে ঢুকে পড়বে, কম হলে তা হবে নিরস, নিষ্প্রাণ কবিতা-পাঠ।

আবার স্বভাবধর্মেই ছোটরা বড়দের থেকে বেশি হাত-পা নাড়ায়। ছোটদের আবৃত্তিতে একটু অতিরিক্ত হাত-পা নাড়ানোও খারাপ লাগে না। অর্থাৎ সেটাই স্বাভাবিক।

এবার উচ্চারণ প্রসঙ্গে আসি। উচ্চারণ নিয়ে বাংলায় বিভ্রাট কম না। যেমন 'হরি' শব্দে আমরা হ যেরূপ উচ্চারণ করি, 'হর' শব্দে হ সেরূপ উচ্চারণ করি না। 'দেখা' শব্দের এ-কার একরূপ এবং 'দেখি' শব্দের এ-কার আর-এক রূপ। 'পবন' শব্দের প অকারান্ত, ব ওকারান্ত, ন হসন্ত শব্দ। 'শ্বাস' শব্দের শ্ব-এর উচ্চারণ বিশুদ্ধ শ এর মতো, কিন্তু বিশ্বাস শব্দের শ্ব-এর উচ্চারণ শ্‌শ-এর ন্যায়। 'বায়' লিখি, কিন্তু পড়ি ব্যায়। অথচ 'অব্যয়' শব্দে ব্য-এর উচ্চারণ ব্ব-এর মতো। আমরা লিখি গর্দভ, পড়ি—গর্দোব। লিখি 'সহ্য', পড়ি—সোজ্‌ঝো।

আমরা বলি আমাদের তিনটে স-এর উচ্চারণের কোনো তফাত নেই, বাংলায় সকল স-ই তালব্য শ-এর মতো উচ্চারিত হয়; কিন্তু আমাদের যুক্ত-অক্ষর উচ্চারণে এ কথা খাটে না। তার সাক্ষ্য, 'কষ্ট' শব্দ এবং 'ব্যস্ত' শব্দের দুই শ-এর উচ্চারণের প্রভেদ আছে। প্রথমটি তালব্য শ, দ্বিতীয়টি দন্ত্য স। 'আসতে হবে' এবং 'আশ্চর্য' এই উভয় পদে দন্ত্য স ও তালব্য শ-এর প্রভেদ রাখা হয়েছে। জ-এর উচ্চারণ কোথাও বা ইংরেজী Z-এর মতো হয়, যেমন লুচি ভাজতে হবে। এ স্থলে ভাজতে শব্দের জ ইংরেজি Z-এর মতো।

'সচরাচর আমাদের ভাষায় অন্তঃস্থ ব-এর আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু জিহ্বা অথবা আহ্বান শব্দে অন্তঃস্থ ব ব্যবহৃত হয়। আমরা লিখি তাঁহারা। কিন্তু উচ্চারণ করি—তাঁহারা অথবা তাঁইারা।'—রবীন্দ্রনাথ

অতি, কলু, ঘড়ি, কল্য, দক্ষ ইত্যাদি স্থানে অ হ্রস্ব 'ও' হয়ে যায়। এমনি আরও কত কী। যেহেতু বাংলায় কোনো উচ্চারণের অভিধান নেই, সেই হেতু এ-ব্যাপারে আমার পরামর্শ হ'লো, অধিকাংশ শিক্ষিত মার্জিত রুচির লোক যেমনটা উচ্চারণ করেন, সেটাই আদর্শ উচ্চারণ হিসাবে গণ্য করা। বিভ্রাট এড়াবার আপাতত আর সহজ উপায় চোখে পড়ছে না। তবে প্রতিযোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ত্রুটি চোখে পড়ে নাসিক্যধ্বনি (চন্দ্রবিন্দু), এ-কার, র-ড়,

ঋ-কার, র-ফলা এবং সমাসবদ্ধ পদের উচ্চারণে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নাসিক্যধ্বনি উচ্চারিত হয় না, আবার কখনো কখনো চেষ্টাকৃত ভাবে নাসিক্যধ্বনির ওপর জোর দিতে গিয়ে পরবর্তী বর্ণও নাসিক্য হয়ে পড়ে অনাবশ্যক ভাবে। এ-কারের উচ্চারণের কথা আগেই বলেছি। র-এর উচ্চারণ নরম; ড়-এর একটু শক্ত। ড়-এর উচ্চারণে জিহ্বা উল্টে গিয়ে তালু স্পর্শ করে; র-এর বেলায় তা করে না। ঋ-কার—র-ফলার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। ঋ-কার-এর উচ্চারণ একটু শক্ত; র-ফলার নরম। 'অদৃষ্ট' উচ্চারণ 'অদ্‌দৃষ্ট' হবে না। অ-দৃষ্ট হবে। কিন্তু 'সুপ্রীতি'-এর উচ্চারণের 'প'-দ্বিত্ব হয়ে যাবে। সমাসবদ্ধ-পদের বেলায় সমস্যা আর-একটু বেশি। 'দেশ-বন্দনা'—দেশ্‌-বন্দনা হবে, না দেশ (অ)-বন্দনা হবে? বাংলা নরম মেজাজের ভাষা। এ ক্ষেত্রে 'দেশ'-এর অকারন্ত উচ্চারণই শ্রুতি মধুর। এবং আমার মতে, সেটাই গ্রহণীয়। অবশ্য এমন উদাহরণ দুর্লভ হবে না, যেখানে হসন্ত উচ্চারণ অপরিহার্য। অন্যথায় অর্থের তারতম্য ঘটে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অর্থের দাবিই আগে।

এই প্রবন্ধে যে বক্তব্য উপস্থাপন করলাম, তার সবটুকুই সকলের গ্রহণীয় হবে, এমন আশা আমি করি না। হলে তা আশাতিরিক্ত বলেই মনে করব।

আবৃত্তি : কথা ও সুর

শঙ্খ ঘোষ

বড়ো কোনো সভায় নয়, বিনয় মজুমদার একা একা তাঁর কবিতা পড়ছিলেন কফি হাউসের একান্তে, এই অল্প কদিন আগে। ভারি যত্নে আলাদা করে উচ্চারণ করছিলেন এক-একটি শব্দ, একটু জোর দিয়ে, আর হঠাৎ কখনো থেমে থাকছিলেন অনেকক্ষণ। যেন একটা শব্দ তিনি নতুন দেখলেন এখানে, কী ভেবে শব্দটি এখানে বসিয়েছিলেন যেন তাই ভেবে নিলেন একটু। তার পর, যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে, আবার শুরু করলেন তাঁর পড়া, তখন যেন গোটা ব্যাপারটার মানে পেয়ে গেছেন তিনি।

ততক্ষণে ধরতে পারলাম যে আসলে তাঁর সামনে আমি কোনো শ্রোতাই নই। বুঝে নিলাম যে এই পড়াটা আসলে তাঁর নিজের সঙ্গে নিজেরই একটা বোঝাপড়া মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। আর তখন মনে পড়ল যে ওঁর কবিতাও ঠিক তাই, ওঁর কবিতাও তো একেবারেই নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা। বাইরের পাঠক সমাজকে একেবারে অবান্তর ক'রে দিয়ে কবিতা লেখেন বিনয়, এবং সেইজন্যে ওঁর কবিতা পড়ার এই ধরনটাকে মনে হলো রচনার সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যময়। এই পড়াটাই যেন ওঁর কবিতার এক রকম মানে।

খুব কম কবির গলাতেই অবশ্য কবিতাপড়া কবিতার মানে হয়ে ওঠে। খুব কম সময়েই কবিতা বিষয়ে কবির ধারণা আর কবিকণ্ঠে তার আবৃত্তি একটা অর্থময় সংযোগ পায়। ভালেরি অন্তত অভিযোগ করেছিলেন যে মালার্মের একটানা মৃদু গলার আবৃত্তি তাঁর কবিতা-তত্ত্বের পরিপন্থী। অর্থাৎ, এমন-কী কবির নিজের কাছেও, কবিতার ইস্‌থেটিক্‌স আর কবিতার আবৃত্তিতে প্রায়ই দেখি একটা বিচ্ছেদ ঘ'টে যায়। কিন্তু কবির একই ব্যক্তিত্ব থেকে যদি জন্মায় এ-দুই ভিন্ন ব্যাপার, তাহলে কেমন ক'রে ঘটবে এই বিচ্ছেদ?

আবৃত্তিকে যাঁরা নিতান্ত ব্যসন হিসাবে ব্যবহার করেন, যাঁদের

গলা ভালো কিংবা গলাখেলানো ভালো, তাঁদের কাছে এটা কোনো সমস্যা নয়। কেননা তাঁরা কবিতার গন্ত অন্বয়টাকে মাত্র লক্ষ্যে রাখেন, সেইটেকে শ্রোতার কাছে সঞ্চারিত করতে পারলেই তাঁদের সফলতা। কবিতা যে তার চেয়ে বেশি কিছু, এটা বুঝে নেওয়া তাঁদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত একটু শক্ত। কিন্তু কখনো-বা সন্দেহ হয় যে জনপ্রিয় এই সব স্থূল আবৃত্তির হাওয়ায় কবিরাও অল্পবিস্তর প্রভাবিত হন। তাঁরা ভুলে যান যে রচনা এবং পাঠের মধ্যে একই অভিজ্ঞতার একই অভিপ্রায়ের সঞ্চার থাকা দরকার। আর এইটে ভুলে গেলেই কবিতাপড়া হয়ে ওঠে একটা শৌখিন ভঙ্গি মাত্র, আসর মাতাবার ফিকির।

এটা ঠিক যে আজ অনেকেই জেনে গেছেন, কবিতার শব্দকে একই সঙ্গে তার অর্থ আর ধ্বনির দিক থেকে গণ্য করতে হবে। তাই নামী এবং গুণী আবৃত্তিকারেরা শব্দের দিকে আর কবিতার অন্তঃসারের দিকে মন রেখেই আজ কবিতা পড়তে চান বটে। কিন্তু কখনো কখনো মনে হয় যে এই মনোযোগটা বুঝি ছাড়িয়ে যাচ্ছে সব মাপ। তাঁরা যে বিশেষ ক'রেই শ্রোতার মনে পৌঁছে দিতে চাইছেন শব্দের মহিমা, এই ইচ্ছেটা এতোই স্বয়ম্প্রকাশ হয়ে ওঠে যে কবিতাটি শেষ অবধি পৌঁছয় না হয়তো, শ্রোতার কাছে পৌঁছয় কেবল আবৃত্তিকারের একটা নাটুকে আবেগ।

বস্তুত, এই 'নাটক'ই হলো আমাদের কবিতা আবৃত্তির পথে মস্ত এক বাধা। কবিতা পড়ার সঙ্গে নাটক করার স্পষ্ট কোনো ভিন্নতা ধরতে পারেন, এমন আবৃত্তিকার আজকের দিনেও দুর্লভ। প্রায়ই বরং দেখা যায়, গলা উঠিয়ে-নামিয়ে কাঁপিয়ে-বাঁকিয়ে এমন একটা উত্তেজনা তৈরি হয়, যার আক্রমণে সমস্ত কবিতাটি এক লঘু শিথিলতায় ছড়িয়ে যায়। এমন-কী শম্ভু মিত্র তাঁর এমন আশ্চর্য সুঠাম স্বর নিয়েও কখনো কখনো কবিতা থেকে স্খলিত হয়ে পড়েন কবিতার বাইরে। এটা মানতেই হয় যে 'মধুবংশীর গলি'তে যে নাটকীয়তা ছিল, অথবা গলাকৌশলের যে প্রশ্রয় ছিল, রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেইটেই স্বভাব নয়। অন্তত রবীন্দ্রনাথের যে-সব কবিতা আবৃত্তি করতে শম্ভুবাবু পছন্দ করেন, সেখানে শব্দাবলি কতটাই স্বরতরঙ্গ সইতে পারে তা ভাবতে হবে, দেখতে হবে কতোটা কাঁপিয়ে বলা বা টেনেটুনে বলা সেখানে সংগত। 'চার অধ্যায়ে'র অভিনয়ে 'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস' যে ভাবে উচ্চারণ করেন তিনি, তা অবশ্যই মানিয়ে যায়, কেননা মঞ্চের দূরত্বে সিলুটের আবছায়ায় আর পুরো ঐ রোম্যান্টিক আবহে অন্ন

ছ-লাইন কবিতা অতীতের প্রেমবৈভবে ও-ভাবেই আসতে পারে, ঠিক। কিন্তু ঐ একই ভঙ্গি আর সংগত লাগে না মঞ্চ থেকে বাইরে এলে, অতীতের আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এলে, অর্থাৎ কবিতাপড়ার স্বাভাবিকতার দিকে অনেকখানি এগিয়ে এলে।

অতিনাট্যকে আবেগের প্রয়োগ থেকে সরিয়ে নেবার পরেও কবিতাপড়ার সমস্যা কাটে না। কবিতা যিনি আবৃত্তিমাত্র করেন না, যিনি অনেকটা ভিতর দিক থেকেই পড়তে চান কবিতা, তাঁকে বুঝে নিতে হয়: কথা বলার স্বাভাবিক ধরনটাই কি তিনি আনবেন গলায়, না কি এর মধ্যে ব্যবহার করবেন কোনো অতিরিক্ত সুর? বলা দরকার যে সুর শব্দটি এখানে ঠিক গানের অর্থে আনছি না। এ হলো এক রকম প্রকাশ্য আবেগ জাগানো সুর, এ হলো সেই সুর যা হয়তো পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তিতে। নাটক না এনেও শব্দগুলিকে কীভাবে তার ধ্বনি এবং অর্থের মর্যাদায় তুলে নেওয়া যায় স্বরে, তার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেখান। অনেকেরই নিশ্চয় মনে পড়বে 'কৃষ্ণকলি' কবিতায় 'একা' শব্দের শূন্যতাময় উচ্চারণ অথবা 'ঝুলন' কবিতায় 'ঝঞ্ঝা' শব্দের ঈষৎ সেই ঝনৎকার। এসব ধরা আছে খুবই সূক্ষ্ম স্বরে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, তাঁর বহু শব্দের অকারণ অকারান্ত ধ্বনিতে অথবা পঙ্‌ক্তিপ্রান্তিক মৃদু টানে কিংবা সমস্তটা মিলিয়ে একটা লাবণ্যময় তরঙ্গসৃষ্টিতে যতখানি মন দেন তার থেকেই ধরতে পারি ওঁর কবিতায় সুরের আকাঙ্ক্ষাটুকু। এজরা পাউণ্ড 'গীতাঞ্জলি'র বাংলা কবিতাই শুনে নিয়েছিলেন কবির মুখে এবং মুগ্ধ হয়েছিলেন তার সুরপ্রবাহে। তিনি যে আচ্ছন্নবোধ করেছিলেন তার একটা কারণ হয়তো এই যে পাউণ্ড নিজেও চেয়েছিলেন তাঁর কবিতাপড়ায় একটা সুরই তৈরি করতে, অন্তত তাঁর নিজের আবৃত্তিতে বারেবারেই ধরা পড়ে এই আবেশসঞ্চারী উচ্চারণের অভ্যাস।

এই সুর বিষয়ে আধুনিকের কী মনোভাব? আধুনিক কবি, যিনি নিশ্চয় তাঁর রচনাকে বাক্‌স্পন্দের দিকে টেনে নিতে চাইবেন আবৃত্তিতেও কি তিনি সাধ্যমতো আনবেন না সেই একই স্পন্দ? আর সেক্ষেত্রে সুর কি বাধা হয়ে দাঁড়ায় না স্পন্দের পক্ষে? মধুসূদন কি সেইজন্যেই, বাংলা কবিতার চিরন্তন সুর ভেঙে দেবার জন্যেই, টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলেন তাঁর পড়া? জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন যে মধুসূদন তাঁর কবিতা পড়তেন ভাঙা ভাঙা গলায় প্রতিটি শব্দে থেমে থেমে। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ তৈরি করতে চেয়েছিল প্রবহমানতা, তার পাঠ কেন হলো এ-রকম বাধাময়?

এ কি স্খলন মাত্র? অনভিপ্রেত একেবারেই? এমন হতেও পারে যে পুরোনো যুগের গীতিময় কবিতার বিরুদ্ধে এ তাঁর এক প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ। অন্তত সাম্প্রতিক সময়ে বিষ্ণু দে'র কবিতা পড়া যে আবেগ বা সুরের বিরুদ্ধে নিশ্চিত প্রতিবাদ, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এদিক থেকে দেখলে হয়তো বোঝা যায় কেন তাঁর কবিতা পড়বার ধরনটা একটা বিশেষ ছাঁদে বাঁধা। ছন্দের মধ্যে রেখেই কবিতায় যে গল্পতান তিনি তৈরি করতে চান, তাঁর অনেকটা অনাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক গলায় সেটা ধরা পড়ে ভালো। বুদ্ধদেব বসুর সুরেলা কবিতা পাঠের সঙ্গে বিষ্ণু দে'র এই ছেড়ে-ছেড়ে-দেওয়া কবিতাপড়ার ধরন তুলনা ক'রে দেখলে মনে হয় যে দুজনেরই কবিতাবোধের সঙ্গে সংগত তাঁদের কবিতাপড়ার গলা।

সুরের প্রয়োগ বিষয়ে আধুনিকেরা যে সকলেই এক রকম ভাবেন না, এখানে বুদ্ধদেব বসুর নাম থেকে সেটা অনুমান করা যায়। অবশ্য বুদ্ধদেবের গলা গড়িয়ে আসে একান্ত লালিত্যে, সুর আর বাচনের কোনো সামঞ্জস্যের কথা যে তিনি ভাবছেন এমন নয়। ভালেরি—যিনি মনে করেছিলেন ছাপা কবিতাও ছাপা গানের মতোই অসম্পূর্ণ, দুটোই প্রতীক্ষা করছে কোনো স্বরলিপির—সেই ভালেরি গানকেই ভেবেছিলেন আবৃত্তির উৎস। গানে শব্দ তার অর্থ হারিয়ে একেবারে স'রে যায় ধ্বনির দিকে, প্রাত্যহিক বাচনে শব্দ তার ধ্বনি হারিয়ে একেবারেই স'রে আসে অর্থের দিকে। আবৃত্তিতে ভালেরি খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন এ-দুইয়ের কোনো মধ্যপথ। জানি না ঠিক সেরকম পথ কতোটা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর নিজের গলায়, কিন্তু এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে আবৃত্তিতে সুরভঙ্গিমার প্রতিই তাঁর পক্ষপাত, তাঁরও নেই কোনো সামঞ্জস্যের দিকে ঝোঁক।

বাক্‌স্পন্দের প্রতি একেবারে অনুগত থেকেও, স্বরে অনেকখানি নৈর্ব্যক্তিকতা রেখেও কীভাবে সংযমিত সুর এবং নাটককে ধরা যায় গলায়, তার সুন্দর উদাহরণ পাই এলিয়টের প্রগাঢ় কবিতাপাঠে। যাঁরা শুনেছেন এলিয়টের 'দি হলো মেন' বা 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর আবৃত্তি, তাঁরা মনে করতে পারবেন, কী ভাবে তিনি অল্প ক'রে দুলিয়ে দেন 'Here we go round the prickly pear' অথবা 'London bridge is falling down', ধরিয়ে দেন এর জন-জীবনগত উৎস; কেমন চকিত নাটকে তিনি উচ্চারণ করেন 'Not with a bang but a whimper'-এর whimper শব্দটি; অথবা কেমনভাবে তাঁর কবিতার অন্তর্গত চরিত্রগুলিতে পৌঁছে দ্রুত পরম্পরায় এদের স্বরস্বাতন্ত্র্য বুঝিয়ে

দেন হালকা নাটুকেপনা না ক'রেও। এলিয়টের এই কবিতা পড়া থেকে আমাদের কিছু শিখবার আছে মনে হয়। কবিতা যেমন বাচনমাত্র নয়, বাচন আর গূঢ়তর সুরের বুননিতেই যেমন কবিতা—তেমনি পড়ার মধ্যেও চাই প্রচ্ছন্ন এক সুর এবং নাটক। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যেন কোথাও এই সুর বা নাটক আলগা হয়ে মাথা না তোলে, শ্রোতাদের যেন এম্‌নি মনে হতে থাকে যে গোটা ব্যাপারটাই প্রতিদিনের কথাবার্তার সন্নিহিত। যেমন কবিতায়, তেমনি কবিতাপড়ায়, এ-দুটিকে মিলিয়ে নেওয়া খুবই শক্ত কথা—কিন্তু এই মিলিয়ে নেওয়াই হলো সত্যিকারের পথ।

কবির চোখে আবৃত্তি

কবিতা সিংহ

আজ উনিশ'শ বিরাশির সাংস্কৃতিক পরিবেশে দাঁড়িয়ে যখন পিছনে ফিরে তাকালাম বাংলা কবিতার প্রবহমান অমৃতবর্ষী ধারাটিকে সমান বহতা দেখতে পেলাম। ধারাটি বাংলা ভাষার জন্ম থেকে কিংবা জানি না তারও আগে থেকে কিনা বাঙালীর জীবন ধারার মধ্যে বহে আসছে। কাল বদলের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত তার রূপ বদলেছে, রকম ফের ঘটেছে কিন্তু মূলে যে কবিতা তার শুদ্ধতা এতটুকুও নষ্ট হয়নি। এতটুকুও বদলায় নি। চর্যাপদের গোধূলি আঁধার থেকে জনম নিয়ে বাংলা কবিতা আজ বহু কবির কাব্যধারায় সুপুষ্ট হয়ে এগিয়ে চলেছে বিশ্বসাগর সংগমের আশ্চর্য মোহানার দিকে। কবিতাকে যেদিন প্রথম চিনলাম সেদিন তো আবৃত্তি দিয়েই চিনেছিলাম। হাতে-খড়ি হবার আগেই তো সেই মনে-খড়ি।

শ্রুতির মাধ্যমে মরমে পশেছিল বলেই তো কবিতা পাঠের শুরু। শৈশবে যাঁদের আবৃত্তি শুনেছি যেমন শিশির ভাদুড়ি, প্রবোধকুমার সান্যাল, রাধামোহন ভট্টাচার্য, তা হৃদয়কে আলোড়িত করে তুলেছিল ত বটেই, তা না হলে সে বয়সে এ্যাডভেঞ্চারের বই ফেলে রেখে টানা লম্বা দুপুরগুলো চয়নিকা বা সঞ্চয়িতা খুলে কাটিয়ে দিতে সাধ যাবে কেন? কাজী সব্যসাচীর কবিতাও শুনেছি। তা মর্ম স্পর্শ করেছিল কিনা সেকথা বলার আগে বলব তা শব্দের উচ্চারণে—প্রক্ষেপে এক অপরূপ কল্পনার জগত বানিয়ে তুলতে সক্ষম ছিল। আমি রবীন্দ্রনাথ বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নাম করলাম না এই সঙ্গে, কিংবা বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী বা বুদ্ধদেব বসুর। অচিন্ত্যকুমারের কথাও বললাম না। এঁদের আবৃত্তি এঁদের কবিতার মতই অনন্ত স্বতন্ত্র এবং অনহুকরণীয়।

সৌভাগ্যবশত এঁদের প্রত্যেকেরই কবিতা পাঠ রেকর্ডবদ্ধ আছে। উৎসাহী আবৃত্তিকারদের এগুলি সংগ্রহে রাখা উচিত।

আবৃত্তির অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল চার-এর দশকে। তিন-এর

দশকেও কিছু কিছু ছিল। সেনেট হলে প্রথম কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর কবিকণ্ঠে কবিতা-পাঠ জনপ্রিয়তা লাভ করতে করতে ভুলে গিয়ে ওঠে। গ্রামে-গঞ্জেও কবিদের আমন্ত্রণ হতে থাকে। কিন্তু একথা সত্য যে কবিকণ্ঠে কবিতা শোনার শ্রোতার সংখ্যা সর্বদাই সীমিত।

শিল্প হিসেবে আবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হবার আগে আবৃত্তিকে গ্রহণ করেছিলেন মাত্রই জনকতক, আন্তরিক আবৃত্তিকার। উনিশ'শ সত্তর খ্রীস্টাব্দে আকাশবাণী সম্পূর্ণ আলাদা চ্যানেলে যুববাণীর অনুষ্ঠান শুরু করে দিলেন, এবং আবৃত্তির নিয়মিত অডিশন শুরু হয়ে গেল ও প্রতিদিন দশ মিনিটের আবৃত্তি অনুষ্ঠানে সেইসব তরুণ আবৃত্তিকাররা অংশ নিতে লাগলেন। পরে যুববাণীর মেয়াদ শেষ হবার পর এইসব আবৃত্তিকার নতুন নতুন আবৃত্তি সংস্থা গড়ে তুলতে লাগলেন। আবৃত্তি নিয়ে সাধনা শুরু হ'ল। শুরু হ'ল নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

আবৃত্তি বহু মানুষের বহু আন্তরিক সাধনায় আজ স্বতন্ত্র একটি আর্ট ফর্ম রূপে চিহ্নিত হয়ে উঠতে লাগল। আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়, আবৃত্তি-শিল্প জনপ্রিয়তার সীমানা প্রবলভাবে স্পর্শ করেছে।

কয়েকটি প্রশ্ন ও সংশয়ের উদয় ইতিমধ্যে ঘটেছে। ছন্দনীড় নামক একটি আবৃত্তি সংস্থা পরীক্ষামূলক অনুষ্ঠানের দ্বারা পাশাপাশি কবি ও আবৃত্তিকারকে বসিয়ে একই কবিতা দুজনকে পাঠ করে দিতে বলেন। যে কবি ভালো আবৃত্তিকারও তাঁর কবিতা অবশ্যই আবৃত্তিকারের চেয়ে ভালো হয়েছে। কিন্তু যে কবি নিজের মত করে কবিতা পড়েন তাঁর কবিতাও খারাপ শোনায়নি। অনুষ্ঠানের পর পত্র-পত্রিকার সমালোচনায় কবিদেরই জয়গান গাওয়া হয়।

কিন্তু তাবলে কি আবৃত্তিকারের কোনো ভূমিকা নেই? কবির কণ্ঠে কবিতা শোনাই কী কবিতা শোনার একমাত্র উপায়? কবিতা পড়ে নিলেই হ'ল। তারপর কি আর কিছু নেই?

না। এভাবে আবৃত্তিকারদের নস্যাৎ করে কবি-সম্মেলনের জয়গান গাওয়া অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব নয় এই জন্যই যে আমি খুব কাছ থেকে আবৃত্তিকারদের গভীর সাধনা ও চর্চা দেখেছি। এক সময়ে মঞ্চে আমার প্রবেশ হয়েছিল আবৃত্তিকার হিসেবেই। পরে স্বরচিত কবিতা আমাকে অন্য ভূমিকায় উত্তীর্ণ করেছিল। একদিন বাংলা কবিতাকে জনপ্রিয় করার ভূমিকা পালন করেছিল বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পত্রিকার মত বিদগ্ধ পত্রিকা। আজ খুঁজে পেতে, পড়ে জেনে, আবৃত্তিকাররা পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে কবিদের জন্য তৈরি করে দিচ্ছেন ভক্ত শ্রোতা। নতুন নতুন শ্রোতার কানে পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথ থেকে

আশির দশকের তরুণতম কবিদের কবিতাবলি।

কবির কবিতা পড়লেই তো হয়, শোনার প্রয়োজন কী? প্রয়োজন এই যে কেবল জনপ্রিয় কবিদেরই আমরা জানি। আমরা তাঁদের বই পড়ি। কিন্তু, খুঁজে পেতে এই যে নিত্যনতুন কবিদের কবিতা এনে দেন আমাদের সামনে আবৃত্তিকার, তাতে ভালো লেগে গেলে আমরা কি সেই অজ্ঞাত কবির বই খুঁজে খুঁজে পড়ি না?

আসলে কবি-সম্মেলন ও আবৃত্তিকার সম্মেলনের মধ্যে একটা তৈরি করা বিভেদ চাপিয়ে দিচ্ছেন তাঁরা যাঁদের মনের দরজা জানালাগুলি কুলুপ আঁটা। কবি সম্মেলনও থাক, আবৃত্তির অনুষ্ঠানও থাক। বহু মন্দ কবিকে যদি এতদিন আমরা সহ্য করতে পারি, মন্দ আবৃত্তিকারীদেরও সহ্য করতে পারব।

আবৃত্তি আজ নতুন শিল্প হিসেবে গড়ে উঠছে। ক্রমশ আবৃত্তির বিকাশ হবে, হবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সমবেত আবৃত্তি। হবে আবৃত্তি দিয়ে নানা স্বর-ক্ষেপণের নতুন শিল্প। একদিন তৈরি হয়ে উঠবে আবৃত্তির ধারাবাহিক বিকাশের ইতিহাস, আবৃত্তিকারের সৃজিত বিভিন্ন ধারা বা স্কুল। তৈরি হবে লাইব্রেরি, আরকাইভস্, শিক্ষা নিকেতন। আবৃত্তির সম্ভাবনা আছে। বিশাল সম্ভাবনা। আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আবৃত্তিকার তো কবিতাকেই তাঁর ভালোবাসা জানান। কবিতা দিয়ে মানুষের হৃদয় ছুঁইয়ে দিতে চান, তবে—ওই-ইত সেই মিলন বিন্দু যেখানে—ভিন্ন ভূমিতে দাঁড়িয়েও দুজনেই একজনকে চান—যাঁর নাম কবিতা। যাঁর নাম পরমেশ্বরী।

বাংলা কবিতা বাঙালী জীবনের সকল দুঃখ বঞ্চনার মধ্যেও এক অমৃতধারা।

আবৃত্তি বনাম কবিতা

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আবৃত্তির যুগ এসেছে। কতকটা হুজুগও বটে। সম্ভবত সেই কারণেই আবৃত্তি সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা প্রশ্ন-উত্তর আজকাল অনেক বেড়ে গেছে। আমাকেও এমন সব আলোচনার বাপের মধ্যে অনেক সময়েই পড়ে যেতে হয়। আবৃত্তি কেন করি, ভালো আবৃত্তি কাকে বলব, ভালো আবৃত্তি করার জন্যে কি কি গুণের অধিকারী হতে হয়, আবৃত্তি করার সময় আবৃত্তিকার হাতপা নাড়বেন কি না, আবৃত্তির জন্য কবিতা বাছার পদ্ধতি আছে কি না, আবৃত্তি ও পাঠের তফাৎ কি? আবৃত্তি-প্রেমিকদের এইরকম নানা ধরনের প্রশ্নের আঘাতে আমিও প্রায়ই বিদ্ধ হই। অনেক সময়েই ভাবি আবৃত্তির কোন শাস্ত্র নেই কেন? উৎসাহীরা তো তাহলে সেখান থেকেই এসবের উত্তরগুলো খুঁজতে শুরু করতে পারেন। কিন্তু যে দেশে আবৃত্তিকে সর্ব শাস্ত্রের ওপর এমন কী, বোধেরও ওপর বলে বর্ণনা করা হয়েছে সে দেশেও তো এটাকে শাস্ত্র হিসেবে মেনে, কোন ভরত এর তেমন কোন নিয়মতত্ত্ব বিজ্ঞানের চর্চা করে যাননি। বিদেশেও নাটক কবিতা এমনকি গদ্যপাঠের আসরের দৃষ্টান্ত জানি, কিন্তু রেসিটেশন্-কে আলাদা করে কোনো শিল্প হিসেবে দেখে তার গঠন-প্রকরণ নন্দনতত্ত্ব নিয়ে তেমন কোন চর্চা হয়েছে বলে শুনিনি। এলোকিউশন ডিক্শন্ প্রভৃতির শিক্ষা অন্যান্য বিদ্যার অঙ্গীভূত হয়েই চর্চিত হয়েছে সেখানে। তবু এ দেশের কথকতা, পাঁচালীপড়া এমনকি যাত্রা-থিয়েটারের অমিত্রাক্ষরীয় ঐতিহ্য ছোটবেলা থেকেই তো কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে চলেছে। আবৃত্তি ব্যাপারটাও নাট্য ও কাব্যামোদীদের ভেতরে ধারাবাহিক ভাবে চলেই আসছে অনেকদিন। এবং আজকাল জলসায় বা বিচিত্রানুষ্ঠানে (থুড়ি, আজকাল তো আবার ওগুলি অমুক সন্ধ্যা বা তমুক প্রভাত নামে বিজ্ঞাপিত) যখন সুর করে কবিতা পড়া হচ্ছে শুনি—আবৃত্তির জন্যে স্বতন্ত্র আসর হচ্ছে দেখি—তখন কবিতার

জনপ্রিয়তা বাড়ছে জেনে তৃপ্তি পেতে চেষ্টা করি, এবং জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য থেকেই ধরে নিই যে নজির থাক বা না থাক, এখন থেকে শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীদের প্যানথিয়নে আবৃত্তিকেও তরুণতম সংযোজন হিসেবে মেনে নিতে হবে।

তবু অবিশ্বাসী মন প্রশ্ন করতে থাকে আবৃত্তি কি সত্যিই এতখানি স্বয়ম্ভূ শিল্প, না কি কবিতার নাটকের সাহিত্যের বাহন হয়েই সে তার কলাপ বিস্তার করে থাকে? এসব প্রশ্নের মীমাংসা সহজে হবার নয়। তর্ক-বিতর্কের মধ্যে না ঢুকে বরং যে সব প্রশ্ন প্রায়ই শুনতে হয় সেগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করতে পারি। তবে এই উত্তরগুলো নেহাতই আমার ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা-প্রসূত। এবং এ লেখাও আবৃত্তির রীতি-পদ্ধতি নিয়ে কোন সাধারণীকরণ নয়।

আবৃত্তি কেন করি? এ প্রশ্নটায় খটকা আছে! শৈশবে হয়ত এক কারণে করা শুরু করেছিলাম—এখন হয়ত আরও কয়েকটা কারণ তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সত্যি কেন যে আবৃত্তি করি সঠিক তো নিজেই জানি না। শুধু মনে পড়ে ছোটবেলায় আমার গুরুজনরা আবৃত্তি ভালবাসতেন। বাবার মুখে আবৃত্তি শুনেই সম্ভবত আমারও আবৃত্তি-ভালোবাসার শুরু। আবৃত্তি শেখার সূত্রপাতও সেইখানেই। স্কুলের কোন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করলে বা ক্লাসে ভালো রিডিং পড়লে যে প্রশংসা বাক্য জুটত তার প্রতি আমার লোভ ছিল। ওই প্রশংসার লোভেই অভিনয়ের ব্যাপারেও ছোটবেলা থেকেই নেশা ধরেছিল। আমার কাছে দুটো জিনিসই একই প্রবণতার স্রোতবাহে মিশেছিল।

সে সময়ে গ্রামোফোন রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি, শিশিরকুমারের দু-একটা রেকর্ড, নির্মলেন্দু লাহিড়ির 'দেবতার গ্রাস' ছাড়া নামকরা আবৃত্তিকারের আবৃত্তি বড় একটা শুনিনি। স্কুলের শেষের দিকে, কলেজের গোড়ার দিকে কবিতা লিখতে এবং কোলকাতায় থিয়েটার দেখতে শুরু করি। তখনই শিশিরবাবুর আবৃত্তি ভালো করে শোনার সুযোগ হয়। আগে রেকর্ডে ওঁর গলা বা আবৃত্তি তেমন কিছু ভালো লাগেনি। সেটার কারণ পরে বুঝতে পেরেছি। তখন রেকর্ডিং তত ভালো হত না—ওঁর গলার ব্যাপ্তিকে ধরবার মতন হত না আর কী! আর উনি নিজেও মাইক্রোফোন ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখতেন না, বুঝতেনও না। ফলে জিনিসটা আর ভালো হয় কি করে?

কিন্তু মঞ্চের ওপর মঞ্চের উপযোগী মাপে যখন উনি রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল, বৈষ্ণব কাব্য, সংস্কৃত কাব্য কী শেক্সপীয়র আবৃত্তি করতেন, তখন শ্রোতার কাছে সেটা অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়াত। শিশিরকুমারের আবৃত্তিতে তাঁর অসামান্য কণ্ঠ

ও সুন্দর উচ্চারণ তো কাজ করতই, তার ওপর যে ব্যাপারটা শ্রোতাকে উদ্বেল করত সেটা হল তাঁর আবৃত্তির মধ্যে এক ধরনের নাটকীয়তা। রোমান্টিসিজমকে যে অর্থে বিস্ময়বোধের নবজাগরণ বলা হয়েছে খানিকটা সেই রকম বিস্ময়বোধ তাঁর আবৃত্তিকে ক্ষণে ক্ষণে অভাবনীয়ের অপ্রত্যাশিতের চমকে উজ্জ্বল করে তুলত। তাঁর প্রখর মননশীলতা ও সুগভীর সাহিত্যবোধ আবৃত্তির সময় কবিতাটির যেন নতুন সব অর্থ, অভিনব কিছু কিছু ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করতে থাকত। এর মধ্যে নাটকীয়তার যে উত্তাল ছিল তা কিন্তু কখনই খেলো সস্তা নাটুকেপনার চাতুরি নয়।

শিশিরকুমারের মুখে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতর কবিদের কবিতা শুনিনি। কেন জানি না! আধুনিক কবিতার পার্সোনাল বাক্‌ভঙ্গি বা মেজাজ বিনা মাইক্রোফোনে বৃহৎ দর্শক-শ্রোতার সমাবেশে ভালো খোলে না বলে? অথবা ওঁর চিত্তভূমি গঠিত হয়েছিল রবীন্দ্রকাব্যে, আধুনিকদের উনি ভালো বুঝতেন না বলে? বোধ হয় এই দুটোই সত্যি। আমি আধুনিক কবিতা ভালোবাসি। কিন্তু আধুনিক কবিতা খুব বিশাল দর্শকের সামনে বলে তৃপ্তি পাই না। ঘরোয়া ছোটখাটো অন্তরঙ্গ পরিবেশে কবিতার ঘনিষ্ঠ প্রেমিকদের সামনে আধুনিক কবিতা বলতে অনেক বেশি ভালো লাগে। এই বলাও ঠিক পুরোদস্তুর আবৃত্তির ঢং-এ গলার দাপটে, আরোহণ-অবরোহণের কুশলতা দেখিয়ে বলতে থাকলে যেন ভালো লাগে না। বরং ভঙ্গিটা হবে নিরাসক্ত পাঠ করার, মেজাজটা হবে অন্তরঙ্গ শ্রোতার কাছে ব্যক্তিগত প্রতিবেদনের, অথবা দুই রসিকে মিলে যেন কবিতাটির নির্জন আস্বাদন করা চলেছে—এমন ভাবে পড়লে তবেই যেন আধুনিক পাঠ জমে ওঠে। গরিষ্ঠ দর্শকের সামনে বর্ণনায় আখ্যানে নাটকীয়তায় তীব্র, আবেগের ও ধ্বনির উত্থানপতনে ঝংকৃত কবিতাই বেশি আকর্ষণীয় হয়।

তাছাড়া এটাতো খুব মর্মান্তিক সত্য যে, আমাদের দেশের বেশির ভাগ শ্রোতা বা দর্শক বা পাঠক এখনও আধুনিক কবিতার ব্যক্তিগত মেজাজ অনুষঙ্গ বা প্রকাশরীতির থেকে অনেক দূরে। রবীন্দ্রনাথের অনেকটা বা নজরুল বা সুকান্ত বুঝতে তাঁদের অতটা অসুবিধে হয়ত নেই, কিন্তু এমন কি মাইকেলও তাঁদের কাছে অপরিচিত বললেই হয়। সেখানে জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁদের কাব্যভাবনার দিগ্‌বলয়ের বাইরে—শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অতি ব্যক্তিগত আধুনিকতা তো নেহাৎই দুর্বোধ্য খামখেয়ালিপনা।

তাই কোথায় কোন ধরনের কবিতা আবৃত্তি করব, কিংবা বলা ভালো কোন্ কবিতার আবৃত্তি করব, কোনটা বা পাঠের যোগ্য, এটা বাছাইয়ের কোন নির্দিষ্ট

পদ্ধতি না থাকলেও মনের মধ্যে মোটামুটি একটা বিচারবোধ কাজ করতে থাকে যে বিচারবোধটা শ্রোতৃকুলের পরিবেশ, আয়তন, চরিত্র এসব মনে রেখেই তৈরি হয়।

আর কবিতা মুখস্থ বলা হবে না বই দেখে বলা হবে এ ব্যাপারটা এক্ষেত্রে গৌণ বলেই মনে হয়। পাঠ আর আবৃত্তি বোধহয় আসলে কবিতা পড়ার রীতির তফাৎ। তবে যখন স্মৃতির থেকে কবিতা বলি একটা ব্যক্তিগত সুবিধে আমি নিজে বোধ করি—তখন কবিতার অর্থের কাছে মন যেন আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছয়। ছাপার হরফের সাঁকোটুকু পেরিয়ে অর্থের কাছে যেতে মনের যেন একটু বেশি সময় লেগে যায়। ঠিক ঠিক পড়ার দায়িত্বভার একটু যেন মনোযোগ কেড়ে নেয়।

আধুনিক কবিতার পাঠ এবং আধুনিক মেজাজের কবিতা পাঠ ছাত্রাবস্থায় যাঁর মুখে শুনে চমকিত হয়েছিলাম তিনি কিন্তু অভিনেতা নন—কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। কিছু স্বরচিত, কিছু অন্যান্য রবীন্দ্র-উত্তর কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের অনেক ধরনের কবিতা তাঁর কণ্ঠে শুনে বুঝেছিলাম যে কবিতা বলা কতখানি কাব্যবোধের ওপর নির্ভর করে। তাঁর বলায় আবেগ ছিল, কিন্তু তা বল্গাহীন নয়, কবিতার মধ্যে তা থাকত তন্ময় হয়ে।

তাই আবৃত্তির অনুসন্ধিৎসু ছাত্র যখন জানতে চান ভালো আবৃত্তির জন্যে কি কি গুণের দরকার তখন কেবলই মনে হয় যে গুণটার দরকার সব থেকে বেশি সেটাতো শেখানো যায় না। সেটা কাব্যবোধ—কবিতাকে ভালোবেসে যার উন্মেষ। কবিতা বলার সময় আমার হাত দুটিকে কখনও ব্যবহার করব কি করব না এ ধরনের প্রশ্ন আমার কাছে নিছক বাইরের। কবিতার মৌল আবেগ যদি আমাকে তেমন করে ছুঁয়ে যায় তাহলে তার তরঙ্গ আমার মুখে হাতে কিছু অভিব্যক্তির সঞ্চার করতে পারে, আবার নাও পারে। তাই কবিতা বলার সময় কেউ হাত নেড়েছেন এই অপরাধেই তাঁকে আমি আবৃত্তিকার হিসাবে বাতিল করতে রাজী নই। বরং বাতিল করতে চাই সেই সব নার্সিসাসদের, যাঁরা কবিতার অর্থের থেকে বহুদূরে থেকে গিয়ে আপন আপন কণ্ঠের মাধুর্যে আত্মহারা হয়ে শুধু কণ্ঠব্যাদান করে চলেন। কবিতার ছন্দ ভাষা মেজাজ বা আবেগের তারতম্য তাঁদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না। তাঁদের একমাত্র উপাস্য হল 'কণ্ঠ'। আমি এমন সব আবৃত্তিওয়ালাদের কবিতা বলা শুনেছি যাঁরা কবিতার রাজনৈতিক অনুষঙ্গের সুযোগ নিয়ে বাস্তবিক স্লোগানের আমদানি করেন আবৃত্তির মধ্যে। এমন ভাবে কবিতাটি বলতে থাকেন যেন পুরো কবিতাটিই একটানা স্লোগান

দেওয়া হচ্ছে "চলছে চলবে" জাতীয় ছড়ার ছন্দে। কেউ আবার ট্রেনের ওপর লেখা কিংবা ট্রেনে ভ্রমণকারীর দৃষ্টি থেকে লেখা কবিতায় শিশুসুলভ "ঝু—ঝিক্ ঝিক্" জাতীয় রিফ্রেন শর্বত্র ক্রমাগত গলায় বাজিয়ে যেতে থাকেন। এসব উদ্ভাবনও কী কবিতার ভেতরকার বর্ণনা বা আখ্যানের দাবিতে আসছে? না কি আবৃত্তিকারের কাব্যবোধের অভাব ঢাকতে এই আপাত মনোরঞ্জক ছেলেমানুষির আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে?

মানুষের গলার আওয়াজ, বিশেষত সুকণ্ঠের আওয়াজ বড় সুন্দর। তবু আবৃত্তি করার জন্যে আমি কণ্ঠের থেকে বেশি নির্ভর করতে চাই যে কবিতাটি বলব তার ওপরে। সেই কবিতাটি কি বলতে চাইছে, কাব্যভাষার কী বিশেষ মেজাজ, সেটা বলতে চাইছে আমি আবৃত্তির সময় সেই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাই। কাব্যভাষার সেই বিশেষ মেজাজ কী ছন্দ, কী অনুভবকে শ্রোতার কাছে বোধগম্য করে তুলতে হলে কণ্ঠস্বরকে যে তার যোগ্য হতে হয়, নানান সূক্ষ্ম ও বিচিত্র ভাবপ্রকাশে সক্ষম হতে হয় এ আমি জানি। গলার ওপর দখল, গলার কাজ এইখানে নিশ্চয়ই কাজে আসে। কিন্তু কবিতার জন্যে কণ্ঠ, কণ্ঠের জন্যে কবিতা নয় এই কথাটা মনে রাখতেই হবে। গলার কাজ দেখানোর উপায় হিসেবে কবিতাটিকে ব্যবহার করলে সেই যান্ত্রিকতা যে কবিতাটিকে নষ্ট করবেই, এই বোধ আমি আবৃত্তির সময় সচেতন রাখতে চাই।

আর একটা বিষয়ে আমি সচেতন থাকতে চাই যে, আমার আবৃত্তি যেন কোন মুদ্রাদোষের ছাঁচে ঢালা মার্কামারা "স্টাইলে"র শিকার না হয়। স্টাইলবিহীন আবৃত্তি আমি পছন্দ করি, কেননা কবিতার স্টাইলের কোন শেষ নেই। আমার আবৃত্তি তাই যত স্টাইলবর্জিত থাকবে ততই তা বিচিত্র ধরনের কবিতাকে ধারণ করার যোগ্য থাকবে। স্টাইলের ছাঁচের মধ্যে আবৃত্তিকারের যে মানসিক একপেশেমি লক্ষ করা যায় সেটা আসলে তাঁর অহংকারেরই একটা বিজ্ঞাপন। কিন্তু আমি আবৃত্তিকারের অহংকারের থেকে কবির অভিপ্রেত জীবনাবেগকে বেশি মূল্য দিতে চাই। কবিতাকে ভালোবেসে আবৃত্তিকার কবির রথের সারথ্যের দায়িত্ব নিয়ে কবিতাকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবে, আবৃত্তির কাছে এইটেই আমার প্রাথমিক প্রত্যাশা।

কবিতা পড়া কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি

অমিতাভ দাশগুপ্ত

একদিকে কবিতা লেখা, অন্যদিকে কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি। এই দুয়ের মাঝখানে একটা জিনিস আছে, যাকে বলা যায় দুয়ের সেতু। সেটা হল কবিতা পড়া, মানে, নিজে নিজে পড়া।

কথাটা কিভাবে মাথায় এল?

বেশ কয়েকবছর আগে। একটি পত্রিকার সম্পাদক অনুরোধ করলেন—একজন কবির একটি কবিতার ক্রিয়েটিভ প্রসেস বা সৃজনী-প্রক্রিয়া-সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগতভাবে যা মনে হয় লিখুন। তাঁর এই আবেদন আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জের মত দাঁড়িয়ে গেল। কবিতাটি তো তিনি লিখেছেন, আমি নই। কোন্ বাসনা, সংস্কার, অভিজ্ঞতা লেখাটির পেছনে কাজ করেছিল, তা আমার সরাসরি জানা নেই। তা ছাড়া আরও একটা বড় কথা আছে। সেটা কি?

লেখাটি তৈরি করতে গিয়ে সেই আমি প্রথম অনুভব করলাম, কবিতা পড়ার ব্যাপারে আমাদের কতখানি ভুল আর গণ্ডগোল থেকে যায়। সাধারণভাবে যে কবিতাই আমরা পড়ি অর্ধমনস্ক হয়ে পড়ি। ফলে কবিতাটির প্রতিমার একটা আবছা আদল আমরা পাই বটে, কিন্তু পুরোপুরি তার চেহারা আমাদের কাছে ধরা পড়ে না।

কিন্তু সেই কবিতা নিয়ে কিছু লেখার সময় বারবার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি, প্রতিটি শব্দ একান্ত সাবধানে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে পড়তে হয়, থামতে হয়, ভাবতে হয়। প্রাথমিকভাবে গড়ে ওঠা সিদ্ধান্তগুলি বহু সময়ই নাকচ করতে হয়। এবং সবার ওপর এসে যায় সেই পুরনো অথচ অতি অনিবার্য—বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনার প্রশ্ন। কবি যা শব্দে লেখেন নি, অথচ যে অনুভবের চাপা দ্যুতি কবিতাটিকে নিছক শব্দের কারাগার ভেঙে, একমাত্রিকতার দেয়াল উড়িয়ে দিয়ে একটা বড় জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছে, তাকে ছোঁয়ার প্রাণপণ চেষ্টায় আমার আঙুল

তখন নিশপিশ করতে থাকে। এতো প্রায় অসীমতাকে ছুঁতে চেষ্টা করা।

আর একটা ব্যাপারও হয়। খুবই হয়। কবি তাঁর লেখায় যে কথাটা বলতে চান, পাঠক হয়তো তার চেয়ে ভিন্ন আর এক অর্থ সেখানে পেয়ে যান। এতে কি ভুল বোঝাবুঝি হয়? আমার তো তা মনে হয় না। বরং এর ফলে কবিতাটির গৌরব আরও বেড়ে যায়। কারণ ভালো কবিতা মাত্রেই বহুমুখী। তার প্রকাশের নানা দরজা জানালা আছে। এক এক জনের কাছে এক এক দিক থেকে আলো এসে পড়ে। একটিই কবিতা—কিন্তু তাতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের মনের আলাদা আলাদা মাত্রা যুক্ত হয়। একটি কবিতা তখন সিম্ফনি হয়ে ওঠে।

তাছাড়া আর একটা জিনিস জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। তা হল, পাঠকের ব্যক্তিগত রুচি, জীবনযাপনের পদ্ধতি ও মানসিকতা। শুধু কবিতা নয়, যে-কোনো শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে ভালোলাগা মন্দলাগার প্রশ্নটি এর সঙ্গে হাড়ে-মাংসে জড়িয়ে আছে। ঠিক এই কারণেই জীবনানন্দ দাশ বা বিষ্ণু দে একই সঙ্গে একজন পাঠকের প্রিয়তম কবি হতে পারেন না। আর, কবিতারও সব জিনিসটা বোঝবার নয়, বাজবার। কার কোথায় বাজল না, কেন বাজল বা বাজল না, এ নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে বটে, কিন্তু তাতে আসল ব্যাপারের কোনো ফয়সলা হয় না।

এই কারণেই, সবিনয়ে, প্রকাশ্য আসরে একজন কবিতা পাঠকারী বা আবৃত্তি-কারের কাছে আমি একটি প্রস্তাব রাখছি। তিনি যখন কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি করবেন, তখন এমন কবিতাই বেছে নেবেন, যা তাঁর চোখ থেকে ধ্যানের ভেতরে গিয়ে পৌঁচেছে। সদ্য পরিণীতা, ভয়ে কাঠ রমণীকে যেমন একান্ত মমতা নিয়ে কোমল স্পর্শে ধীরে ধীরে জাগাতে হয়, তেমনি করে শ্রোতাদের সামনে ছাপা কবিতাটির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাকে রক্তমাংসের আদল দিতে হবে। আবৃত্তিকার সেই পুরোহিত, যিনি কবি আর শ্রোতার অন্তরের শুভ পরিণয় ঘনিয়ে তুলবেন। কণ্ঠস্বরের যাদু বিস্তার স্বরগ্রামের ওঠানামা বাচনভঙ্গি—এসব তো তার পরের ব্যাপার। একটি কবিতা পড়ে নিজে সম্পূর্ণ দীপিত না হলে অন্যকে কি জাগানো যায়?

আবার আর একটা ব্যাপারও খুব হয়। বয়স ও অভিজ্ঞতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের প্রাথমিক বোধও পেকে উঠতে থাকে। এমনকি অনেক সময় সম্পূর্ণ পালটেও যায়। একটি নিবিড় তাৎপর্যবান কবিতার গঠন রহস্য ও ভেতরের সম্পদটির উন্মোচনে কত সময় লেগে যায়। তাতেও কি

সবটা ধরা পড়ে? পড়ে না। এই নিয়তিটুকু মেনে নিয়েই একজন কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি করেন। তবু এই পাঠভেদ, অর্থভেদের হাওয়া যাতে সহজ সাবলীলভাবে কলমে বা গলায় উঠে আসে, তার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতেই হয়।

একজন খুবই ছোট মাপের কবি, স্পর্ধা করে এতগুলো কথা বললাম—তবু আপনারা একটু দয়া করে আমার কথাগুলো ভেবে দেখবেন।

বাংলা আবৃত্তির উচ্চারণ

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইদানীং সংস্কৃতির আসরে আবৃত্তির কদর বেড়েছে। আগেকার কালে আবৃত্তির এত চল ছিলনা। সেকালে সাধারণত রবীন্দ্র জন্মোৎসবে কিংবা বাইশে শ্রাবণে কিংবা নজরুল-সুকান্তর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আবৃত্তিকারদের ডাক পড়ত। কিন্তু আজকাল আবৃত্তি যেকোনো জলসা বা বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, আজকের দিনে শিল্প হিসেবে আবৃত্তি জনপ্রিয় হয়েছে।

এই জনপ্রিয়তাকেই আমার ভয়। কারণ, জনপ্রিয়তাই শেষ পর্যন্ত শিল্পের কাল হয়ে দাঁড়ায়, তলে তলে সর্বনাশ ডেকে আনে। জনপ্রিয়তার আকর্ষণে যাঁরা এসে ভিড় জমান, তাঁদের অধিকাংশই শিল্পপ্রীতির বশবর্তী হয়ে আসেন না, আসেন সহজে নাম কেনার লোভে, সেই সঙ্গে অর্থপ্রাপ্তির প্রলোভনও থাকে। এইভাবে, মননে স্বভাবে বা ব্যুৎপত্তিতে শিল্পী নন এরকম লোকেদের হাতে প'ড়ে কোনো শিল্প যখন স্থূল মানসিকতা ও ব্যবসায়িক স্বার্থের শিকার হয় তখন অভিনবত্বের মুখোশ ধারণ ক'রে রুচিহীন বিকৃতি তাকে ধীরে ধীরে রসাতলে নিয়ে যায়,—আজকের আধুনিক বাংলা গানের যে দশা হয়েছে। চিন্তাশীল রুচিমান বুদ্ধিজীবী মানুষকে আধুনিক গান আর তেমন করে টানে না। কবি-প্রতিভা থেকে বঞ্চিত কয়েকজন গীতিকার এবং সৃজনীশক্তিতে বন্ধ্যা ও ভারতীয় সাংগীতিক ঐতিহ্যে অনীহ কয়েকজন সুরকার মিলে আধুনিক বাংলা গানকে সৃষ্টিধর্মী মেধার জগৎ থেকে মননের জগৎ থেকে নির্বাসন দিয়েছে।

আবৃত্তির ক্ষেত্রেও আসন্ন সর্বনাশের লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গান-বাজনার শিল্পী হওয়ার চেয়ে আবৃত্তির শিল্পী হওয়া অনেকের কাছে সহজসাধ্য মনে হয়েছে। গায়ক-বাদক হতে হলে তাল ও সুরজ্ঞান আয়ত্ত করতে হয়, যা যথেষ্ট সময় ও অনুশীলন সাপেক্ষ। কিন্তু

মোটামুটি ভালো কণ্ঠ থাকলেই অনায়াসে আবৃত্তিকার হওয়া যায়, এরকম একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে আজকাল অনেকেই রবীন্দ্রনাথ নজরুল এবং সুকান্তের খান দশ বারো কবিতা যা হোক করে মুখস্থ ক'রে নিয়ে আবৃত্তিকার হিসেবে আসরে নেমে পড়ছেন। আমার ভয় হচ্ছে, এই ভাবেই যদি চলতে থাকে, তাহলে হয়তো আধুনিক গানের মতো আবৃত্তিও ক্রমশ তার বৈদগ্ধ্যের সম্ভ্রম খোয়াবে, সত্যিকারের সুস্থ অর্থবহ আবৃত্তির স্থান দখল করবে হাতুড়ে আবৃত্তিকারদের কাব্যবোধবর্জিত অনর্থক চিৎকার ও অঙ্গভঙ্গি।

শব্দগ্রাহীর আধিপত্য, এটাই আবৃত্তি শিল্পের মূল সমস্যা। অন্য বড়ো কিছু সমস্যা, সে সবই এই শব্দগ্রাহিতার উপজাত। কিন্তু উচ্চারণের সমস্যা সমগ্র বাক্‌শিল্পের সমস্যা। এ সমস্যা শুধুমাত্র আবৃত্তিকারই নয়, অভিনেতা, বেতার ঘোষক, সংবাদ পাঠক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর বাক্‌শিল্পীকেই কমবেশি পীড়িত করে। তাই এর ব্যাপ্তি ও গুরুত্বের কথা বিবেচনা ক'রে সাধারণভাবে বাংলা উচ্চারণ সমস্যা নিয়েই সবিস্তার আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

ইংরেজী কোনো শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে সংশয়ের উদ্রেক হলে সচরাচর আমরা তৎক্ষণাৎ অভিধানের শরণাপন্ন হই। কারণ, আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানি যে, অভিধানে নির্ভুল উচ্চারণ সূত্র পেয়ে যাব। এমন কি, কোনো শব্দের এক বা একাধিক বিকল্প উচ্চারণ প্রচলিত আছে কিনা অভিধানে তারও হদিস মিলবে।

বাংলা ভাষায় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিধান তিনটি। একটি হল শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', দ্বিতীয়টি, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' এবং তৃতীয়টি, শ্রীরাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা'। বিশ্ববিশ্রুত ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষের ভূমিকায় এই তিনটি অভিধান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন:

'শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিধান, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের অভিধান এবং শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' বাংলাভাষার যথাক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃহৎ, মধ্যম ও লঘু অভিধান বলিয়া পরিগণিত হইবে।'

ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের বিচারে যেটি 'বাঙ্গালা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ বৃহৎ' অভিধান, সেই 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' উচ্চারণ নির্দেশের কোনো ব্যবস্থা নেই। সর্বশ্রেষ্ঠ লঘু অভিধান 'চলন্তিকা'তেও কোনো উচ্চারণ নির্দেশিকা নেই। একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ মধ্যম অভিধান বাঙ্গালা ভাষার অভিধানেই 'উচ্চারণ-ভূমিকা' সন্নিবিষ্ট আছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীদাস তাঁর অভিধানের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন, '...বাঙ্গালা এখন উত্তরোত্তর বঙ্গের বাহিরেও বিস্তার লাভ করিতেছে এবং ইহার

প্রতি সমগ্র সভ্য-জগতের দৃষ্টি পড়িতেছে। এই সকল কারণে "বাঙ্গলা ভাষার অভিধানে" শব্দোচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি এবং রাজধানী কলিকাতার উচ্চারণকেই আদর্শ মনে করি। শব্দের অব্যবহিত পরেই ভঙ্গচক ( ) এইরূপ বন্ধনীর মধ্যে উচ্চারণ প্রদত্ত হইয়াছে। যেরূপ বর্ণযোজনা করিলে মূল উচ্চারণের নিকটতম অনুকরণ হইতে পারে, সেইভাবে বর্ণ বিন্যাসের চেষ্টা করা হইয়াছে।'

'বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে'র প্রথম সংস্করণ ছেপে বেরিয়েছিল উনিশ শো সতেরো সালে। কুড়ি বছর পরে উনিশ শো সাঁয়ত্রিশ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর আরও প্রায় তিন দশক কেটে গেছে।* কোনো সজীব ভাষাই দীর্ঘকাল স্থির থাকে না, অনেক নতুন নতুন শব্দ তাতে সংযোজিত হয়, আবার অব্যবহার্য হয়ে পড়ায় পুরনো অনেক শব্দ বাতিল হয়ে যায়। বাংলা ভাষার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইতিমধ্যে, বাংলাতেও স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক বিদেশী শব্দ ঠাঁই করে নিয়েছে, এককালে প্রচলিত অনেক সংস্কৃত শব্দ বর্জিত হয়েছে এবং অনেক শব্দের উচ্চারণে আঞ্চলিক প্রভাব পড়েছে। তাছাড়া, দেশ বিভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই সংযোজন-বর্জন-মিশ্রণ ও রূপান্তর প্রক্রিয়াকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করেছে। সুতরাং সবদিক বিচার করলে প্রায় সাঁয়ত্রিশ আটত্রিশ বছর আগে রচিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে' নির্দেশিত সমুদয় উচ্চারণকে আজকের দিনেও প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করা সর্বাংশে যুক্তিসঙ্গত হবে না। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ বৃহৎ মধ্যম ও লঘু অভিধান থেকে আমরা খুব বেশি উপকৃত হচ্ছিনা।

দেশ বিভাগের ফলে এই রাজ্যের পূর্বখণ্ড পাকিস্তানের অধিকারে চলে গেলে এবং পৌনঃপুনিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুখে প'ড়ে হাজার হাজার হিন্দু পরিবার ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় চলে এলেন। আবার এর উল্টোটাও হল, পশ্চিম বাংলা থেকেও বহু মুসলমান পরিবার চলে গেলেন পাকিস্তানে। উনিশ শো ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ সাল থেকে সমানে কয়েক বছর স্রোতের মতো বাস্তুহারা মানুষ পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় এসেছেন। ধীরে ধীরে এই সব শরণার্থী পরিবারের লোকজনের সঙ্গে তাঁদের চারপাশের বাসিন্দাদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে এবং গত সাতাশ-আঠাশ বছরে পূর্ব বাংলার এই সব শরণার্থী মানুষ পশ্চিম বাংলার মানুষের জীবনধারা ও লোকাচারের ওপর

* এই প্রবন্ধ লেখবার সময়ে 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এর বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি।—সে. ব.।

যতোটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন তার চেয়েও বেশি তাঁরা প্রভাবিত করেছেন এখানকার উচ্চারণ পদ্ধতিকে। তাঁদের মধ্যে মেলামেশা আত্মীয়তা উত্তরোত্তর যতো বেড়েছে, ততোই নিজেদের অজানতে একে অন্যের উচ্চারণ-শৈলীর দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। এইভাবে মোটামুটি শুদ্ধ বলে যে উচ্চারণ এযাবৎ কাল স্বীকৃতি পেয়ে আসছিল তার সঙ্গে আঞ্চলিকতাদুষ্ট উচ্চারণের ক্রমাগত মিশ্রণের ফলে উচ্চারণ ধারা যে কতখানি বদলে গেছে সে হিসেব আজ আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল উনিশ শো একাত্তরের মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই সাড়ে আট মাস ধরে পূর্ব বাংলার প্রায় এক কোটি মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে এসে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরাও তাঁদের অজ্ঞাতসারে উচ্চারণকে খানিকটা প্রভাবান্বিত করেছেন।

আজকের যুগে উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গিকে প্রভাবিত করবার সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা বেতারের। সস্তা দামের ট্রানজিস্টারের কল্যাণে গণ্ডগ্রামের কৃষকের ঘরেও বেতার পৌঁছে গেছে। ফলে, বেতার ঘোষক ও সংবাদ পাঠকের উচ্চারণশৈলী ও বাচনভঙ্গির প্রভাবে গ্রামের মানুষের কথ্য ভাষা থেকে আঞ্চলিক বৈশিষ্টগুলো ক্রমশই লোপ পাচ্ছে। এক কালে, সাধারণ মানুষের চালচলন, সাজপোশাক, বাচনভঙ্গি এবং উচ্চারণ প্রণালীকে সর্বাধিক প্রভাবিত করতেন চলচ্চিত্রের সুদর্শন নায়ক-নায়িকারা। অধুনা, চালচলন ও সাজপোশাকে তাঁদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকলেও, বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণ ধারার ওপরে বেতার-কথকদেরই প্রভাবের প্রবল প্রাধান্য। অথচ, বেতারের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে আমরা মোটেই সচেতন নই। বেতার কথকদের উচ্চারণে সমতা আনবার কোনো চেষ্টাই আজ পর্যন্ত হয়নি। কোনো একটি শব্দ সবাই একইভাবে উচ্চারণ করেন না, পারিপার্শ্বিক সূত্রে আয়ত্তাধীন অভ্যাস এবং ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী এক একজন ঘোষক বা পাঠক এক-একরকম উচ্চারণ করেন। একই প্রতিষ্ঠান থেকে যাতে 'অতুলপ্রসাদ' শব্দের উচ্চারণ কারো মুখে অতুলপ্রসাদ আবার কারো মুখে অ-তুল প্রসাদ শুনতে না হয়, যাতে একজন ঘোষক লোক্গীতি অন্যজন লোকোগীতি উচ্চারণ না করেন, যাতে কোনো পাঠক 'অ-প্রীতিকর', আবার কোনো পাঠক 'অপ্‌.প্রীতিকর' উচ্চারণ না করেন তার জন্য কোনো ঘনিষ্ঠ প্রয়াস অদ্যাবধি নজরে পড়েনি।

বি. বি. সি অর্থাৎ বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন প্রথম থেকেই এদিকটায় সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন। ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে যখন এই

প্রতিষ্ঠানটি আত্মপ্রকাশ করে তখন এটি ছিল পুরোপুরি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, নাম ছিল বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানী। Mr J. C. W. Reith ছিলেন এর General Manager। ১৯২৭ সালের পয়লা জানুয়ারী এটি একটি সরকারী কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়, তখন থেকেই এর নাম হল বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন আর Mr Reith-ই হলেন এই কর্পোরেশনের প্রথম Director General। একদিকে অশুদ্ধ উচ্চারণ ও উচ্চারণ বৈষম্যের কর্ণপীড়া থেকে শ্রোতাদের এবং অন্যদিকে সমালোচক ও শ্রোতার তাঁইশ থেকে বেতার ঘোষকদের রেহাই দেওয়ার আশু প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বি. বি. সি. তৎপর হলেন উচ্চারণে সমতা আনতে। কিভাবে তাঁরা একাজে অগ্রসর হয়েছিলেন সে ইতিহাস জানা থাকলে, হয়তো আমরাও একদিন না একদিন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে এগিয়ে যেতে পারব এই আশায় তাঁদের কর্মপদ্ধতি এখানে সবিস্তারে জানাচ্ছি। এ সম্পর্কে Broadcast English নামে বি. বি. সি. যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন তার মুখবন্ধে বি. বি. সি-র তৎকালীন Director General Mr Reith বলেছিলেন যে, বেতার প্রচারের একেবারে সূচনাকাল থেকেই কথ্য ইংরেজী ভাষার নানা সমস্যা সম্পর্কে বি-বি. সি. তার গুরুদায়িত্ব শিরোধার্য করে নিয়েছে। এইসব সমস্যা যেমন বিরক্তিকর, তেমনই জটিল। বিশেষ বিশেষ শব্দ এবং সাধারণ নিয়ম নীতিগুলোকে 'যা হয় তা হোক গে' বলে দৈবের হাতে সঁপে দিয়ে সমস্যাগুলোকে হয়তো এড়িয়ে যাওয়া যেত। প্রবণতাগুলোকে বজায় রাখা যেত, কিংবা হয় সেগুলোকেই জোরালোভাবে সমর্থন করা যেত না হয়তো ঠেকানো যেত। ১৯২৮ সালের জুন মাসে লেখা এই মুখবন্ধে Mr Reith আরও বলেছেন যে, বেতার কথকদের প্রভাব প্রতিপত্তি যেমন আছে তেমনি এটাও ঠিক যে, যেহেতু শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে আছেন শিক্ষার নানা স্তরের মানুষ যাঁদের মধ্যে অনেকেই আঞ্চলিক ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত, সেইহেতু বেতার-কথকদের সব সময়েই যে কোনো মহলের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। Mr Reith বলেছেন যে, অভিন্ন কথ্য ভাষা প্রবর্তনের কোনো চেষ্টা তাঁরা করেননি, তবে সন্দেহজনক শব্দগুলোর ক্ষেত্রে একটা অভিন্ন নিয়ম বেঁধে দেওয়া ও উচ্চারণে সমতা নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে তাঁদের মনে হয়েছে যাতে প্রত্যেক ঘোষক-ঘোষিকা সদাসর্বদা একই রকম উচ্চারণ করেন।

Mr Reith জানিয়েছেন যে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯২৬ সালে বি. বি. সি. বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ চাইবেন ব'লে মনস্থ করলেন। সৌভাগ্যবশত রাজকবি Mr Robert Bridges-এর সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটির সক্রিয়

সহযোগিতাও তাঁরা পেয়ে গেলেন। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন Sir Johnston Forbes-Robertson, Professor Daniel Jones, A Lloyd James, George Bernard Shaw এবং Logan Pearsall Smith। এই কমিটির বেশ কয়েকটি অধিবেশন বসে, সাধারণভাবে কতকগুলি নির্দেশক-নীতি উদ্ভাবিত হয় এবং উচ্চারণে সংশয় আছে এরকম কয়েক শো শব্দ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা হয়। Broadcast English পুস্তিকাটি এই কমিটির দ্বারা সংকলিত প্রথম সরকারী প্রকাশনা। Broadcast English-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৮ সালে, দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোল চার বছরের মাথায় ১৯৩২ সালে। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে লেখা হয়েছে Broadcast English-এর তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ, তাতে বলা হয়েছে যে, এই পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পরে কথ্য ইংরেজী ভাষা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির গঠনপ্রকৃতি অনেকখানি বদলে গেছে। কমিটির গোড়ার দিককার কাজকর্ম বহুলাংশেই ছিল পরীক্ষামূলক। যতই দিন যেতে লাগল ততই এটা বেশি করে স্পষ্ট হতে থাকল যে, মূল কমিটিতে যেসব অভিমত স্থান পেয়েছে; এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য প্রয়োজন তার চেয়ে আরও ব্যাপক ও বিচক্ষণ মতামতের প্রতিনিধিত্ব। সেই কারণে ১৯৩৪ সালে বি. বি. সি. কমিটির কলেবর বৃদ্ধি করবার এবং কমিটির কর্মপদ্ধতি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিলেন। নতুন কমিটির সভাপতি হলেন George Bernard Shaw, সদস্য হিসাবে রইলেন Prof. Lascelles Abercrombie, Lady Cynthia Asquith, Lord David Cecil, Kenneth Clark, Sir Johnston Forbes-Robertson, Prof. George Gordon, Prof. H. J. C Grierson, Prof. Daniel Jones. F. L. Lucas. P. H. B Lyon, Rose Macaulay, Edward Marsh, Harold Orton, S K. Ratcliffe, I. A Richards. Logan Pearsall Smith ও Prof. H. C. K. Wyld এবং কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক-সদস্য রইলেন Prof. A. Lloyd James।

কমিটিতে মনোনীত প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যেসব প্রতিষ্ঠানকে সেগুলি হল বৃটিশ অ্যাকাদেমি, রয়্যাল সোসাইটি অব্ লিটারেচার, ইংলিশ অ্যাসোসিয়েশান এবং রয়্যাল অ্যাকাদেমি অব্ ড্রামাটিক আর্ট।

সদস্যদের মধ্য থেকে চারজন হলেন পরামর্শদাতা-সদস্য। লণ্ডনের University College-এর ধ্বনিতত্ত্বের University Professor, Prof. Daniel Jones,

লণ্ডনের School of Oriental Studies-এ ধ্বনিতত্ত্বের University Professor, Prof. A. Lloyd James, নিউ ক্যাস্‌ল্‌-অ্যাপন্‌-টাইনের Armstrong College-এর ইংরেজীর Lecturer, Harold Orton এবং Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের Merton Professor, Prof. H. C. K. Wyld—এই চারজন হলেন পরামর্শদাতা সদস্য। বি. বি. সি. এবারে করলেন কি, প্রথম দফায় শব্দের একটি তালিকা কমিটির এই চারজন পরামর্শদাতা-সদস্যের কাছে পাঠালেন এবং ধ্বনিতত্ত্ব বিশারদ হিসেবে তাঁদের কাছে প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য জানতে চাইলেন। পরামর্শদাতা-সদস্যরা তাঁদের রিপোর্টে প্রতিটি শব্দের অতীত ও বর্তমান ব্যবহার এবং স্বীকৃত বিকল্প উচ্চারণের বিচার-বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করে পাঠালেন মূল কমিটির কাছে ; যে কমিটিকে বি. বি. সি. নিয়োগ করেছেন তাঁদের বেতার-ঘোষকদের উচ্চারণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে, বেতার প্রচারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন শব্দ বিচার বিবেচনা করে তাঁদের সুপারিশ জানাবার জন্য।

পূর্ণাঙ্গ কমিটির সুপারিশগুলি প্রকাশ করে সেগুলি সম্পর্কে সারা দেশের তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত না নেওয়া পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কমিটির সুপারিশও চূড়ান্ত-ভাবে গৃহীত হত না।

এইভাবেই উচ্চারণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কঠিন প্রশ্নটিকে পর্যায়ক্রমে তিনটি পৃথক আপীল আদালতে পেশ করা হল। প্রথমে পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্‌দের একটি ছোট বিচারসভা, তারপর যাঁরা শিল্প সৃষ্টির নানা কাজে ব্যাপৃত আছেন তাঁদের এবং বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত বড় একটি বিচারসভা এবং সবশেষে সর্বসাধারণের রায়।

ভারতীয় উপমহাদেশের দ্বিতীয় বেতার কেন্দ্র 'কলকাতা কেন্দ্র' থেকে বেতার প্রচারের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে ১৯৭৭ সালে, কলকাতায় দূরদর্শন চালু হয়েছে ১৯৭৫ সালে। আজও আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই। বিশ্ববরেণ্য ভাষা-তত্ত্ববিদ্‌ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে আমরা হারিয়েছি অথচ তাঁর জীবদ্দশায় উচ্চারণ নির্দিষ্ট করার কাজটা শেষ করতে পারলে কী যে উপকার হতো, ভাবলে দুঃখ হয়। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, শেষ করা তো দূরের কথা, একাজ আজও শুরুই হল না। ডক্টর সুকুমার সেন, শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, ডক্টর মুরারিমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীশম্ভু মিত্র, শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রীউৎপল দত্ত, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, শ্রীমতী লীলা মজুমদার প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক, অভিনেতা,

সংগীতশিল্পী ও ভাষাতত্ত্ববিদদের সাহায্য নিয়ে বাংলায় স্ট্যাণ্ডার্ড উচ্চারণ প্রণয়ন করে উচ্চারণে যাবতীয় সংশয় ভ্রান্তি ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটাতে কে বা কারা কবে যে এগিয়ে আসবেন তারই আশায় বসে রইলাম।

পরিশেষে আবারও বলি, উচ্চারণের সমস্যা সে তো সমগ্র বাক্‌শিল্পেরই সমস্যা। বাংলা আবৃত্তির যা কিছু সমস্যা তার উৎস পল্লবগ্রাহিতা, মূঢ় অন্ধ-অনুকরণ প্রবৃত্তি।

আবৃত্তি : সংশ্লিষ্ট একজনের চোখে

বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ

ভরাট গম্ভীর ধ্বনি, তীক্ষ্ণ উচ্চারণ, সাবলীল আবেগ—বহুদিন পর্যন্ত জানা ছিল আমার—আবৃত্তির ছক ঐটুকুতেই বাঁধা। সেই প্রথম ভালোলাগার আবেশ কাটতে সময় নিয়েছিল অনেক। এই শিল্পটির প্রথম এবং প্রধান উপাদান যে কবিতা তার চরিত্র বুঝতে বাকী ছিল, সেই বোঝাতে এখনও ঘাটতির দিকটাই বেশি। অবশ্য আমার ধারণা, সেই ঘাটতি পূরণ হয় খুব কমজনের বেলাতেই।

আমি শুরু করেছিলাম আবৃত্তি প্রতিযোগিতা থেকে। কলকাতার নানান পাড়ায় এবং কলকাতার কাছাকাছি নানান জায়গায় হরেক প্রতিযোগিতায় আরও বহুজনের সঙ্গে ঘুরে বেরিয়েছি, প্রতিযোগিতা করেছি। তখন উৎসাহ ছিল, জয়পরাজয়ের তীব্র টানাপোড়েন ছিল। সেই খেলা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে এখন মনে হয় এই আবৃত্তি প্রতি-যোগিতার কিছু উপকারিতা থাকলেও অপকারিতাও কম নয়। এর মাধ্যমে কবিতা এবং তার আবৃত্তির ক্ষেত্র প্রসারিত হয়, বহুজনের মনে আগ্রহ জন্মায়, আবৃত্তিকার এবং আবৃত্তির শ্রোতা, উভয় শ্রেণীকেই প্রস্তুত করে, আগ্রহীজনের চর্চার সুবিধা বাড়ায়, চর্চার ফলাফল যাচাই করে নেওয়াও সম্ভব হয়। অপরপক্ষে, আয়োজক সংস্থাগুলির লক্ষ্য থাকে স্বাভাবিকভাবেই বেশি প্রতিযোগী পাওয়া, অনামী বা কমনামী সংস্থাগুলি অতএব মোটামুটি পরিচিত কবিতাগুলিকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রতিযোগিতার বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেন। বাস্তবত তাই নতুন নতুন কবিতার চর্চা বাড়ে না। উপরন্তু নির্বাচনের দায় যেহেতু আয়োজকদের, প্রতিযোগীদের দায় অতএব নির্মনন অনুশীলনের। আর, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, প্রতিযোগিতায় জয়ের টেকনিকটা একবার রপ্ত হয়ে গেলে অনুশীলনটাও গৌণ হয়ে আসে। বিচারকদের মন ভরানোর কাজটা শিখতে খুব বেশিদিন যাবার কথা নয়। একটা কিছু ভালোভাবে করার সামগ্রিক তৃপ্তি ক্রমশ দূরে সরে

যায়, তাৎক্ষণিক জয়ের উচ্ছ্বাস আড়াল করে দেয় কবিতা কিংবা আবৃত্তি দুটোকেই।

তৃপ্তি কী তবে আসরের আবৃত্তিতে? জনমনোরঞ্জনের জন্য সাজানো পসরা নিয়ে হাততালির ফসল কুড়োনোতে? এখানের হিসেব তো আরও অনেক সোজা। কবিতা বাছবেন আবৃত্তিকার—অবশ্যই হাততালির দিকে লক্ষ্য রেখে। কবিতা বলবেন আবৃত্তিকার—অবশ্যই হাততালির দিকে নজর রেখে। কোথাও দরকার খুব উচ্চগ্রামে কণ্ঠ নিয়ে যাবার, প্রায় রাজনৈতিক বক্তার বক্তৃতার মতো—তাই পাওয়া যাবে। কোথাও আবার অতটা মেঠো ব্যাপার চলবে না, চাই সুললিত কণ্ঠের মাধুর্য—মিলবে তাও। বাজার অনুযায়ী সওদা তৈরি, ক্রেতা কখনও সদয়, কখনও এত আয়োজন সত্ত্বেও বিরূপ।

পশ্চিম বাংলার শহরে শহরে গ্রামে গঞ্জে আবৃত্তি ছড়িয়ে পড়ছে। কলকাতা থেকে যাচ্ছেন নামী দামী শিল্পী। লোকে আসছে টিকিট কেটে ভিড় করে শুনতে, কিছুটা বা দেখতেও। আর তার বিনিময়ে আমরা দিচ্ছি তাৎক্ষণিক উচ্ছ্বাস বা প্রমোদের উপকরণ। চেষ্টা করছি না তাদের ভাবাতে, তাদের জাগাতে, তাদের বোঝাতে। চেষ্টা করছি না কবিতার গভীর অন্তরে প্রবেশ করতে, সেই অন্তরের আলোয় আলোকিত করতে কবিতার আবৃত্তিকে। আমাদের এই নিরন্তর ফাঁকিবাজির দায় নেবে কে? অথচ আমরাই তো চেষ্টা করি আবৃত্তিশিল্পের অভিভাবকত্ব করার! বোধ নেই, মনন নেই, অনুশীলন নেই, নেই কোনো চেতনা অথবা প্রেরণা—কোন্ উত্তরাধিকার আমরা দিয়ে যাব আমাদের আগামী দিনকে?

সহজ জনপ্রিয়তার লোভে আমরা প্রায়শই ভালো কবিতা ত্যাগ করে তাৎক্ষণিক আবেগের কবিতা বেছে নিচ্ছি। প্রয়োজনের তাগিদেই সম্ভবত তেমন কবিতার বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান, হয়তো বা সর্বপ্রধান, ধারার থেকে আবৃত্তিশিল্প ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। একথা সত্য যে, যেকোনো প্রয়োগশিল্পের পক্ষেই জনসমাদর কাঙ্ক্ষিত এবং অবশ্য প্রয়োজন। বর্তমান যুগে, জনতার জন্য শিল্প—এ তত্ত্বও সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অধিকাংশ তত্ত্বের মতোই এরও ব্যবহারিক দিকে তত্ত্বের অতিসরলীকরণজনিত বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়। জনগণের মনোরঞ্জনই নয় কেবল, জনতার রুচি পরিবর্তন এবং পুনর্গঠনেরও দায়ভাগ থেকে তো মুক্তি পেতে পারেন না কোনো সাহিত্যিক, শিল্পী বা প্রয়োগশিল্পী। প্রয়োগশিল্পী হিসাবে বোধ হয় আবৃত্তিকারদেরও ভেবে দেখবার সময় এসেছে জনমনোরঞ্জনের সহজ অথচ পিচ্ছিল পথ বেয়ে

আবৃত্তিশিল্পটিই ক্রমশ বিপদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিনা। ভেবে দেখলে এবং তার চেয়েও বড় কথা সেইমত কাজ করলে বোধহয় আমরা ভালো করব। আবৃত্তিকার হিসাবে নিশ্চয়ই আমরা সবচেয়ে বেশি করে চাইব এই শিল্পটির স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা ; চাইব মানুষজন আবৃত্তি শুনুন, কবিতা ভালোবাসুন, উজ্জীবিত হোন সত্যবোধে শিল্পের সত্যালোকে।

পরিশিষ্ট : যতই বহুবচনে 'আমরা' ব্যবহার করে থাকি না কেন আমার মতামতের দায়িত্ব একলা কেবল আমারই। বিজ্ঞজনে দয়া করে চাপল্যের অপরাধ নিজগুণে মার্জনা করে নেবেন।

এসো আবৃত্তি করি

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমরা কেউ যদি বলো 'আবৃত্তি করতে জানি না' বিশ্বাসই করব না। হয়তো এমন হতে পারে যে, তুমি কখনও কোনো প্রতিযোগিতায় নাম লেখাও নি কিংবা কোনো বড়ো জলসায় বা আসরে আবৃত্তি করো নি। কিন্তু তাই ব'লে বাড়িতে একলা ঘরে বসে সুর ক'রে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আপন মনে একটাও কবিতা পড়ো নি—এ হতেই পারে না। নিশ্চয়ই পড়েছো। অন্য কবিতা না হোক, অন্তত নিজের পড়ার বইয়ের কবিতাও তো বারে বারে জোরে জোরে পড়ে মুখস্থ করেছো। শুধু তোমরা কেন, যখন ছোট ছিলাম আমরা সবাই পড়েছি। স্কুলে মাস্টারমশাই পড়া ধরেছেন, কোনোদিন গরগর ক'রে মুখস্থ বলে গেছি, আবার যেদিন আটকে গেছে বিস্তর বকুনি খেয়েছি। সহজ কথায় বলতে গেলে, মুখস্থ ক'রে বলা—এরই নাম আবৃত্তি। প্রতিযোগিতাতেও এই একই ব্যাপার। সেখানেও বিচারকদের সামনে প্রতিযোগীদের একে একে ডাক পড়ে। তারা তাঁদের কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনায়। তাই শুনে বিচাকেরা নম্বর দেন আর তারপর সেই নম্বর অনুযায়ী কেউ-বা প্রথম, কেউ-বা দ্বিতীয় আবার কেউ-বা তৃতীয় হয়।

আসলে, অক্ষর পরিচয়েরও বহু আগে যখন থেকে বাড়ির গুরুজনদের মুখে শুনে শুনে 'ছড়ার ছবি' জাতীয় বইয়ের ছড়াগুলো আধো-আধো গলায় মুখস্থ বলতে শিখি, তখন থেকেই আবৃত্তিতে আমাদের হাতে-খড়ি হয়ে যায়। আমরা টেরও পাই না। সেই বয়সে সব কথার মানে বোঝা যায় না। কিন্তু যখন লজেন্স বা টফির লোভে কেউ একবার বলা মাত্রই ছোট্ট শিশুটি শুনিয়ে দেয় 'নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে / ওপারেতে ছেলেমেয়ে নাইতে নেমেছে' ইত্যাদি, তখন ধ্বনিঝংকার আর ছন্দের দুলুনিতে সেও দোল খায়। আবৃত্তির সেই তো শুরু—ধ্বনিঝংকার, সুর আর ছন্দ দিয়ে। কিন্তু শুধুমাত্র ধ্বনিঝংকার, সুর আর ছন্দের দুলুনি সম্বল করে বেশি দূর

এগোনো যায় না—ঐ ছড়া পর্যন্তই। আরও বেশি এগোতে হলে এগুলো ছাড়া আরও যে জিনিসটার দরকার তার নাম বোধ, অর্থাৎ বুদ্ধি—মানে বুঝে সেই মানে অনুযায়ী সঠিক ভাবটি গলায় ফুটিয়ে তুলবার বুদ্ধি। এই বোধ হঠাৎ আপনা থেকে মগজে গজিয়ে ওঠে না, অনুশীলনের মাধ্যমে এই বোধ জাগিয়ে তুলতে হয়, তারপর প্রদীপের সলতের মতো একটু একটু করে ক্রমাগত উসকে দিতে হয়। বারংবার একই কবিতার বোধসম্পন্ন পাঠই পরিণামে হয়ে ওঠে আবৃত্তি।

ছড়া-আবৃত্তির পালা সাঙ্গ ক'রে বর্ণ পরিচয়ের ছাড়পত্র নিয়ে কবিতার আপন রাজ্যে ঢুকবার অধিকার যখন পাই, তখন যেসব কবিতা সচরাচর পড়তে দেওয়া হয়, তার মধ্যে থাকে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'প্রভাতে', রবীন্দ্রনাথের 'শিশুর প্রার্থনা', 'সুখ-দুঃখ', 'বীর পুরুষ', 'বন্দী বীর', 'লুকোচুরি', কাজী নজরুল ইসলামের 'প্রভাত', নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'কাজের লোক', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'কাকাতুয়া' ইত্যাদি। মজাদার কবিতাও কিছু থাকে, যেমন সুকুমার রায়ের "আবোল তাবোল"-এর কবিতাগুলো, নজরুল ইসলামের 'খুকী ও কাঠবেড়ালি', 'খাদু দাদু', 'লিচু-চোর' ইত্যাদি।

ইতোবসরে, অক্ষরজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকায়, কবিতাগুলো রিডিং পড়ে যেতে বিশেষ অসুবিধা হয় না বটে, তবে সে পড়া শুনে, অন্যের তো দূরের কথা, নিজেরই খারাপ লাগে। কোথাও কোনো ঝোঁক না দিয়ে বা ঘাসাঘাত না ক'রে, গলা ওঠা-নামা না করিয়ে একঘেয়ে স্বরে, দম-ছাড়া দম-নেওয়ার জন্য যেখানে সেখানে বিরাম ঘটিয়ে শব্দগুলোকে পর পর উচ্চারণ করায় তাদের ভেতরকার যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায়, অর্থগত সম্পর্ক হারিয়ে যায়, ছন্দ কেটে যায়।

সুন্দর করে পড়া আয়ত্ত করতে হলে এই সব দোষত্রুটি সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং কয়েকটি জিনিস শিখে নিতে হবে। প্রথমেই শিখতে হবে কি ক'রে প্রতিটি অক্ষর সমানভাবে অর্থাৎ হুবহু একই রকম ওজন ও আকারে উচ্চারণ করা যায়। উচ্চারিত প্রতিটি অক্ষরের ধ্বনিগত মাত্রায় যাতে অনিয়ম না থাকে তারজন্যে এক একটি অক্ষরকে এক এক মাত্রা হিসেবে ধরতে হবে। যাঁরা গান বাজনা করেন তাঁদের কাছ থেকে মাত্রার ব্যাপারটা ভালো ক'রে বুঝে নিতে পারো। আমি বলতে চাইছি যে, পড়বার সময় ক্। খ্+অ | গ্+অ | ঘ্+অ | ঙ+অ+অ+অ—এই রকম বিশৃঙ্খল মাত্রায় উচ্চারণ করো না, ক্+অ | খ্+অ | গ্+অ | ঘ্+অ | ঙ্+অ এই রকম সমান ওজনে উচ্চারণ করবে। উচ্চারণের এই ধ্বনিগত শৃঙ্খলাই একজোট হয়ে কবিতার ছন্দের বনিয়াদ গড়ে তোলে। প্রতিটি বর্ণ সমান মাত্রায় উচ্চারণের রীতি আয়ত্তে থাকলে ছন্দ তার

করতেও সুবিধা হয়। ছন্দ ভাগ করবার সময়ে মনে রেখো, বাংলায় আমরা হ্রস্ব এবং দীর্ঘস্বরের উচ্চারণের সংস্কৃত রীতি মেনে চলি না, তবে কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ মেলানোর জন্যে প্রয়োজন হলে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে দীর্ঘস্বর যুক্ত থাকলে সামান্য টেনে উচ্চারণ করতে হয়।

কবিতায় ছন্দ থাকে ঠিকই, কিন্তু সব ছন্দের গতি বা চলন যে অনায়াসে বোঝা যাবে এমন কোনো কথা নেই। অনেক কবিতাই পাওয়া যাবে যার ছন্দ প্রায় সুপ্ত, আছে কি না-আছে বোঝাই যাবে না। এই সব কবিতার বেলায় অসুবিধা হবার কথা তাদের, যাদের গদ্যপাঠের অনায়াস ভঙ্গিটি ভালোভাবে রপ্ত হয়নি। উৎকৃষ্ট গদ্য রচনাতেও ছন্দের চলন থাকে। পাঠককে সেটা খুঁজে নিতে হয় বাক্যের অর্থ অনুযায়ী যতি, ঝোঁক ইত্যাদির স্থান নির্বাচন করে। তোমরা হয়তো ভাবছো, গদ্যের আবার ছন্দ থাকে নাকি? জেনে রাখো, উঁচুদরের সাহিত্যিকের যে কোনো রচনাতেই ছন্দ থাকে। তোমাদের পক্ষে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা। ভালো আবৃত্তিকার যদি হতে চাও তাহলে গদ্য পদ্য সব রকম লেখাই জোরে জোরে পড়বে। দেখেছি, তোমাদের অনেকেই একটু বড়ো হয়ে যেই উঁচু ক্লাসে ওঠো, অমনি জোরে পড়া ছেড়ে দিয়ে মনে মনে পড়তে আরম্ভ করো। এটা খুব ক্ষতিকর অভ্যাস। খাতায় লেখার বেলায় যেমন হাতের লেখার পরিচ্ছন্নতার (neatness of handwriting) একটা মূল্য আছে, তেমনি কিছু পড়ার বেলায় কণ্ঠস্বরের পরিচ্ছন্নতাও (neatness of voice) অত্যন্ত মূল্যবান। তাই যখন যা কিছু পড়বে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়বে। জোরে পড়লে অনেক উপকার হয় যেমন, জিভের জড়তা কেটে যায়, উচ্চারণ স্পষ্ট হয় আর কোনো বড়ো বাক্যকে, মানে বুঝে বুঝে ছোট ছোট বাক্যাংশে ভাগ ক'রে, দম ছেড়ে দম নিয়ে থেমে থেমে পড়বার কৌশল আয়ত্ত করা যায়। তাছাড়া, ভুল পড়লে বাড়ির গুরুজনদের কানে গেলে তাঁরা ভুল সংশোধন ক'রে দিতে পারেন।

তোমাদের কারো কারো বদ্ অভ্যাস আছে—কবিতা আবৃত্তির সময় অতি মাত্রায় অঙ্গভঙ্গি করা। আমার নিজের মতে, কাঁধটা সামান্য ঝাঁকি দিলে বা হাতটা এক-আধবার একটু নাড়লে কিংবা মাথাটা ঈষৎ দোলালে অথবা গলা খেলাতে একটু আধটু পেশী সঞ্চালন করলে ক্ষতি নেই কিন্তু তাই বলে হাত-পা নেড়ে, চোখ নাচিয়ে, সর্বাঙ্গ ঝাঁকিয়ে কবিতা বললে বিশ্রী লাগে। আবার কেউ যদি একেবারে নিশ্চল পাথরের মতো মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবলেশহীন মুখে কবিতা আবৃত্তি করে তাও ভালো লাগে না। যেটুকু স্বাভাবিক সেটুকুই করা

উচিত, তার বেশিও না, কমও না। আবৃত্তির এমন ঘটনার কথাও শুনেছি যে, তোমাদেরই কেউ 'বন্দী বীর' কবিতাটি আবৃত্তির সময় হাতের পাঁচটা আঙুল শ্রোতাদের দেখিয়ে 'পঞ্চ' ব'লে, নাচের মতো মুদ্রা ক'রে নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথ দেখিয়ে 'নদীর তীরে' বলবার পর মাথার পেছন দিকে দুটি হাত নিয়ে গিয়ে ভিজে কাপড় নিঙড়োবার ভঙ্গি ক'রে বলেছে 'বেণী পাকাইয়া শিরে' ইত্যাদি। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আসরে গেলে আজও এই ধরনের অভিনয় ও মুদ্রা মিশ্রিত আবৃত্তিই বেশি চোখে পড়ে। অনেকে বড়ো হয়েও এই অভ্যাস ছাড়তে পারে না, তখনও সে 'বঙ্গ' কবিতা আবৃত্তি করতে হলে, হাতের চার আঙুল শ্রোতাদের চোখের সামনে মেলে ধরে বলে 'চার মিঠে দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ' কিংবা শ্রোতাদের সামনে নিজের পাদুকা তুলে ধরে বলে 'লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা' ইত্যাদি। একজনকে দেখেছি, সে সব সময়ে হাসি হাসি মুখে আবৃত্তি করে। এমন কি 'বিদ্রোহী' কবিতাটিও আদ্যোপান্ত হাসিমুখে তাকে আবৃত্তি করতে দেখেছি। সে যখন বলেছে 'আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস' তখনও হাসিটি তার মুখে লেগে ছিল। ছেলেবেলায় সেই যে হেসে হেসে ছড়া বলা অভ্যাস করেছিল, সে অভ্যাস বড়ো হয়েও ছাড়তে পারে নি। সব সময় মনে রাখবে, যখন কোনো কবিতা আবৃত্তি করবে, তখন সেই কবিতাটিকে তোমার সুললিত কণ্ঠে, স্পষ্ট বিশুদ্ধ উচ্চারণে এবং সঠিক ছন্দের বৃত্তে শ্রোতাদের কানে পৌঁছে দেবে যাতে কবিতার যে রস ছাপার অক্ষরে বন্দী হয়েছে তা ধ্বনির ব্যঞ্জনায় শ্রোতাদের অনুভূতিকে নাড়িয়ে দেয়। আবৃত্তিতে অতিরিক্ত জৌলুস আনবার লোভে চটকদার অতি নাটকীয় অভিব্যক্তির আশ্রয় নেওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। খেয়াল রাখবে, আবৃত্তি যেন শুধুই শ্রোতব্য হয়, দ্রষ্টব্য না হয়।

পরিশিষ্ট

বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি ও সংস্কার *

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

কোনও ভাষার একক (unit) তাহার বাক্যগুলি। রাসায়নিক যেমন বস্তু বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মূল উপাদানগুলি আবিষ্কার করেন, বৈয়াকরণও সেইরূপ বাক্য বিশ্লেষণ করিয়া প্রথমে তাহার পদগুলি, পরে পদগুলি হইতে তাহার শব্দ, তাহার পরে শব্দগুলি হইতে তাহার অক্ষর (Syllable) এবং অবশেষে অক্ষরগুলি হইতে তাহার ধ্বনি (Phoneme) আবিষ্কার করেন। বৈয়াকরণের এই বিশ্লেষণই ব্যাকরণ। এই ধ্বনিগুলির চাক্ষুষ রূপ বর্ণ (letter)। রঙের দ্বারা এইগুলি পত্র, চর্ম, বল্কল ইত্যাদিতে লিখিত হইত বলিয়া ইহাদের নাম বর্ণ। বর্ণের সমষ্টি বর্ণমালা।

আদিতে বাস্তব প্রয়োজনের অনুরোধে কোনও ভাষায় যতগুলি ধ্বনি থাকে, ততগুলি বর্ণও থাকে; কিন্তু কালক্রমে কতক ধ্বনি বিকৃত বা লুপ্ত হইলেও, বর্ণগুলির কোনও পরিবর্তন হয় না। এমন কি নূতন ধ্বনির উদ্ভব হইলেও অনেক সময় তাহার জন্য নূতন বর্ণ সৃষ্টি করা হয় না। ইহাতে বানান ঠিক ধ্বনিমূলক (Phonetic) না থাকিয়া ঐতিহাসিক হইয়া যায়। বাঙ্গালা ও ইংরেজী বর্ণমালা ইহার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত। Know, Knew ইত্যাদি শব্দে k, এবং night, daughter ইত্যাদি শব্দে gh উচ্চারিত না হইলেও লিখিত হইতেছে। ইহার ঐতিহাসিক কারণ আছে। এক সময় এই k এবং gh উচ্চারিত হইত। জার্মান ভাষায় এইগুলি kenn, knie, Nacht, Tochter. সেখানে k-এর উচ্চারণ রক্ষিত হইয়াছে এবং জার্মান ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে gh স্থানে উচ্চারণে ch (খ) হইয়াছে। এই দুই ধ্বনি হিন্দ-য়ুরোপায়ন গ এবং ক ধ্বনির জর্মান ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক বিবর্তন। সংস্কৃতে ইহারা জ্ঞ এবং ক ধ্বনি, যেমন জ্ঞা, জানু, নক্ত। গ্রীক ভাষাতে গ এবং ক ধ্বনি, তথা gonu, noktos; সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে ইংরেজীর এই শব্দগুলিতে k এবং gh ঐতিহাসিক বানান, ধ্বনিমূলক নহে। বাঙ্গালায় আমরা লিখি ক্ষীর, ক্ষেত্র। ইহা ঐতিহাসিক সংস্কৃত

---

* মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ, সম্পাদিত শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ থেকে প্রবন্ধটির প্রাসঙ্গিক অংশ সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল —বাঙলা একাডেমী পত্রিকায় ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায়—চৈত্র ১৩৬৭-জ্যৈ—স.

বানান ক্ষীর ক্ষেত্র-এর অনুকরণ। ধ্বনিমূলক হইলে বানান হইবে খীর, খেত। পালি এবং প্রাকৃতে এরূপ ধ্বনিমূলক বানান ছিল যেমন খীর, খেত্ত।

বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনির বিষয়ে গবেষণা করিতে হইলে, বাঙ্গালা বর্ণমালার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। আমাদিগকে বৈজ্ঞানিক ভাবে বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি বিচার করিতে হইবে। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে বাঙ্গালা বর্ণমালা প্রধানতঃ সংস্কৃত বর্ণমালা। কেবল সংস্কৃতের দীর্ঘ ৠ-কার স্বরবর্ণ মধ্য হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ব্যঞ্জনবর্ণে ড়, ঢ়, য় সংযোগ হইয়াছে। সংস্কৃতে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ দুই ব-কারের পৃথক্ রূপ থাকিলেও বাঙ্গালা বর্ণমালায় একরূপ করা হইয়াছে; সংস্কৃতে য-এর উচ্চারণ য় বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় য-এর প্রাকৃত উচ্চারণ জ হওয়ায়, একটি পৃথক্ বর্ণ য় সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। আমরা এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি বিচার করিব।

আমরা এখানে বাঙ্গালা ভাষা বলিতে খাঁটি বাঙ্গালা বুঝিব, অর্থাৎ বাঙ্গালা সাধু ভাষায় যে সকল দেশী ও তদ্ভব উপাদান আছে তাহা বুঝিব। বাঙ্গালা ভাষায় বিদেশী ভাষা হইতে যে সকল কৃতঋণ উপাদান আছে, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। তবে যথাস্থানে তাহাদের কিছু উল্লেখ করা যাইবে। এখানে সাধু ভাষার সাধু (Standard) উচ্চারণ আমাদের আলোচ্য।

একক স্বরগুলি (Monophthongs) এই—অ আ ই উ এ ও এ' (অ্যা)। ইহাদের প্রত্যেকটির হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদ আছে। ইহা খাঁটি বাঙ্গালার বিশেষত্ব। সংস্কৃতে কেবল ই উ ধ্বনির হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ আছে; কিন্তু অ কেবল হ্রস্ব এবং আ এ ও কেবল দীর্ঘ। এ' (অ্যা) ধ্বনি সংস্কৃতে নাই। অধিকন্তু ঋ হ্রস্ব ও দীর্ঘ এবং ঌ হ্রস্ব সংস্কৃতে আছে, অথচ পালি ও প্রাকৃতে নাই। বাঙ্গালা উচ্চারণে

হ্রস্ব	দীর্ঘ	উদাহরণ
অ	—	অজানা, কলা
—	অ	অজ, বল
আ	—	আমি, মামা
—	আ	আম, কান
ই	—	ইনি, দিদি
—	ই	ইট, দিন

হ্রস্ব	দীর্ঘ	উদাহরণ
উ	—	উনি, কলু
—	উ	উট, কুল
এ	—	এলাচি, কেনা
—	এ	এর, চলেন
ও	—	ওহে, ঘোড়া
—	ও	ওল, দোল
এ'	—	এ'মন, এ'কা (অ্যামন, অ্যাকা)
—	এ'	এ'ক দে'খ, (অ্যাক, দ্যাখ,)

সংস্কৃত বানান অনুসারে ঈ, ঊ লেখা হইলেও খাঁটি বাঙ্গালা উচ্চারণে তাহারা হ্রস্ব হইতে পারে। যথা—সীতা, ঈশান, দেবী, উনিশ, ঊরু, পূজারি।

সংস্কৃতে সন্ধিস্বর (diphthong) মাত্র দুইটি—ঐ, ঔ। পালি ও প্রাকৃতে কোনও সন্ধিস্বর নাই। বাঙ্গালা ভাষায় কিন্তু ১৯টি সন্ধিস্বর আছে।—

সন্ধিস্বর	উদাহরণ	সন্ধিস্বর	উদাহরণ
অয়	হয়, ময়লা	এউ	ঢেউ, দেউলিয়া
অও	হও, চওড়া	এয়	পেয় (পান করে)
আই	খাই, মাইরি	এও	পেও (পান কর)
আউ	ঝাউ, শাউড়ী	এ'য়	দেয়, পেয়লা
আয়	হায়, বায়না	এ'য়	নে'ও, শে'ওলা
আও	খাও, পাওনা	ওই	মই (মোই), মইতা (মোইতা)
ইই	আমিই, দেখিই	ওউ	মউ (মোউ), বউনি (বোউনি)
ইউ	মিউ, শিউলি	ওয়	শোয়
উই	দুই, দুইটা	ওও	শোও
এই	যেই, এইটা		

ডক্টর সুনীতিকুমার এই সন্ধিস্বরগুলির মধ্যে ইই, এয় ওও গ্রহণ করেন নাই। অধিকন্তু তিনি ইএ (ie), ইআ (ia), ইও (io), এয়া (ea), অআ (aa), ওআ (oa) উএ (ue), উআ (ua) এবং উও (uo) সন্ধিস্বর রূপে গণনা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহারা সন্ধিস্বরের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

এই সকল স্বরের অতিরিক্ত আর দুটিই অভিশ্রুতি (umlaut)-যুক্ত স্বর কোনও কোনও সুবক্তার মুখে শোনা যায়। তাঁদের উচ্চারণে চা'ল (চাউল), ডা'ল (ডাইল), কা'ল (কল্য), হা'র (পরাজয়) শব্দগুলি চাল (ঘরের চাল), ডাল (শাখা), কাল (সময়), হার (মালা) হইতে পৃথক্ রূপে উচ্চারিত হয়। এইরূপ ক'নে (কন্যা), ধ'নে (ধনিয়া) শব্দগুলি কোণে, ধনে হইতে পৃথক্ উচ্চারিত হয়।

এই সমস্ত একক ও সন্ধিস্বরের আনুনাসিক উচ্চারণও আছে।

খাঁটি বাঙ্গালায় অনুস্বার এবং বিসর্গেরও ধ্বনি আছে, যেমন রং, সং, বেং (ব্যাং), আংটি, আংরা, আঃ, বাঃ, উঃ। এই দুই ধ্বনি বস্তুতঃ ঙ এবং হ্‌-এর হসন্ত উচ্চারণ, সুতরাং ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ঞ, ণ, য, ঢ় ধ্বনি খাঁটি বাঙ্গালায় নাই। পৈশাচী প্রাকৃতে কেবল ন, অন্য প্রাকৃতগুলিতে কেবল ণ আছে। বাঙ্গালায় জঞ্জাল, ঠাণ্ডা, গন্ধ, এই তিন শব্দের ঞ, ণ, ন ব্যবহৃত হইলেও বাস্তবিক ইহারা একই মূলধ্বনির

(phoneme) সামান্য প্রকারভেদ, যেমন উল্টা এবং আলতার ল একই মূলধ্বনির সামান্য প্রকারভেদ। বাঙ্গালায় 'সবিশেষ' শব্দের তিনটি উক্ত বর্ণের একই শ-কার উচ্চারণ। পালি ও প্রাকৃতে ষ নাই। মাগধী প্রাকৃতে কেবল শ এবং অন্য প্রাকৃতগুলি এবং পালি ভাষায় কেবল স আছে। বাঙ্গালা ভাষায় কেবল বিদেশী শব্দে এবং সংযুক্ত বর্ণে স আছে; যেমন সালাম, মুসলমান, আস্তে, মস্ত ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষায় স লিখিত হইলেও প্রায়ই তাহার উচ্চারণ শ। গূঢ়, গাঢ়, আষাঢ় প্রভৃতি সংস্কৃতসম শব্দে ঢ় লিখিত হয়; কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালা শব্দে ঢ় নাই। মধ্য বাঙ্গালায় বুঢ়া, বাঢ়ে, পঢ়ে প্রভৃতি আধুনিক বাঙ্গালায় ড় দিয়া লিখিত ও উচ্চারিত হয়।

বাঙ্গালা বর্ণমালায় যে অন্তঃস্থ য এবং অন্তঃস্থ ব বর্ণ আছে, তাহা বর্গীয় জ এবং বর্গীয় ব-এর সহিত অভিন্ন। জন্ম এবং যত্ন, এখানে বর্গীয় অন্তঃস্থ দুইটি জ-এর বাঙ্গালা ভাষায় একই উচ্চারণ। এইরূপ বিদ্ধ এবং বিল্ব, এখানে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ দুইটি ব একেবারে একই উচ্চারণে। অবশ্য সংস্কৃতে এই দুয়ের পৃথক্ রূপ পৃথক্ উচ্চারণ আছে। খাঁটি বাঙ্গালায় পাওয়া, খাওয়া, চোয়াল, বোয়া প্রভৃতি শব্দে এই অন্তঃস্থ ব ধ্বনি আছে; কিন্তু কোনও বর্ণ নাই, অথচ আসামীতে এই জন্য একটি পৃথক্ বর্ণ আছে।

সংস্কৃতসম অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে কৃতঋণ চিহ্ন, পরাহ্ণ প্রভৃতি শব্দে কেহ কেহ মহাপ্রাণ ন উচ্চারণ করেন। তাঁহাদের উচ্চারণ chin-nha, paran-nha। এইরূপ মহাপ্রাণ ম এবং ল উচ্চারণও আছে, যেমন ব্রহ্ম, বাঙ্গালা উচ্চারণে bram-mha, ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালা উচ্চারণে bram-mhan; আহ্লাদ বাঙ্গালা উচ্চারণে al-lhad.

বিদেশী শব্দে z ধ্বনি সংজ্ঞায় এবং পারিভাষিক শব্দে রক্ষিত হয়। অধুনা ইহা য দ্বারা সূচিত হয়, যেমন, এলিযাবেথ, আযান, নমায, রোযা প্রভৃতি কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদের ধ্বনি জ-এ পরিবর্তিত হইয়াছে এবং সেইরূপই লিখিত হয় এবং হওয়া উচিত। যেমন, জেব্রা, হাজার জাহাজ, জোর প্রভৃতি।

ং-এর জন্য পৃথক বর্ণ অপ্রয়োজনীয়। ক্ র্ প্রভৃতির ন্যায় ঙ্ বেশ চলিতে পারে।

ধ্বনিমূলক ভাবে খাঁটি বাঙ্গালার বর্ণমালা এইরূপ হইবে,

অ আ ই উ এ ও এ্য (=অ্যা) ং ঁ।
ক খ গ ঘ | চ ছ জ ঝ | ট ঠ ড ঢ।
ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব় (=ওয়)।
শ স হ। ড়।

পরিশিষ্ট : ২

বাক্-প্রত্যঙ্গ *

[Organs of Speech]

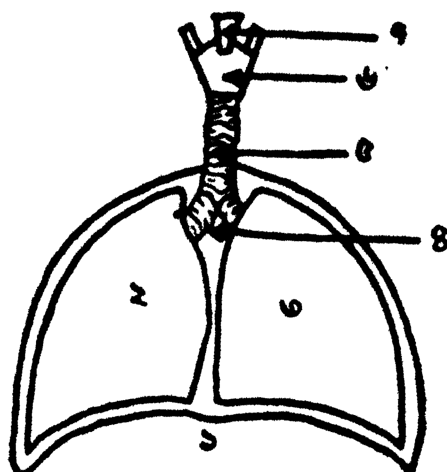
মুহম্মদ আবদুল হাই

আমরা জানি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সহায়তা করা এবং রক্তশোধন করা ফুসফুসের অন্যতম কাজ। তবু ফুসফুসই শেষ পর্যন্ত মানুষের বাগ্‌ধ্বনি উৎপাদনের কেন্দ্র। প্রাণধারণের জন্য মানুষ ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসগ্রহণ করে এবং শ্বাস ত্যাগও করে। শ্বাসবায়ুর বহির্গমনকালে গলনালী ও মুখবিবরের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। এ সংঘর্ষের স্থান, রূপ ও পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন ধ্বনি উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি। ফুসফুস-তাড়িত বাতাসের নির্গমনের ফলেই সাধারণতঃ ধ্বনির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রম অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণের সময়ও ঠোঁট কিংবা মুখগহ্বরের স্থান বিশেষে বাতাস বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে ধ্বনিসৃষ্টির উদাহরণ বিরল নয়। 'বিপরীত স্পর্শ' (Implosive), 'শীৎকার' বা 'কাকুধ্বনি' (clicks) প্রভৃতি ধ্বনি এ পর্যায়ে পড়ে। সাধারণতঃ বাতাসের বহির্গমন এবং ক্ষেত্র বিশেষে অন্তর্গমন ধ্বনি সৃষ্টির প্রধান উপায়। সুতরাং ফুসফুস যে ধ্বনির উৎপাদক (generator) যন্ত্র এ থেকে তা বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুস্থ মানুষের ফুসফুস

---

* লেখকের 'ধ্বনি-বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থের ১ম অধ্যায় থেকে সংকলিত।

শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগের জন্য কি বিরামবিহীন পাম্পের কাজ করে নিচের ছবিটি থেকে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যাবে—



১। মধ্যচ্ছদা (diaphragm)।

২। ডান ফুসফুস (right lung)।

৩। বাম ফুসফুস (left lung)।

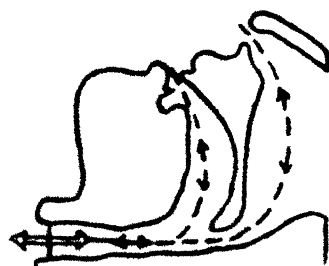
৪। শ্বাসনালী (bronchial tubes)।

৫। বায়ুনালী (windpipe)।

৬। স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী পথ (glottis)।

৭। অধিজিহ্বা (epiglottis)।

আর এ ছবিটি থেকে বায়ু প্রবেশের ও নিষ্কাশনের পথ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে :



→→→→ বাতাসের প্রবেশ পথ

→→→→ বাতাসের নিষ্কাশন পথ

নিম্নের চিত্র দু'টি থেকে মুখ গহ্বর, গলনালী ও স্বরতন্ত্রী প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রের সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে :—

ধ্বনির উৎপত্তি ও প্রকৃতির দিক থেকে বাক্-প্রত্যঙ্গাদির মধ্যে ফুসফুসের পরে সম্ভবতঃ স্বরযন্ত্রের (larynx) মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীর (vocal ocrds) স্থান। ওপরের ১ম চিত্রের দিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে, গলার সামনের দিকের যে অংশটি

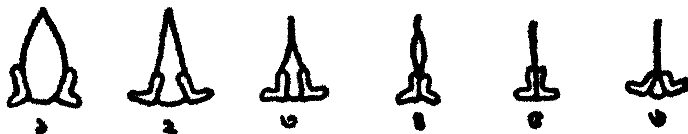
উঁচু হয়ে আছে এটিকে ইংরেজিতে Adam's apple বলা হয়। পুরুষ মানুষ হ্যাংলা হলে অনেকের গলায় কাক-বকের ঠোঁটের মতো একটা ছুঁচলো কুচকুচে হাড় বেড়ে থাকতে দেখা যায়। এটিই Adam's apple বা কণ্ঠমণি। পুরুষ মানুষের গলায় এ অংশটুকু সাধারণতঃ যেভাবে বেড়ে থাকে, নিতান্ত হ্যাংলা বা স্বাস্থ্যহীন না হলে মেয়েদের গলায় অস্বাভাবিক ভাবে এটা তেমন বেড়ে থাকতে দেখা যায় না। সে যা হোক, তা ভেতরের যন্ত্রপাতি সহ এই কণ্ঠমণি বা টুঁটিটিই larynx বা স্বরযন্ত্র। প্রাণিজগতের এ larynx বা স্বরযন্ত্রকে 'sound box' বা ধ্বনি মঞ্জুষা নাম দেওয়া যেতে পারে। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় বিবর্তনের পথ ধরে মানুষের larynx-ই পূর্ণতা পেয়েছে। সেজন্যে মানুষের কণ্ঠধ্বনির বিচিত্রতায় আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হই।

নিম্নের ছবিটি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে স্বরযন্ত্রের ভেতরে একটি আংটির মধ্যে দুটো সূক্ষ্ম স্বরতন্ত্রী রয়েছে। এ স্বরতন্ত্রী দুটো উল্টো 'ভি' (A) আকৃতির।



ইংরেজিতে এ দুটোর নাম দেওয়া হয়েছে Vocal cords. কথা বলার সময় এরাও ঠোঁটের মতো কাজ করে দেখে কোনো কোনো ধ্বনি-বৈজ্ঞানিক এগুলোর নাম দিতে চান Vocal lips বা 'স্বরোষ্ঠ'। স্বরতন্ত্রী দুটোকে Vocal cords বা Vocal lips যে নামেই অভিহিত করি না কেন এদের মধ্যবর্তী স্থানটুকুকে—অন্য কথায় তাদের অন্তর্বর্তী পথকে বলা হয় glottis. ফুসফুস-তাড়িত বাতাস মুখ বিবর কিংবা নাসা পথে বের হয়ে যাবার আগে প্রথমেই স্বরতন্ত্রীর (vocal cords) মধ্যবর্তী (glottis) পথে প্রবেশ ক'রে হয় এ দুটোকে প্রকম্পিত করে, না হয় তেমন প্রকম্পিত করে না, না হয় অনেকটা নিষ্ক্রিয় রাখে, না হয় পরস্পর সংলগ্নতায় ফলে এদের রুদ্ধগতি সজোরে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দিয়ে যায়। স্বরতন্ত্রীদ্বয়ের ভেতর দিয়ে বাতাস বের হয়ে যাবার সময় তাদের মধ্যবর্তী পথের (glottis) রূপ বাগ্‌ধ্বনির প্রকৃতি ও গুণ নির্ণয়ে সহায়ক।

করে। Glottis-এর নিয়ে প্রদর্শিত বিভিন্ন ধরণের অবস্থান থেকে এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে—



বাগ্‌ধ্বনির প্রকৃতি নির্ণয়ে স্বরতন্ত্রীদ্বয়ের বহুবিধ ক্রিয়াকর্ম স্বীকৃত হোলেও ধ্বনিকে ঘোষত্তা ও অঘোষত্তা গুণে বিভূষিত করবার জন্য এদের সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা বিশেষ ভাবে লক্ষযোগ্য। অন্য কথায় তাদের positive ও negative function তথা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় অবস্থাই বাগ্‌ধ্বনিকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। ধ্বনি সৃষ্টির কালে তারা যদি বিশেষভাবে প্রকম্পিত হয় তবে সে ধ্বনি হবে ঘোষ তথা voiced বা নিনাদিত। কিন্তু যদি বাতাস শুধু তাদের দুপাশ ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়, আর তাদের কাঁপন না লাগে, তা হলে সে ধ্বনি হবে অঘোষ বা voiceless, এদিক থেকে যে কোনো ভাষার সমস্ত ধ্বনিকে স্বরতন্ত্রীর সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা বিচারে ঘোষ বা অঘোষ এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ ক'রে দেওয়া যায়। সে জন্যই বলা হয় বাগ্‌ধ্বনির উৎপাদন ও শ্রুতিবিচারে স্বরযন্ত্র নিহিত এ স্বরতন্ত্রীদ্বয়ের ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বরতন্ত্রী দুটো ফুসফুসে বাতাসের প্রবেশ পথ। সে জন্যে তাদের নিম্নবর্তী অংশের পারিভাষিক নাম বায়ুনালী (wind-pipe)। এরই পাশে ঘাড়ের দেওয়াল সংলগ্ন ভিতরের দিকে থাকে খাদ্যনালী (food-passage)। খাবারের গ্রাস যাতে স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী পথ দিয়ে বায়ুনালীর ভেতর দিয়ে ফুসফুসে না প্রবেশ করে সেজন্য জিহ্বার একেবারে নীচেকার মাংসপিণ্ডের সঙ্গে ঊর্ধ্বাধ (vertical) ধরনের একটি মাংসপিণ্ড আছে। এটিকে Epiglottis বা অধিজিহ্বা বলা হয়। খাবারের গ্রাস এ-পথে প্রবেশ করতে গেলে অধিজিহ্বা ঢাকনার মতো শায়িত অবস্থায় বায়ুনালীর মুখ আবৃত ক'রে দেয়; ফলে আহারের গ্রাস ফুসফুসে প্রবেশ না ক'রে খাদ্যনালী ধরে পাকস্থলীর পথে রওয়ানা হয়। সময়ে সময়ে খাদ্য-কণিকা স্বরতন্ত্রীর পথে কোনো ক্রমে বায়ুনালীতে প্রবেশ ক'রলে বিষম লাগে। তাতে কথিত প্রবাদ মতে প্রিয়জনের স্মরণ তখন আর তার পক্ষে আনন্দ-দায়ক হয় না, তাতে মানুষের প্রাণান্তও ঘটে। সে যা হোক, বায়ুনালী ও ফুসফুসকে রক্ষা করা ছাড়া অধিজিহ্বা বাগ্‌ধ্বনির কোনো কাজে আসে না।

বায়ুনালীর কিছু ওপরে জিহ্বার গোড়ালি বা মূল (root) তথা অধিজিহ্বা

স্বরযন্ত্রের ধাক্কের ভিতরের দেওয়াল-পরিহিত অংশ হচ্ছে pharynx বা গলনালী। তার বিশেষণ pharyngeal বা গলনালীয়। গলনালীকে ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিভাষায় গলকক্ষও বলা যেতে পারে। গলকক্ষ আমাদের ভাষায় ধ্বনি উৎপাদনের কাজে না লাগলেও আরবী ভাষার [কয়েকটি] ধ্বনি সৃষ্টির স্থান।

গলকক্ষ থেকে ঠোঁট পর্যন্ত অংশ মুখবিবর। মুখবিবরের ওপরে তালু এবং নীচে জিহ্বা। এগুলোর ধারাবাহিক বিশ্লেষণের পূর্বে গলকক্ষের উপরিভাগে কোমল বা পশ্চাত্তালু সংলগ্ন জিহ্বার মতো দোলায়মান অংশটুকুর পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এটিই uvula, আলজিহ্বা বা উপজিহ্বা। আমাদের ভাষায় ধ্বনি সৃষ্টিতে এটি নিষ্ক্রিয় হ'লেও পৃথিবীর কোনো কোনো ভাষায় এটাকে নামিয়ে এবং জিহ্বার গোড়াদিকে উঠিয়ে এ দু'য়ের সংস্পর্শে ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ডাচ্, জার্মান ও ফরাসী 'র' এ-ভাবে উচ্চারিত হয়। সেজন্য এ ভাষাগুলোর 'র' ধ্বনির নাম uvular 'র'।

গলকক্ষের ওপরে আলজিহ্বার অব্যবহিত পেছনেই নাসিকা গহ্বর। এ নাসিকা গহ্বর বাংলা ছাড়াও পৃথিবীর বহুভাষার কতকগুলো ধ্বনি উৎপাদনে সহায়তা করে। অর্থাৎ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপাদনে আলজিহ্বা সহ কোমল তালু কিছুটা ঝুলে পড়ে ব'লে সংশ্লিষ্ট বাতাস মুখবিবর দিয়ে বের না হ'য়ে নাসাপথে বের হয়। আর অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে বাতাস উভয় পথে বের হয় ব'লে তারা মুখ ও নাকের যোজনা লাভ করে। নাক আপাতদৃষ্টিতে শুধু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিপোষক হ'লেও বাক্-প্রত্যঙ্গও যে বটে এ থেকে তা বেশ বোঝা যায়।

এবারে মুখের উপরিভাগের বর্ণনা করা যাক। প্রথমেই আসে ওপরের ঠোঁটের কথা। ওপরের ঠোঁটের পেছনেই ওপর-পাটি দাঁত। দাঁতের মাড়ি। ইংরেজিতে দাঁতের মাড়ির নাম দেওয়া হয়েছে teeth-ridge ; লাটিনে alveolum ; তা থেকে বিশেষণ করা হয়েছে alveolar। বিশুদ্ধ বাংলায় দাঁতের মাড়ির নাম দন্তমূল। বিশেষণে দন্তমূলীয়। সূক্ষ্ম ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচারের জন্য ওপর-পাটি দাঁতের শেষাংশ ও দন্তমূলের মাঝামাঝি অংশকে pre-alveolar বা অগ্রদন্তমূলীয়, সরাসরি দন্তমূলকে দন্তমূলীয় (alveolar) এবং দন্তমূলের সামান্য পেছনে এবং তালুর আরম্ভ স্থানকে post-alveolar বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয়, কিংবা pre-palatal বা অগ্রতালব্য ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়। দাঁত ও তালুর মাঝখানে উত্তল (convex) অংশই দন্তমূল. জিভের ডগা দিয়ে এ অংশটুকুকে বিশেষভাবে অনুভব করা যায়।

উত্তল অংশের পরের ধনুকাকৃতি অবতল (concave) অংশ সবটুকুই ওপরের তালু। ধ্বনির সূক্ষ্ম বিচারের জন্যে ওপরের তালুকেও দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। দন্তমূলের শেষাংশ থেকে ভেতরের দিকে যেতে অস্থিময় অংশ যেখানে শেষ হয়েছে সেটুকুর নাম শক্ত তালু (hard palate)। শক্ততালুর সবটুকুই অস্থিময় ব'লে তা নমনক্ষম প্রত্যঙ্গাদির মতো নয়; তা স্থির। ধ্বনির চুল-চেরা বিশ্লেষণের জন্য শক্ত তালুকেও কয়েকভাবে ভাগ করা হয়েছে। পশ্চাৎ দন্তমূল (post alveolar) অংশ থেকে শক্ত তালুর আরম্ভ; এজন্যে এ অংশটুকুকে pre-palate বা অগ্রতালু বলা হয়ে থাকে। তার বিশেষণে পাই pre-palatal অগ্রতালব্য বা অগ্রতালুজাত। তার পরেই শক্ততালুর mid-palate বা মধ্যতালু, বিশেষণে mid-palatal—মধ্যতালুজাত বা মধ্যতালব্য। এর পরে post-palate তথা শক্ত তালুর শেষাংশ বা মূর্ধা, যা থেকে বিশেষণ পাই মূর্ধন্য—cerebral, cacuminal ইত্যাদি।

তালুর অস্থি সমন্বিত অংশ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় মাংসল অংশ। তালুর অস্থিপ্রধান অংশের শেষ থেকে আলজিহ্বা পর্যন্ত প্রসৃত অংশের সবটুকুই কোমল তালু (soft-palate)-র অংশীভূত। শক্ততালু বা সম্মুখ তালুর পশ্চাদ্বর্তী অংশটুকুকে পশ্চাত্তালুও বলা হয়। পশ্চাত্তালুর গঠন মাংসল ব'লে শ্বাসবায়ুর চাপে তা কিছুটা ওঠানামা করে। সেজন্যে এ অংশটি নমনীয়। এ কারণেই পশ্চাত্তালু বাগ্‌ধ্বনির গঠন প্রকৃতিতে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ধ্বনির সূক্ষ্মবিচারে পশ্চাত্তালুকেও সম্মুখ ও পশ্চাৎ এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

এরপরে মুখগহ্বরের নীচের ভাগের বিশ্লেষণ করতে হয়। প্রথমেই অধর বা নীচের ঠোঁট চোখে পড়ে। তারপর নীচেরপাটি দাঁত। তার পরেই জিহ্বার অগ্রভাগ বা মুখ গহ্বরের সবচেয়ে বেশী নমনশীল (pliable) অংশ জিভের ডগা (Tongue tip)। জিভের ডগা সংলগ্ন আধ ইঞ্চি পরিমাণ পেছনের অংশ জিভের পাতা (blade)। জিভের পাতার শেষাংশ থেকে ভেতরের দিকের মূর্ধা বরাবর অংশটি জিহ্বাগ্র (Front of tongue), সহজ কথায় জিভের সামনের ভাগ। মূর্ধার সীমানা থেকে পশ্চাত্তালু ও আলজিহ্বার সংযোগস্থলের সীমানা বরাবর জিহ্বার এ অংশটি পশ্চাৎ জিহ্বা (Back of tongue)। একেও সুবিধানুযায়ী পশ্চাৎ জিহ্বার সম্মুখ ও পশ্চাৎ জিহ্বার পশ্চাদ্ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। তারপরেই ভেতরের দিকে আরও একটু এগিয়ে গেলেই tongue root বা জিহ্বামূল পাই। জিহ্বামূলের সঙ্গে বায়ুনালীর মুখাবরক epiglottis বা অধিজিহ্বার স্থান।

কৌতূহলী ছাত্র ছাত্রীরা যে কোনো Medical College-এর Anatomy বিভাগে গিয়ে ফুসফুস থেকে শুরু করে ঠোঁট পর্যন্ত বাক্-প্রত্যঙ্গাদি সংক্রান্ত মুখবিবর ও গলনালীর মডেল দেখে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারে। সে রকম সুযোগ না থাকলে, উচ্চে অবস্থিত কোনো বাতির পয়েন্টের নীচে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ভালো আয়না হাতে নিয়ে মুখ হাঁ ক'রে বাতির ছটা আয়নার সাহায্যে মুখের মধ্যে প্রতিফলিত ক'রে মুখগহ্বরের বাক্-প্রত্যঙ্গগুলো সুস্পষ্টভাবে দেখা যেতে পারে।

বাক্-প্রত্যঙ্গের যে কোনো একটির সাহায্যে কোনো ধ্বনিই উৎপন্ন হয় না। ফুসফুস-তাড়িত বাতাস গলনালী ও মুখবিবর কিংবা নাসাপথ দিয়ে বের হয়ে যেতে লেগে (কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে শ্বাস-গ্রহণের সময় ভেতরে ঢুকতে লেগে) এ অঙ্গগুলোর কোনো জায়গায় হয় আটকে গিয়ে, কিংবা বায়ুপথ সংকীর্ণ হবার ফলে চাপা খেয়ে বিচিত্র ধ্বনি উৎপাদন করে। অর্থাৎ যে কোনো একটি ধ্বনি উচ্চারণের জন্য মুখ গহ্বরের ওপরের বা নীচের এ রকম দুটো বিশিষ্ট বা নির্দিষ্ট অংশ জড়িত হ'য়ে যায়। সে রকম ক্ষেত্রে ধ্বনি বিশেষের উচ্চারণের জন্য এ দুটো নির্দিষ্ট বাক্-প্রত্যঙ্গকে আমরা articulator বা উচ্চারক ব'লতে পারি। ওপরে যে বাক্-প্রত্যঙ্গগুলোর বর্ণনা করা হ'য়েছে পৃথিবীর কোনো না কোনো ভাষার ধ্বনি উচ্চারণে তার সবগুলিই ব্যবহৃত হয়। ভাষার ধ্বনি গঠনে পৃথিবীব্যাপী এ সার্বজনীনতাটুকু লক্ষ করা যায়, কিন্তু যে কোনো একটি ভাষার ধ্বনির উচ্চারণে নির্দিষ্ট কয়েকটি বাক-প্রত্যঙ্গই ব্যবহৃত হয়, সবগুলোর প্রয়োজন হয় না।

কোন্ কোন্ বাক্-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কোন্ কোন্ ধ্বনি উচ্চারণ করা যায় এবং সে সব ধ্বনিকে মোটামুটি কি নামে অভিহিত করা যায়, নিয়ে তার একটি তালিকা দেওয়া গেলো :

১। (ক) দুই ঠোঁট বন্ধ ক'রে কিংবা (খ) নীচের ঠোঁট ওপরের ঠোঁটের দিকে উঁচু করার ফলে বায়ুপথের সংকীর্ণতা জনিত যে ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলিকে বলা হয় bilabial বা ওষ্ঠ্যধ্বনি। উদাহরণ—আমাদের প-বর্গীয় ধ্বনি,… এবং ইংরেজী [w]।

২। নীচের ঠোঁট উপরের পাটি দাঁতের দিকে উঁচু করার ফলে বায়ুপথের সংকীর্ণতা জনিত যে ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলো labio-dental বা দন্তৌষ্ঠ্য ধ্বনি। উদাহরণ—ইংরেজী [f, v] ইত্যাদি।

৩। জিহ্বাগ্রভাগ জাত (apical)—ওপর পাটি দাঁতের সঙ্গে জিভের ডগা লাগিয়ে যে সব ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলো dental বা দন্ত্য। উদাহরণ—বাংলা 'ত', 'থ', 'দ', 'ধ'। আর জিভের ডগা দুপাটি দাঁতের মাঝে স্থাপন করার ফলে যে সব ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলো inter dental বা অন্তর্দন্ত্য ধ্বনি। উদাহরণ—ইংরেজী th ; the।

৪। জিভের ডগা ওপরের পাটি দাঁতের গোড়া বা দন্তমূল স্পর্শ করার জন্যে যে সব ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলো alveolar বা দন্তমূলীয় ধ্বনি। উদাহরণ—বাংলা 'ন', 'র', 'ল' ইংরেজী [l, d, n, r, s, z]।

৫। জিভের ডগা সামান্য পালটে গিয়ে দাঁতের গোড়া স্পর্শ ক'রলে আমরা পাই alveolo-retroflex বা দন্তমূলীয়-মূর্ধন্য বা দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি। উদাহরণ—বাংলা 'ট', 'ঠ', 'ড', 'ঢ', 'ড়', 'ঢ়'।

৬। জিভের পাতা দন্তমূল স্পর্শ করলে আমরা পাই post-alveolar তথা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় ধ্বনি। উদাহরণ—বাংলা 'শ'।

৭। জিভের পাতা ও তৎসংলগ্ন সম্মুখ ভাগ পশ্চাৎ দন্তমূল তথা অগ্রতালুকে চেপ্টা ভাবে স্পর্শ করলে পাওয়া যাবে অগ্রতালব্য [pre-palatal] বা প্রশস্ত দন্তমূলীয় [dorso-alveolar] ধ্বনি। উদাহরণ—বাংলা 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ'।

৮। পশ্চাৎ জিহ্বা কোমল তালুকে স্পর্শ ক'রলে পাওয়া যায়, জিহ্বামূলীয়, পশ্চাত্তালুজাত বা কোমলতালুজাত (velar) ধ্বনি। উদাহরণ—বাংলা 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ', 'ঙ'।

৯। আলজিহ্বা ও পশ্চাৎ জিহ্বার সংস্পর্শে যে ধ্বনি পাওয়া যায়, সেগুলো আলজিহ্বা বা uvular ধ্বনি। উদাহরণ—ফরাসী, জার্মান [র]।

১০। জিহ্বার গোড়ালির সংকোচনের ফলে গলকক্ষে বায়ুপথের সংকীর্ণতাজনিত যে ধ্বনি সৃষ্টি হয়, সেগুলো pharyngeal, গলনালীয় বা গলকক্ষীয় ধ্বনি।

১১। স্বরযন্ত্রের মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীদ্বয়ের সংস্পর্শজাত ধ্বনির নাম দেওয়া হয় glottal, laryngeal, আন্তঃস্বরযন্ত্রজাত তথা স্বরযন্ত্র-মধ্যবর্তী পথজাত কিংবা নিছক guttural* বা কণ্ঠমূলীয়। উদাহরণ—বাংলা [হ, ঃ]।

---

* of these terms only one is questioned today : "gutturals" and its transliteration in the modern languages.……'gutterals' or 'throat-sound' would be physiologically correct for 'h' the glottal stop, and the sound of whispering for these sounds are

যে কোনো ভাষায় কোনো একটি বিশেষ ধ্বনি উচ্চারণে কমপক্ষে দু'টি নির্দিষ্ট articulator বা উচ্চারকের প্রয়োজন হয়। ধ্বনি পৃথক ভাবে উচ্চারণ করার সময়ও একথা যেমন সত্য, অবিরল কথাবার্তা ব'লতেও একথা তেমনি প্রযোজ্য। তবু বাক্য অসংলগ্ন কোনো একটি ধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা যত সহজসাধ্য, বাক্যের ভেতরকার অবিরাম ধ্বনিস্রোতের অন্তর্বর্তী ধ্বনিগুলোর ভেতর থেকে কোনো একটি ধ্বনির উচ্চারণ প্রক্রিয়া নির্ণয় করা ততটা সহজ নয়। অবশ্য তখনও বাক্যের ভেতরকার এ ধরনের একটি বিশেষ ধ্বনির উচ্চারণে দু'টি বিশেষ উচ্চারকই ক্রিয়াশীল থাকে, তথাপি ধ্বনিতে ধ্বনিতে পারস্পরিক আসক্তি ও বহুবিধ সংক্রমণের ফলে উচ্চারক বিশেষের পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন মাংসপেশীর সক্রিয়তায় সেখানে অবর্ণনীয় ও অপরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব না হ'য়ে পারে না। এ হেন বাকস্রোতোধারায় বিভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণে মানুষের সংশ্লিষ্ট বাক্ প্রত্যঙ্গের অতিরিক্ত তার শিক্ষাদীক্ষা, জন্মগত রুচি ও পরিবেশ-পালিত সমগ্র ব্যক্তিত্বই জড়িত হয়ে পড়ে। বাক্স্রোতের মধ্যস্থিত একটি ধ্বনি উচ্চারণে দু'টি বিশেষ উচ্চারক সক্রিয় হলেও বাক্-প্রবাহের ধ্বনিস্রোত উৎসারণে ব্যক্তি-মানুষের সমগ্র সত্তাই এমনি ভাবে তরঙ্গায়িত হ'য়ে ওঠে।

---

actually produced in the throat (Lat. guttur—Keble)—more exactly in larynx, when they are properly called laryngeals. (Jethro Bithell, German pronunciation and phonology, p. 59)

ছন্দ ও আবৃত্তি*

এক

আবৃত্তিকারকে কি ছন্দ জানতে হবে? যদি জানতে হয় তবে সেই জানাটা হবে কেমন? কবির ছন্দবোধ না ছান্দসিকের ছন্দজ্ঞান কোনটার প্রয়োজন? প্রশ্ন উঠতে পারে আবৃত্তিকারের ছন্দজ্ঞান প্রয়োজনীয় কেন? নিভৃতে যখন কোনো কাব্যরসিক কবিতাপাঠ করেন, তার বেলায় তো এই প্রশ্ন উঠছে না। ওঠে না, তার কারণ ব্যক্তিগতভাবে কবিতাপাঠের থেকে আনুষ্ঠানিক আবৃত্তি সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। নিভৃতে কবিতাপাঠক তাঁর ভালোলাগার আস্বাদন, হয় নিজের মধ্যে নয় বন্ধুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। কিন্তু কবিতা জন-সমাবেশে আবৃত্তি করা হয় কেন? অরুণ মিত্রের কথায় 'তার সহজ ও স্বাভাবিক কারণ তো এই যে, কোনো কবিতা পাঠকের ভালো লেগেছে বলে তিনি সেই ভালো-লাগাটা অন্যদের অনুভব করাতে চান। অর্থাৎ কবিতার যে ভাব বা বক্তব্য তাঁকে নাড়িয়েছে সেইটা তিনি অন্যের মনে পৌঁছে দিতে চান।' এ কারণেই 'বৃহৎ জনসমষ্টির সামনে Performance হিসাবে কবিতা পড়তে হলে তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার।...মূলত এই প্রস্তুতি, এই প্রশিক্ষণ, আনুষঙ্গিকের এই গুরুত্ব কবিতাপাঠের প্রকৃতি বদলে দেয়, কবিতার অবলম্বনে সৃষ্টি হয় এক বিশেষ শিল্পরূপ।...Performing art-এর বৈশিষ্ট্যই তাই।'

প্রায় তিরিশ বছর যাবৎ আমরা বলছি, শুনছি, জীবনানন্দের প্রবাদ-প্রতিম বাণী 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি।' কিন্তু যে প্রবন্ধে আছে তাঁর এই প্রগাঢ় উচ্চারণ, সে প্রবন্ধেই তিনি বলেছিলেন 'স্বাদহীন' আরো একটি কথা: 'কবিতা সকলের জন্য নয়'। যে কারণে তাঁর চিন্তায় সকলেই কবি নয়, যে-কারণে কবিরাও সব সময় 'কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদন' পান না, সে সব সময় তাঁদেরও লিপতে হয়

* এই অধ্যায়টি দে'জ পাবলিশিং-এর সম্পাদনা বিভাগ কর্তৃক সংকলিত।
—সম্পাদক।

নিছক 'শব্দ', হয়তো বলা যায় সেইসব কারণেই 'কবিতা সকলের জন্য নয়।'

'Poeta nascitur, nonfit'—অর্থাৎ কবিরা কবি হয়ে জন্মান, তাঁদের তৈরি করে তোলা যায় না। জীবনানন্দের বিশ্বাস ছিল না এই ধারণায়, সায় ছিল না। জীবনানন্দের কথাতেই পাই কবিতা বা 'সম্যক কল্পনা-আভা কোথা থেকে আসে? কেউ কেউ বলেন পরমেশ্বরের কাছ থেকে। সে কথা যদি স্বীকার করি তাহলে একটি সুন্দর জটিল পাককে যেন হীরের ছুরি দিয়ে কেটে ফেললাম।'

অর্থাৎ কবিতা নিছক দৈবীশক্তিজাত 'সম্যক কল্পনা আভা' নয়। যাঁরা কবি তাঁদের 'হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে...নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।' কবিকে অনুভব করতে হয়েছে যে, 'খণ্ড বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃত্যুত্তম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়—একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন জ্বলে ওঠে হৃদয়' আর ঠিক তখন-ই 'ধীরে ধীরে কবিতা জননের প্রতিভা ও আস্বাদন' পান কবি। ঠিক এ-সময়েই, অর্থাৎ—

> কবি যখন ভাবাক্রান্ত হন তখন চোখ তাঁর ছবি দেখে, কান শোনে ছন্দ এবং চোখও অনুভব করে যেন ছন্দবিদ্যুৎ; কোন ছন্দে কবিতাটি রচিত হবে মুহূর্তের ভিতরেই নির্ণীত হয়ে যায় অনেক সময়, কারণ যে কোনো আবেগ যে কোনো ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না, কবিপ্রেরণার তারতম্য অনুসারে ছন্দের জাতি নির্ণয় হয়। ["কবিতার আত্মা ও শরীর" 'কবিতার কথা', জীবনানন্দ দাশ।]

আবৃত্তি শিল্পীকে কেন ছন্দ জানতে হবে—এ প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি জীবনানন্দের কাছ থেকেই। আর আবৃত্তিশিল্পীতো কাব্যানুরাগী, তিনি তাঁর 'ভালোলাগাটা অনুভব করতে চান'। যখন ভাবাক্রান্ত কবির কানে শোনা ছন্দ, চোখে দেখা ছন্দবিদ্যুৎ স্থির করে দেয় কোন্ আবেগ কোন্ ছন্দের রূপ পরিগ্রহ করবে, তখন আবৃত্তি-শিল্পীকেও ছন্দ জানতেই হবে।

কিন্তু এই 'ছন্দ জানা'টা হবে কেমন? প্রায় কুড়ি বছর আগে শঙ্খ ঘোষ অন্য এক প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলে আলোচনা করে-ছিলেন। তাঁর সেই প্রশ্ন ও আলোচনা অনুধাবন করতে পারলে আমরা বোধহয় পেয়ে যাবো আমাদের প্রশ্ন, আবৃত্তি-শিল্পীযশপ্রার্থীকে কেমনভাবে ছন্দ জানতে হবে, তার উত্তর।

কবিকে কি ছন্দ জানতে হবে যেমনভাবে জানেন সেনসুবেরি বা প্রবোধচন্দ্র

লেন ?…কবিতার সুর বুঝবার জন্য যেমন ছন্দের তত্ত্ব অথবা তথ্য-জ্ঞান অত্যাবশ্যক নয়, কবিও তেমনি না জানতে পারেন ছন্দ-বিশ্লেষণের সমস্ত ধরন। জানলে ভালো; কিন্তু জানলেও দেখি কবির ছন্দ-ভাবনা আর ছান্দসিকের ভাবনা চলে ঈষৎ পৃথক পথে, কেননা কবি রচনার ভিতর-অভিজ্ঞতা থেকে জানেন সমস্ত ব্যাপারটা।…

কবির ছন্দ-জানা তাহলেই অনেকটাই শ্রুতিনির্ভর, কোনো কোনো সময়ে হয়তো অশিক্ষিতপটুত্ব। এখানেই বিপদসম্ভাবনার সূত্রপাত। যদি দেখা যায় এই পটুতা তাঁকে স্থির নির্দিষ্ট ছন্দকাঠামোর অন্তর্বর্তী ক'রে রাখছে, তাহলে কবি আর পাঠকের বোধে বিরোধ ঘটে না বড়ো, কিন্তু কবি যদি মনে করেন তিনি এর বাইরে আরো কোনো ধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন, কাঠামোর বাইরে দাঁড়িয়ে ? যদি তাঁর মনে হয় যে প্রচলিত নিরূপিত ছকটিকে ভেঙে দেবার দরকার হচ্ছে কিছু ? পাঠক তাঁকে দেবেন না সেই স্বাধীনতা ? ছন্দের বিশৃঙ্খলা নয়, কিন্তু ছন্দের প্রসারণ কি চাইবেন না কবি ? পাঠকের রায় চিরাচরিতের পক্ষে, অভ্যাসের অনুকূলে, কেননা তা নইলে তাঁর কান সহজে খুশি হয় না। তখন হয়তো ঈষৎ-বিরক্ত ঈষৎ-অভিমানী ভাবে আপনারা বলবেন, লরেন্সের ধরনে, 'Well 'I don't write for your ears' !

আধুনিক কবির পক্ষে একথা ভুলে থাকা সম্ভব নয় যে ছন্দের সমস্যা আসলে ব্যক্তিত্বেরই সমস্যা, সে তো কেবল ছান্দসিকের শুকনো পুঁথি নয়। ব্যক্তিরই মুক্তির জন্য ছন্দের ক্রম-উন্মোচনের প্রয়োজন ঘটে, দরকার করে তার অনড় চলৎশক্তিহীনতার বাইরে বেরিয়ে আসা। কবি তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আমিটিকে 'কারো জন্য কোনো মার্জিন না রেখে' (যেমন একটি চিঠিতে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ) ছড়িয়ে দিতে চান, তার ব্যক্তিগত স্পন্দনকে সঞ্চারিত করতে চান ছন্দশরীরে। এই সঞ্চারের জন্যই কখনো কখনো মুক্তি খোঁজেন কবি।

কিন্তু মুক্তি মানে তো যা-খুশির অবহেলা নয়। যার ব্যক্তিত্বই প্রস্তুত নয় সে কেমন ক'রে জানবে কাকে বলে মুক্তি ? কীই-বা মুক্তিপণ ? ছন্দকেও গ'ড়ে তুলতে পারলে তবেই তাকে ভাঙা যায়, গড়তে যিনি জানেন না ভাঙবার কোনো অধিকারও তাঁর নেই। তখন কবিকে মনে রাখতে হয় যে বাইরে ছড়ানো উপাদান উপকরণের সঙ্গে প্রতিনিয়ত তাঁর যুদ্ধ, এক-একটি কবিতা লেখা অনেক বিরূপতার মধ্য দিয়ে এক-একটি যুদ্ধের সমাপন। 'ছিলাম বাসনালঘু, ছন্দ এসে আমাকে সংযমী হতে বলে' : এই

পয়ারবর্গের জন্য যদিও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'বয়স্ক' ব'লে তর্জন করেন ছন্দকে, তবু তাকে ছাড়তেও পারেন না, ছাড়েন শুধু তার অনায়াস-স্বচ্ছন্দতা। যদি বলা যায়, ছন্দে লিখব না কেবল এই জন্যে যে ছন্দোহীন লিখতে পারলেই অনেক খোলা ভাবে কবিতা লিখতে পারি, তাহলে বুঝতে হবে আপনি আর লড়াইয়ের মধ্যে নেই, আপনি পালিয়ে গেলেন অনেক আত্মপরীক্ষার দায় এড়িয়ে। ["ছন্দোহীন সাম্প্রতিক," 'নিঃশব্দের তর্জনী,' শঙ্খ ঘোষ।]

আধুনিক কবিকে তাহলে ছন্দ জানতেই হচ্ছে, কবিতায় ছন্দকে ভাঙবার জন্যই। শঙ্খ ঘোষের ভাষায় :

কবিতায় ছন্দকে তাই ভাঙতে হয় ছন্দেরই প্রয়োজনে। ভালো লাগাবার জন্যেই ভালো লাগাবার নেশাটাকে ছুটিয়ে দিতে হয়। সম্পূর্ণকে স্থির লক্ষ্যে রেখে তারপর তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙে দেবার মধ্যে একটা সফলতার গৌরব আছে। [ঐ]

এই প্রবন্ধ লেখার দু'বছর আগে ১৩৭৪তে তিনি লিখেছিলেন তাঁর 'ছন্দ নিরূপিত ও ব্যক্তিগত' প্রবন্ধটি। 'ছন্দ জানা'র অর্থ বুঝতে প্রবন্ধটি আমাদের সাহায্য করবে। কারণ 'ছন্দ জানা' বলতে আমরা সাধারণ ভাবে বুঝি ছন্দশাস্ত্র বা ছন্দবিজ্ঞান জানা। কিন্তু এই ছন্দবিজ্ঞান জানাটাই বোধহয় চূড়ান্ত নয়। শঙ্খ ঘোষের ভাষায় 'সর্বস্বীকৃত পরিমিত পুঁথিগত রূপ' হচ্ছে ছন্দশাস্ত্র। এই ছন্দ তাঁর ভাষায় 'নিরূপিত' ছন্দ। যেমন :

বাইরের কাঠামো থেকে কবির অভিপ্রেত পাঠ্য ধরন বিষয়ে সব সময়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। কবির স্বকণ্ঠে আবৃত্তি তাই তার অর্থবোধেও যেমন আমাদের খানিকটা সাহায্য করে, তেমনি সহজতর হয় তার প্রচ্ছন্ন ছন্দ-রূপের আবিষ্কার, কবিকণ্ঠে যাঁরা 'বীরপুরুষ' অথবা 'ব্রাহ্মণ' কবিতার রেকর্ড শুনেছেন, তাঁরা মনে করতে পারবেন যে সর্বভাগের বিধিমতো কৌশল সেখানে সূচনায় খানিকটা নিরর্থক হয়ে যায়। 'মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে', দ্রুত এই কাটা-কাটা শব্দগুলি সূত্রপাতে যেন ধাবিত হয়ে আসে। পাঠানুগ ছন্দ-রূপ তৈরি করলে প্রথম লাইন দু'টি হবে এরকম : 'মনে করো যেন/ বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে/যাচ্ছি অনেক/দূরে।' কিন্তু ছন্দের প্রচলিত নিয়মে সবাই জানি এর কাঠামোটা এই, 'মনে করো/যেন বিদেশ/ঘুরে/মাকে নিয়ে/ যাচ্ছি অনেক/দূরে।' অথবা 'ব্রাহ্মণে'র প্রথম লাইনেই 'সন্ধ্যা নিয়মে

প্রদীপ নিবেছে সবে' এর ছ' মাত্রায় চল্তি ধরনটা ভেঙে যায়, কবির গলায় হয়ে দাঁড়ায় যেন তিন মাত্রায় পর্ব : 'শয়ন/শিয়রে/প্রদীপ/নিবেছে/সবে' (এখানে স্মরণীয় যে ছ'মাত্রায় ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলতেনও তিন মাত্রার)। অর্থাৎ পুঁথিগত পরিভাষায় বলা যায় যে প্রতি পর্বার্ধে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আসেন পর্বের টান, ফলে এই তাঁর বিশেষ ছন্দকে শোনায় যেন পৃথক কোনো চালের অন্তর্গত।

অর্থের বিবেচনায় 'মনে করো/যেন বিদেশ/ঘুরে' রূপের চেয়ে 'মনে করো যেন/বিদেশ ঘুরে' সার্থক, সংগত। কিন্তু ছন্দোবিজ্ঞানীর পক্ষে সেকথা বলার উপায় নেই কোনো। ছন্দোবিজ্ঞানী কঙ্কালবিলাসী, তাঁকে তাই কাঠামো মাত্র জেনে নিতে হয়। ['ছন্দ : নিরূপিত ও ব্যক্তিগত', 'নিঃশব্দের তর্জনী'।]

কবিকণ্ঠের এই পাঠের ছন্দকে তিনি বলেছেন 'ব্যক্তিগত' ছন্দ। এবং তাঁর সিদ্ধান্ত 'বাঙলা ছন্দের একটা মুক্তিপথ হয়তো এই ব্যক্তিগত ছন্দের প্রবর্তনায়' ...এবং এই ব্যক্তিগত ছন্দ 'কণ্ঠরূপ থেকে ছন্দ-রূপ পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া দরকার।'

এখন আমরা বলতে পারি আবৃত্তি-শিক্ষার্থীকে জানতেই হবে 'নিরূপিত' ছন্দ বা ছন্দবিজ্ঞান। কিন্তু সে জানাটাই তাঁর কাছে চূড়ান্ত হবে না। কবির অভিপ্রায়কে বুঝতে, ছন্দকে বুঝতে হলে ছন্দশাস্ত্রের পুঁথিগত জ্ঞানটা তাঁর কাব্যবোধের সঙ্গে মিলিত হয়ে ধরতে সাহায্য করবে যখন কোনো কবি প্রচলিত ছন্দ-রূপকে ভাঙছেন, গড়ছেন তাঁর নিজস্ব 'ব্যক্তিগত ছন্দ'। কারণ, আধুনিক কবির কাছে 'ছন্দের সমস্যা আসলে ব্যক্তিত্বেরই সমস্যা'। অবশ্যই আবৃত্তিশিল্পীর কবিতাপাঠ সর্বদাই যে কবির অভিপ্রায় মেনে চলবে এমন কোনো ফতোয়া জারি করা চলে না। কিন্তু আবৃত্তিশিল্পীকে অবশ্যই বুঝতে হবে কবির অভিপ্রায়। 'ভাবাক্রান্ত' কবির আবেগ কোন্ ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করেছে, সে-ছন্দের শারীর-সংস্থান এবং নিরূপিত ছন্দ থেকে কেন ও কোথায় কবি সরে এসেছেন সে সম্বন্ধে আবৃত্তিশিল্পীর তাই প্রয়োজন স্বচ্ছ উপলব্ধি। এই হচ্ছে আবৃত্তি-শিল্পীর 'ছন্দ-জানা'র অর্থ। 'কঙ্কালবিলাসী ছান্দসিকের' 'কাছে পাঠ নিতেই হবে তাঁকে তাঁর প্রস্তুতি-পর্বে।

দুই

আবৃত্তি শিক্ষার্থীদের ছন্দ-পাঠের প্রাথমিক পরিচয়ের জন্য এই অংশটি সংকলিত হলো। আগ্রহী আবৃত্তি-শিক্ষার্থী কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কবিতার ক্লাস' থেকে প্রথম পাঠ নিলে উপকৃত হবেন। এরপর পড়া দরকার অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ছন্দ-সোপান', এবং অধ্যাপক নীলরতন সেনের 'আধুনিক বাংলা ছন্দ'-এর প্রথম পর্ব। তারপর প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ,' 'ছন্দ-পরিক্রমা' (নূতন) প্রথম খণ্ড, রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ', অধ্যাপক নীলরতন সেনের 'বাংলা ছন্দবিবর্তনের ধারা', কবি শঙ্খ ঘোষের 'ছন্দের বারান্দা'। এ-কটি বই অবশ্য-পাঠ্য।

বাংলা ছন্দ রচনার তিন রীতি

এই তিন রীতির নাম (১) মিশ্রকলা বৃত্ত বা অক্ষর বৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দ। (২) কলা বৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। (৩) দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ।

এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে নামকরণ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু জরুরি তথ্য জানানো প্রয়োজন। মিশ্রকলাবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত—এই তিন রীতির নাম তৈরি করেছেন প্রবোধচন্দ্র। তিনি অবশ্য তারও বহু আগে এই তিন রীতির নামকরণ করেছিলেন অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। কিন্তু এই নামকরণের মধ্য দিয়ে ছন্দের যথার্থ পরিচয় প্রকাশিত হচ্ছে না—বিচার করে তিনি এই নাম তিনটি প্রত্যাহার করে, নতুন নাম দেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁর পুরনো নামকরণই প্রচলিত রয়ে গেছে। এ নিয়ে প্রবোধচন্দ্রের ক্ষোভও সংগত। নীরেন্দ্রনাথ তাঁর 'কবিতার ক্লাস'-এ প্রবোধচন্দ্রকে অনুসরণ করেই জিজ্ঞাসু পড়ুয়াদের ছন্দের পাঠ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি প্রবোধচন্দ্রের পুরনো নামই ব্যবহার করেছেন। শেষ নামগুলি অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের তৈরি। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে প্রবোধচন্দ্রের নতুন নামই গ্রহণযোগ্য।

এই তিন ছন্দরীতির রূপ ও রীতি জানতে হলে প্রয়োজনীয় পরিভাষার সঙ্গে পরিচয় দরকার। প্রথমে এরকম কিছু জরুরি পরিভাষার পরিচয় সংকলিত করা হচ্ছে—বাংলা ছন্দশাস্ত্রের আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ছন্দ-সোপান' গ্রন্থ থেকে।

প্রস্বর ও যতি

প্রবোধচন্দ্রের ভাষায় "বাংলা কবিতার ছন্দোবদ্ধ ভাষা আমাদের উচ্চারণে স্বতঃই কতকগুলি সুপরিমিত ও সমায়তন ধ্বনিগুচ্ছে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক ধ্বনিগুচ্ছের প্রথমে থাকে একটি ঝোঁক, আর তারপরে থাকে উচ্চারণ-বিরতি। ছন্দের পরিভাষায় এই ঝোঁককে বলি প্রস্বর (stress), আর উক্ত উচ্চারণ বিরতিকে বলি যতি (pause)।"

যতির তারতম্য ও যতিবিভাগ

তারতম্য-ভেদে অর্থাৎ গুরুত্ব বা স্পষ্টতা-ভেদে যতি পাঁচ প্রকার : পূর্ণযতি, অর্ধযতি, লঘুযতি, উপযতি ও অণুযতি। যেমন -

মা. থা : তু. লে | তু. মি : দ. বে ॥ চ. ল : ত. ব | র. থে।

সা. হি : দে. র | কো. থা : আ. মি ॥ কি. রি : প. থে | প. থে ॥

১। একটু মন দিয়ে পড়ে গেলে বোঝা যাবে, 'মাথা…রথে' এই সমগ্র ধ্বনি-বিভাগটির পরে আসে উচ্চারণের পূর্ণবিরতি। ছন্দের পরিভাষায় এই উচ্চারণগত পূর্ণবিরতিকে বলা হয় পূর্ণযতি। বাংলা কবিতায় প্রচলিত এক দাঁড়ি (।) ও দুই দাঁড়ি (॥) চিহ্ন পূর্ণযতির পরিচায়ক।

ছন্দোবদ্ধ ভাষার পূর্ণযতি-সূচিত বিভাগকে বলা হয় পঙ্‌ক্তি (verse, metrical line)। উপরের দৃষ্টান্তে পঙ্‌ক্তি আছে দুটি।

২। 'মাথা…দবে' এবং 'চল…রথে', এই দুই ধ্বনিবিভাগের মধ্যবর্তী উচ্চারণ-বিরতির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। এ-রকম যতিকে বলি অর্ধযতি। দীর্ঘ দ্বিদণ্ড (॥) চিহ্ন অর্ধযতির পরিচায়ক।

অর্ধযতির দ্বারা বিভক্ত পঙ্‌ক্তিখণ্ডের পারিভাষিক নাম পদ (clause, division)। অনেক ছোট পঙ্‌ক্তিতে অর্ধযতি থাকে না। এ-রকম অর্ধযতিহীন ছোট পঙ্‌ক্তিকে বলা হয় একপদী। আর, একটি অর্ধযতির দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত পঙ্‌ক্তিকে বলা হয় দ্বিপদী। উপরে দেওয়া দৃষ্টান্তের দুটি পঙ্‌ক্তিই দ্বিপদী। তেমনি দুটি অর্ধযতির দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত পঙ্‌ক্তিকে বলা হয় ত্রিপদী, আর তিনটি অর্ধযতির দ্বারা চারভাগে বিভক্ত পঙ্‌ক্তিকে বলা হয় চৌপদী।

পঙ্‌ক্তির একপদী, দ্বিপদী প্রভৃতি গঠনভেদেরই সাধারণ নাম পঙ্‌ক্তিবন্ধ বা পঙ্‌ক্তিরূপ (verse form)। আর ছন্দের রূপভেদ নিয়ন্ত্রিত হয় প্রধানতঃ পঙ্‌ক্তির বন্ধভেদের (রূপভেদের) দ্বারা। তাই একপদী, দ্বিপদী প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিবন্ধই সাধারণতঃ ছন্দোবন্ধ নামে আখ্যাত

হয়ে থাকে। ছন্দোবন্ধ আসলে ছন্দোরূপেরই নামান্তর। যেমন, ত্রিপদী পঙ্‌ক্তির রচনাকেই বলা হয় ত্রিপদী ছন্দোবন্ধ বা ত্রিপদী বন্ধ। একপদী, দ্বিপদী প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিগঠন-সূচক বিভিন্ন বন্ধের দ্বারা প্রকাশিত হয় ছন্দের 'বহিরাকৃতি'।

৩। পদবিভাজক অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ যতির নাম লঘুযতি। যেমন—'মাথা তুলে | তুমি যবে'। দীর্ঘ একদণ্ড (|) চিহ্ন লঘুযতির পরিচায়ক।

লঘুযতির দ্বারা বিভক্ত পদখণ্ডের নাম পর্ব (foot)। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের পদেই আছে দুটি করে পর্ব। প্রতি পঙ্‌ক্তির শেষ পর্ব অপেক্ষাকৃত ছোট। এ-রকম ছোট পর্বকে বলা যায় অপূর্ণপর্ব। অন্য সবগুলিই পূর্ণপর্ব।

পূর্ণ ও অপূর্ণ সব পর্বেরই আদিতে থাকে একটি করে 'প্রস্বর'। উপরের দৃষ্টান্তে মুদ্রিত স্থূললিপিগুলি এই পর্বারম্ভসূচক প্রস্বরের পরিচায়ক। বর্তমান রচনায় আরম্ভে ছন্দের এই পর্ববিভাগই বর্ণিত হয়েছে 'সুপরিমিত ও সমায়তন ধ্বনিগুচ্ছ' বলে, আর পর্বারম্ভসূচক প্রস্বর আখ্যাত হয়েছে উক্ত ধ্বনিগুচ্ছের আদিস্থিত 'ঝোঁক' নামে।

পঙ্‌ক্তির যতিবিভাগগুলির মধ্যে পর্ব-বিভাগের গুরুত্বই সর্বাধিক। কারণ পর্বের আয়তনগত (অর্থাৎ ধ্বনিসন্নিবেশগত) সমতাই বাংলা ছন্দের প্রধানতম লক্ষণ। আর পর্বের পুনরাবর্তনের দ্বারাই গঠিত হয় ছন্দের বৃহত্তর 'পদ' বিভাগ ও বৃহত্তম 'পঙ্‌ক্তি' বিভাগ। ফলে পর্বের গঠনরীতির (ধ্বনিসন্নিবেশের) দ্বারাই নিরূপিত হয় পঙ্‌ক্তির তথা ছন্দের রচনারীতি। এইজন্য পর্বের গঠন-রীতিকেই সংক্ষেপে বলা হয় ছন্দোরীতি (verse style)। পর্বগঠন-সূচক বিভিন্ন রীতির দ্বারা প্রকাশিত হয় ছন্দের 'অন্তঃপ্রকৃতি'।

৪। পর্ববিভাজক ক্ষীণতর যতির নাম উপযতি। যেমন—'মাথা : তুলে'। দ্বিবিন্দু-দণ্ড (:) চিহ্ন উপযতির পরিচায়ক।

উপযতির দ্বারা বিভক্ত পর্বাংশের নাম উপপর্ব (subfoot)। উপরের দৃষ্টান্তে প্রত্যেক পূর্ণপর্বে আছে দুটি করে উপপর্ব। আর, শেষের দুটি অপূর্ণপর্বে আছে একটি করে উপপর্ব (হবে, পথে)।

৫। উপপর্ব খণ্ডিত হয় যে ক্ষীণতম যতির দ্বারা তার নাম অণুযতি। যেমন—'মা. থা'। একটিমাত্র বিন্দু (.) চিহ্ন অণুযতির পরিচায়ক।

অণুযতি-সূচিত ধ্বনিবিভাগের নাম দল (syllable)। উপরের দৃষ্টান্তে প্রত্যেক উপপর্বে আছে দুটি করে দল। এই দলই সমস্ত ছন্দের মৌলিক উপাদান।

উপরের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়—পূর্ণযতি, অর্ধযতি, লঘুযতি, উপযতি ও অণুযতি-কে প্রয়োজনমতো যথাক্রমে পঙ্‌ক্তিযতি, পদযতি, পর্বযতি, উপপর্বযতি এবং দলযতি নামেও নির্দেশ করা যায়।

দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি সাধারণতঃ এক ছত্রেই (অর্থাৎ এক লাইনেই) লিখিত ও মুদ্রিত হয়। তাই ছত্রের শেষে কোনো চিহ্ন না থাকলেও কিংবা কমা প্রভৃতি চিহ্ন থাকলেও ছন্দপঙ্‌ক্তি চেনা যায়।…

ছন্দের আলোচনায় দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চৌপদী পঙ্‌ক্তিকে যথাক্রমে দুই, তিন ও চার ছত্রে সাজিয়ে লেখা হলে অর্ধযতির চিহ্ন (‖) দেবার প্রয়োজনও হয় না। যেমন—

মাথা তুলে | তুমি যবে
চল তব | রথে।

অর্ধযতির চিহ্ন না থাকা সত্ত্বেও অনায়াসেই বোঝা যায়, এটা একটা দ্বিপদী পঙ্‌ক্তি। এখানে শুধু পর্ববিভাগ-সূচক লঘুযতির চিহ্নই ব্যবহৃত হয়েছে। কবিরাও অনেক সময়ে তাঁদের রচনায় ছন্দপঙ্‌ক্তি পদ-সংখ্যা অনুসারে একাধিক ছত্রে সাজিয়ে লেখেন। তাতে অর্ধযতি অনুসারে আবৃত্তি করা সহজ হয়।"

যতিলোপ

"কবিতা আবৃত্তিকালে আমাদের উচ্চারণে অনেক সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাশিত বিরতি ঘটে না। উচ্চারণের এ-রকম অ-বিরতিকে বলা হয় **যতিলোপ** বা **যতিলঙ্ঘন**। বাংলা ছন্দে উক্ত পাঁচ রকম যতিই অবস্থা-বিশেষে লুপ্ত বা লঙ্ঘিত হয়ে থাকে।"

দল

দল পরিভাষাটি প্রবোধচন্দ্রের সৃষ্টি। তাঁর ভাষায় দলের পরিচয় হচ্ছে :

"১. বাক্‌যন্ত্রের একটিমাত্র প্রয়াসে উচ্চারিত ভাষাগত ধ্বনিখণ্ডের পারিভাষিক নাম 'দল'।

২. একটিমাত্র স্বরবর্ণময় বা স্বরবর্ণাশ্রিত ধ্বনিখণ্ডের নাম 'দল'।

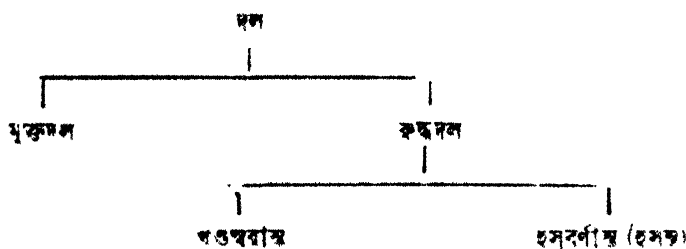
৩. ভাষাগত ধ্বনির ক্ষুদ্রতম উচ্চারণ-বিভাগের নাম 'দল'।

৪. শব্দের বা বাক্‌পর্বের (তথা ছন্দপর্বের) ক্ষীণতম যতি অর্থাৎ অণুযতি-সূচিত ধ্বনি-বিভাগের নাম 'দল'।

.. দল শব্দের মৌলিক অর্থ খণ্ড, অংশ, বিভাগ।...বাংলা ছন্দের পরিভাষায় 'দল' বলতে বোঝায় 'ধ্বনিদল' অর্থাৎ ধ্বনিখণ্ড (সিলেব্‌ল্)।

দলের মূল উপাদান স্বরবর্ণ। প্রত্যেক দলে অনধিক একটি করে স্বরবর্ণ থাকে। তাই প্রত্যেক শব্দে বা বাক্‌পর্বে (তথা ছন্দপর্বে) উচ্চারিত স্বরবর্ণের সংখ্যা যত, তার দলের সংখ্যাও তত‌ই হয়। অবশ্য ব্যঞ্জনস্পর্শহীন স্বরবর্ণও স্বতন্ত্র দল হিসাবে গণনীয়। যেমন—অসুবিধা ও একাকিনী, এই দুই শব্দেই স্বরবর্ণ আছে চারটি করে, তাই এ-দুটির দলসংখ্যাও চার। তেমনি আমাদের উচ্চারণে ঐরাবত্‌ ও ঔদরিক্‌ শব্দে স্বরবর্ণ আছে তিনটি করে। তাই এই দুই শব্দের দলসংখ্যাও তিন।"

দলের রূপভেদ আছে। এ-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা উদ্ধৃত না করে শুধু রূপভেদটাই এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :



'কোনো শব্দের বা বাক্‌পর্বের (তথা ছন্দপর্বের) দলসংখ্যা নিরূপণ করা যায় দুই উপায়ে—(১) উচ্চারণ-প্রয়াসের সংখ্যা গণনা করে অথবা (২) উচ্চারিত স্বরবর্ণের (মুক্ত বা রুদ্ধ) সংখ্যা গণনা করে। যেমন—

দুঃখ সহার। তপস্যাতেই ।। হোক বাঙালির । জয়

এই পঙ্‌ক্তির তিনটি পূর্ণপর্বেই আছে চারটি করে দল আর শেষের অপূর্ণ পর্বে একটি দল। মোট তেরো দল। তারমধ্যে রুদ্ধদল আছে সাতটি (দুঃ, হার্‌, পস্‌, তেই্‌, হোক্‌, লির্‌, জয়্‌—একটি খণ্ডস্বরান্ত ও ছয়টি হসন্ত), আর বাকি ছয়টি মুক্তদল (খ, স, ত, স্যা, বা, ঙা)।' (বলাবাহুল্য প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দসোপান' ও 'ছন্দ-পরিক্রমা'র সঙ্গে নীরেন্দ্রনাথের 'কবিতার ক্লাস' না পড়লে বিষয়টি পরিষ্কার হবে না।)

কলা।

প্রবোধচন্দ্র প্রদত্ত কলার সংজ্ঞার্থ হচ্ছে : "এক একটি হ্রস্বদল উচ্চারণকালে কণ্ঠ থেকে যতটুকু ধ্বনি নিঃসৃত হয় তাকে বলা হয় কলা (mora)। সংক্ষেপে

বলা যায়, উচ্চারিত ধ্বনির ক্ষুদ্রতম অংশের পারিভাষিক নাম 'কলা'। মুক্ত ও রুদ্ধ, উভয় প্রকার দলই অপ্রসারিত উচ্চারণে এক কলা এবং প্রসারিত উচ্চারণে দুই কলা বলে গণ্য হয়।"

মাত্রা

"যে-কোনো বস্তু পরিমাপের আদর্শ মানকে বলা হয় **মাত্রা** (unit of measure)।… বাংলায় এক রীতির ছন্দে ধ্বনি পরিমিত হয় দলসংখ্যা অনুসারে। এ-রকম মাত্রাকে বলা হয় **দলমাত্রা** (syllabic unit)। আর-এক রীতির ছন্দে ধ্বনি পরিমিত হয় কলাসংখ্যা অনুসারে। এ-রকম মাত্রাকে বলা হয় **কলামাত্রা** (moric unit)।'

বোঝা যাচ্ছে 'বাংলা ছন্দের মূলমাত্রার দুই রূপ—**দলমাত্রা** ও **কলামাত্রা**।'

আমরা জেনেছি উপযতির দ্বারা বিভক্ত পর্বাংশের নাম উপপর্ব। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন এই উপপর্বই হচ্ছে বাংলা কবিতার ছন্দ-গঠনের প্রধান অবলম্বন। আচার্য প্রবোধচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন: 'কিন্তু বাংলা ছন্দে উপপর্বের আয়তন (অর্থাৎ মাত্রাসংখ্যা) প্রায়শঃ অসমান হয়। তাই উপপর্বের পরিচয় বা সংখ্যা অনুসারে ছন্দের পরিচয় দেওয়া যায় না। পক্ষান্তরে বাংলা ছন্দে পূর্ণপর্বের আয়তন (অর্থাৎ মাত্রাসংখ্যা) প্রায় সর্বদাই সমান থাকে। বস্তুতঃ পর্বের আয়তনসমতাই বাংলা ছন্দের অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা। তাই পর্বের গঠনরীতিকেই বলা যায় ছন্দের গঠনরীতি অর্থাৎ **ছন্দোরীতি** (verse style)'।

বাংলা ছন্দে তিন রীতিতে পর্ব গঠিত হয়। আমরা এই তিন রীতির নাম জেনেছি এবং নামকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও জেনেছি। এখন সংক্ষেপে এই তিন রীতির পরিচয় জানবার চেষ্টা করবো প্রবোধচন্দ্রকেই অনুসরণ করে।

এই তিন রীতির নাম যে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে—এখন সেই পর্যায় অনুসরণ করা যাবে না। কারণ, আমরা জেনেছি 'বাংলা ছন্দের মূলমাত্রার দুই রূপ—দলমাত্রা ও কলামাত্রা।' সুতরাং দলমাত্রা থেকেই আমাদের এখন শুরু করতে হবে :

দলবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ

১। এই রীতিতে ছন্দের পর্ব গঠিত হয় কয়েকটি নির্দিষ্টসংখ্যক 'দলমাত্রা' নিয়ে। এই রীতিতে মুক্তরুদ্ধভেদে দলের উচ্চারণে সাধারণতঃ পার্থক্য হয় না, অর্থাৎ মুক্ত ও রুদ্ধ সব দলই সাধারণতঃ উচ্চারণে সমান হয়। ফলে এই

রীতিতে মুক্তরুদ্ধনির্বিশেষে সব দলই একমাত্রা বলে গণনীয় হয়। তাই এই রীতিকে বলা যায় দলমাত্রক বা দলবৃত্ত রীতি (syllabic style)।—

আজ বি. কা. লে | কো. কিল ডা কে ॥ শু. নে ম. নে | লা. গে,
বাং. লা. দে. শে ছি. লাম যে ন ॥ তিন শো ব. ছর | আ. গে।

— রবীন্দ্রনাথ, 'খেয়া', কোকিল

এটির প্রত্যেক পূর্ণপর্বে আছে চার দলমাত্রা, আর শেষের অপূর্ণ পর্বে আছে দুই দলমাত্রা। প্রতি পঙ্‌ক্তির মোট মাত্রাসংখ্যা চৌদ্দ।

এই দৃষ্টান্তের প্রতি পঙ্‌ক্তি একটি করে অর্ধযতির দ্বারা দুই পদে বিভক্ত। প্রথম পদে আট মাত্রা, দ্বিতীয় পদে ছয় মাত্রা। এ-রকম আট-ছয় মাত্রার অপূর্ণ দ্বিপদী বন্ধের প্রচলিত নাম পয়ার। কিন্তু এটিতে মাত্রা বিন্যস্ত হয়েছে দলবৃত্ত রীতিতে। তাই এই দৃষ্টান্তটিকে বলা যায় দলবৃত্ত পয়ার।

লক্ষণীয়: দলবৃত্ত রীতির ছন্দে প্রত্যেক পূর্ণপর্বের সব রুদ্ধদলই সাধারণতঃ সংকুচিত ও একমাত্রক রূপে উচ্চারিত হয়। ফলে সেসব পর্বে রুদ্ধমুক্তনির্বিশেষে সব দলের পরেই একটি করে অণুযতি সুব্যক্ত থাকে, কোথাও লুপ্ত (অব্যক্ত) হয় না। এটাই এই ছন্দোরীতির অন্যতম প্রধান বিশিষ্টতা।

মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ

২। এই রীতিতে ছন্দের পর্ব গঠিত হয় কয়েকটি নির্দিষ্টসংখ্যক 'কলামাত্রা' নিয়ে। এই রীতিতে সাধারণতঃ সমস্ত মুক্তদল উচ্চারিত হয় অপ্রসারিত রূপে আর সমস্ত রুদ্ধদল উচ্চারিত হয় প্রসারিত (বিশ্লিষ্ট) রূপে। ফলে এই রীতিতে প্রত্যেক মুক্তদলে এক কলা এবং প্রত্যেক রুদ্ধদলে দুই কলা গণনা করা হয়। তাই এই রীতিকে বলা যায় কলামাত্রক বা কলাবৃত্ত রীতি (moric style)।

হাইফেন (–) চিহ্ন রুদ্ধদলের প্রসারণ-সূচক।

বো. ঝা নি. য়ে | ম-ন্. থ-র ॥ চ. লে গো. রু ॥ গা. ড়ি,
চা. কা. গু. লো ক্র-ন্. দ-ন ॥ ক. রে ডা-ক | ছা. ড়ি।
ক-ল্. লো. লে | কো. লা. হ. লে ॥ জা. গে এ-ক ; ধ্ব. নি,
আ-ন্. দে র | ক-ণ্. ঠে-র ॥ গা-ন আ গ | ম. নী ॥

—রবীন্দ্রনাথ, 'চিত্রবিচিত্র', আগমনী

এই দৃষ্টান্তের বারোটি রুদ্ধদলই প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক (ম—ন্, থ-র্, ক্র-ন্, দ-ন্, ডা-ক্ ইত্যাদি) আর সব মুক্তদলই অপ্রসারিত ও একমাত্রক (বো, ঝা, নি,

য়ে, চ, লে ইত্যাদি)। এভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে, এটির প্রত্যেক পূর্ণপর্বে আছে চার কলামাত্রা, আর শেষের অপূর্ণ পর্বে আছে দুই কলামাত্রা। প্রতি পঙ্‌ক্তির মোট মাত্রাসংখ্যা চৌদ্দ।

এই দৃষ্টান্তেও প্রতি পঙ্‌ক্তি একটি অর্ধযতির দ্বারা আট ও ছয় মাত্রায় দুই পদে বিভক্ত। সুতরাং এটিও পয়ার। কিন্তু এটি রচিত হয়েছে কলাবৃত্ত রীতিতে। তাই এটির পূর্ণ পরিচয়-সূচক নাম **কলাবৃত্ত পয়ার।**

লক্ষণীয়: কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে রুদ্ধদল সর্বত্রই প্রসারিত ও দ্বিমাত্রিক হয়। ফলে এই রীতির ছন্দে প্রত্যেক রুদ্ধদলেই একটি করে অণুযতি লুপ্ত (অব্যক্ত) হয়ে যায়। বস্তুতঃ কলাবৃত্ত রীতির ছন্দে রুদ্ধদল (বিশেষতঃ শব্দের আদি বা মধ্য-স্থিত) যত বেশি ব্যবহৃত হয় এবং ফলে যত বেশি অণুযতি-লোপ ঘটে, তার ধ্বনিপ্রবাহও তত বেশি তরঙ্গিত হয়ে ওঠে। এই তরঙ্গিত ভঙ্গিতেই কলাবৃত্ত রীতির গৌরববৃদ্ধি হয়।

মিশ্র কলাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দ

৩। তৃতীয় রীতিটি আসলে কলাবৃত্ত রীতিরই প্রকারভেদ মাত্র। ফলে এই রীতিতেও পর্ব গঠিত হয় কয়েকটি নির্দিষ্টসংখ্যক 'কলামাত্রা' নিয়ে। তবে এই রীতিতে কলাগণনায় কিছু বিশিষ্টতা আছে। কেননা, এই রীতির ছন্দে সাধারণতঃ (১) শব্দে আদি ও মধ্য-স্থিত রুদ্ধদলের উচ্চারণ হয় সংকুচিত (সংশ্লিষ্ট) ও এককলা-পরিমিত, আর (২) শব্দের অন্তস্থিত রুদ্ধদলের উচ্চারণ হয় প্রসারিত (বিশ্লিষ্ট) ও দুইকলা-পরিমিত। তাই এই রীতিকে বলি **মিশ্র-কলাবৃত্ত** রীতি (mixed moric style), আর সংক্ষেপে বলি **মিশ্রবৃত্ত** রীতি (composite style)৷

ত্রিবিন্দু-দণ্ড (⋮) চিহ্ন পর্বযতিলোপ-সূচক।

এ দুর্. ভাগ্. গা | দে-শ্ হ. তে ॥ হে মঙ্. গ-ল্ | ম-য়্,
দূ-র্ ক. রে | দা-ও্ তু মি ॥ সর্. ব তুচ্. ছ | ভ-য়্,।...
মস্ ত-ক্ তু ⋮ লি. তে দা-ও্ ॥ অ. নন্. ত আ ⋮ কা. শে
উ. দা-র্ আ ⋮ লো-ক্ মা. ঝে ॥ উন্. মুক্ ত বা ⋮ তা. সে।

রবীন্দ্রনাথ, 'নৈবেদ্য', এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে

এই দৃষ্টান্তের প্রথম দুই পঙ্‌ক্তিতে শব্দের অপ্রান্তবর্তী পাঁচটি রুদ্ধদল (দুর্, ভাগ্, মঙ্, সর্, তুচ্) আমাদের উচ্চারণে সংকুচিত হয়। তাই এগুলি এক

কলামাত্রা হিসাবেই গণনীয়, বাকি ছয়টি শব্দান্তস্থিত রুদ্ধদল (যে-শ, গ-ন, ম-য়, দু-রু, দা-ও, ভ-য়,) আবৃত্তিকালে হয় প্রসারিত। তাই এগুলি দুই কলামাত্রা হিসাবে গণনীয়। মুক্তদল সর্বত্রই একমাত্রক। এভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে, এই দুই পঙ্‌ক্তির প্রতি পূর্ণপর্বে আছে চার কলা, আর অপূর্ণ পর্বে আছে দুই কলা। মোট কলামাত্রা চোদ্দ। পরবর্তী দুই পঙ্‌ক্তিতেও অনুরূপ হিসাবে চোদ্দ কলামাত্রাই পাওয়া যাবে।

এই দৃষ্টান্তটিতেও প্রতি পঙ্‌ক্তি আট-ছয় মাত্রার অপূর্ণ দ্বিপদী। অর্থাৎ এটিও পয়ার। কিন্তু রচনারীতিতে মিশ্রবৃত্ত। তাই এটিকে বলা যায় **মিশ্রবৃত্ত পয়ার।**

লক্ষণীয় : মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দে প্রত্যেক শব্দের অন্তস্থিত রুদ্ধদল প্রসারিত ও দ্বিমাত্রক হয়, আর আদি ও মধ্য-স্থিত রুদ্ধদল সাধারণতঃ হয় সংকুচিত ও একমাত্রক। ফলে এই রীতির ছন্দে দলঘাত বা অণুযতি লোপের সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম। এই যে রুদ্ধদলের সংকোচন-প্রাধান্য আর অণুযতিলোপের আপেক্ষিক বিরলতা, এই উভয়ের যুক্ত প্রভাবে মিশ্রবৃত্ত রীতিতে ছন্দের ধ্বনি ঘনীভূত হবার সুযোগ পায় অনেক বেশি, আর তারই পরিণামে সমগ্র রচনায় দেখা দেয় ধ্বনির গাঢ়বদ্ধতা, গতিমন্থরতা ও শ্রুতিগাম্ভীর্য। বস্তুতঃ সংকুচিত রুদ্ধদলের বহুলতা ও অণুযতিলোপের আপেক্ষিক বিরলতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মিশ্রবৃত্ত রীতির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও ধ্বনিমর্যাদার অন্যতম প্রধান রহস্য।

মিশ্রবৃত্ত রীতির আর-এক বিশিষ্টতা ও গতিগৌরব প্রকাশ পায় ঘনঘন পর্বযতি বা লঘুযতি -লোপের ফলে।

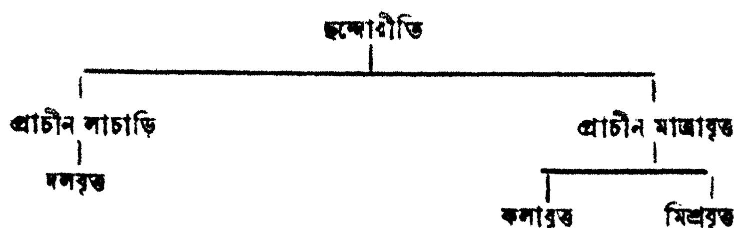
তিন ছন্দোরীতির উৎপত্তির উৎস

দলবৃত্তের উৎপত্তি হচ্ছে প্রাচীন লৌকিক বাংলার লাচাড়ি রীতি থেকে। ছড়া ও লোকগীতি এই ছন্দে রচিত। অধ্যাপক নীলরতন সেন তাঁর 'বাংলা ছন্দ বিবর্তনের ধারা' গ্রন্থে ঐতিহাসিক বিবর্তনের রূপ অসংখ্য উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করেছেন।

কলাবৃত্ত ও মিশ্র কলাবৃত্ত রীতির উদ্ভব 'প্রাচীন (সংস্কৃত ও প্রাকৃত) মাত্রাবৃত্ত রীতি থেকে। কলাবৃত্তের প্রাচীনতম রূপ চর্যাগীতিতে পাওয়া গেলেও এই রীতির ছন্দ রবীন্দ্রনাথের হাতেই উচ্চারণগত সুনির্দিষ্টতা লাভ করেছে।'

মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ মধ্য যুগের বাংলা কাব্যের মুখ্য ছন্দ ছিল।

এই ঐতিহাসিক সূত্র অনুসারে প্রবোধচন্দ্র তিন ছন্দোরীতির উৎপত্তিক্রম সাজিয়েছেন এইভাবে :



কিন্তু আলোচনার শুরুতে যে পর্যায়ক্রমে এই তিন রীতি সাজানো হয়েছে তার ভিত্তি হচ্ছে বাংলা কবিতায় ছন্দোরীতির ব্যাপক প্রচলন বা মাধ্যম বিবেচনা থেকে।

পরিশিষ্ট : ৪

কবিতা সংকলন

প্রথম স্তবক : অনুশীলনের জন্য

এই স্তবকটিকে আবৃত্তি পরিচয়ের 'প্রথম ভাগ' বলা যেতে পারে। আবৃত্তি-শিক্ষার্থীর আবৃত্তিচর্চার উপযোগিতার কথা মনে রেখেই এই কবিতাগুলি নির্বাচন করা হয়েছে। অধিকাংশ কবিতা শিশুপাঠ্য হলেও অন্তত ন' দশ বছরের কম বয়সের কোনো শিশুকে আবৃত্তি শেখানো আমার অভিপ্রেত নয়। অর্বাচীন শিশু কিছু না বুঝে শিক্ষক বা অভিভাবককে হুবহু নকল ক'রে যখন কবিতা আওড়ে যায়, তখন তা শুনতে শুনতে জনক জননীর বুক গর্বে স্ফীত হয়ে ওঠে বটে কিন্তু শিশুর মুখে বড় মানুষের অবিমিশ্র অনুকরণ আমাকে অসুখী করে। তাকে আবৃত্তি বলতেও আমি নারাজ। কেন না, স্বকীয় ভঙ্গিতে বোধযুক্ত আবৃত্তিই শক্তিকামের আবৃত্তি।

সেকালে একান্নবর্তী পরিবারে ঠাকুমা-দিদিমার মুখে নানা-রকম ছড়া শুনে শুনে শিশুদের মনে ছন্দোবোধের উন্মেষ ঘটতো, অর্থবোধের ও কল্পনার দিগন্ত প্রসারিত হতো। একালে পিতৃকেন্দ্রিক ছোট সংসারে তার সুযোগ নেই বললেই চলে। সরাসরি আবৃত্তি শিক্ষার মধ্য দিয়েই শিশুদের ছন্দজ্ঞানের হাতে-খড়ি হয়, কবিতার ভাব ও ভাষাকে উপলব্ধি করবার মানসিকতা গড়ে ওঠে। তাই, এই স্তবকে সংকলিত কবিতাগুলির মধ্যে শিশুপাঠ্য কবিতার সংখ্যাই বেশি। শিশুমন যাতে ছন্দের দোলায় আন্দোলিত হয়, অর্থের নাগাল পায়, তার জন্য সহজ ছন্দে সরল ভাষায় এই সব কবিতা রচিত হয়েছে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পূর্ণমনস্ক শিক্ষার্থীও তাঁর আবৃত্তিশিক্ষার প্রথম পর্যায়ে এই কবিতাগুলি যথাযথভাবে আবৃত্তি করলে উপকৃত হবেন। এগুলি ছাড়াও আরও কিছু কবিতা আবৃত্তির অনুশীলনের গোড়ার দিকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। আশা করবো, আবৃত্তিচর্চায় যাঁরা প্রকৃতই আগ্রহী, তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা', কাজী নজরুল ইসলামের 'সঞ্চিতা' এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'সুকান্ত সমগ্র'—এই তিনখানি বই অবশ্যই আছে। রবীন্দ্রনাথের 'তালগাছ', 'আষাঢ়', 'লুকোচুরি', 'খেলাভোলা', 'ইচ্ছামতী', 'অভিসার', 'বীরপুরুষ', 'পণরক্ষা', 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'সোনার তরী', 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'শঙ্খ' প্রভৃতি কবিতা, কাজী নজরুল ইসলামের 'প্রভাতী', 'খুকী ও কাঠ্‌বেড়ালী', 'লিচু-চোর' প্রভৃতি কবিতা এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'দেশলাই কাঠি', 'সিগারেট', 'পুরনো ধাঁধা', 'সিপাহী বিদ্রোহ', 'ব্ল্যাক মার্কেট' প্রভৃতি কবিতা অধ্যবসায়ী শিক্ষার্থীকে আবৃত্তিপটুতা অর্জনে অনেকখানি সাহায্য করবে।

—দে. দু. ব

ঈশ্বরী পাটনী । রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে ।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী ।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামা-স্বর শুনি ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী ।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার ।
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফের-ফার ॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় করেন ঈশ্বরী ।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি ।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত ।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম ।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতি-বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন ॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি ।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে ।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই ।
যে মোরে আপনা ভাবে তার ঘরে যাই ॥
পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল ।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল ॥

শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব, আগে পারে লয়ে চল॥
যাঁর নামে পার করে ভব-পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটনী তাঁহারে করে পার॥
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুই বল॥
পাটনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতি-উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি-উপরে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতি-উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে॥
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥
সোনার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়।
এ ত' মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥
তটে উত্তরিলা তরী তারা উত্তরিলা।
পূর্বমুখে সুখে গজ-গমনে চলিলা॥
সেঁউতি লইয়া কক্ষে চলিলা পাটনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি॥
সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥
হের দেখ সেঁউতিতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ॥

ইহাকে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥
তপ জপ নাহি জানি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
যে দয়া করিলা মোরে এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্ল-অষ্টমীতে॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাবে দিব॥
প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে-ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥
বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।
পুনর্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায়॥

প্রভাত | মদনমোহন তর্কালঙ্কার

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে,
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে।
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল,
পরিমল-লোভে অলি আসিয়া জুটিল।
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ,
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন।

শীতল বাতাস বয়, জুড়ায় শরীর,
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
উঠ শিশু, মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।

মেঘনাদবধ কাব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ষষ্ঠ সর্গ (অংশ)

কুশাসনে ইন্দ্রজিত পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে ; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে।
পুড়ে ধুপদানে ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি ! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ;—বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে !
যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্‌ঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে।
চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী !
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভ ক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে !

কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে ? এ কি লীলা তব,
প্রভাময় ?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।

উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি ;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি ! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে !
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম ; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে।" যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া !
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল !
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল।
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে !

বিস্ময়ে কহিলা শূর, "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি ? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর দ্বার ; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে ;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ সবে ?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে ? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক ? কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি ?

নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ
রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে,
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধীপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমূ, বিদাও আমারে!"

উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী,—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি;
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে!"

এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে! ঝলসি আঁখি কালানল-তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,—
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর কহিব?"

জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি,—
"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!"
কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে!) "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথীবৃন্দ! তস্কর যেমতি
পশিলি এ গৃহে তুই, তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর! কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি?"
চক্ষের নিমিষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে! দেব-অস্ত্র বাজিল ঝন্‌ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে।
বহিল রুধির-ধারা! ধরিলা সত্বরে
দেব অসি ইন্দ্রজিৎ;—নারিলা তুলিতে
তাহায়! কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা, রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ! সাপটিলা কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ সাধনে!
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধরশৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!

চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীষতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে!
"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ? শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ; "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,

কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে ? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।

ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে ?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথীপ্রথা ?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা ! ছাড়হ পথ ; আসিব ফিরিয়া
এখনি ! দেখিব আজি, কোন্ দেববলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি !

দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের ! কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে ?

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী , আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।

তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী ! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস ? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ?'

মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ;
"নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি ! নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি !

বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে !

রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি! পরদোষে কে চাহে মজিতে?"
কহিলা বাসবত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—"ধর্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি; কোন্ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।"
হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষাস শরজালে বিঁধেন তারকে।
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী!
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে,
সপ্ত রথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে!
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে,

ফেলাইলা দূরে শূরে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে। সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী।
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে ;
শূল হস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে ; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে !
ত্যজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন ! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জিলা উথলি সিন্ধু ! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব ! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে ! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে।
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল।
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী
মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে !
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে ! মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল

শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে!
অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক্ তোরে!
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে!
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে!
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দহিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি!
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমিলারে
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

কাকাতুয়া | যোগীন্দ্রনাথ সরকার

কাকাতুয়া, কাকাতুয়া, আমার যাদুমণি,
সোনার ঘড়ি কি বলিছে, বল দেখি শুনি ?

বলিছে সোনার ঘড়ি, "টিক্-টিক্-টিক্,
যা কিছু করিতে আছে, ক'রে ফেল ঠিক।
সময় চলিয়া যায় —
নদীর স্রোতের প্রায়,
যে জন না বুঝে, তারে ধিক্ শত ধিক্।"
বলিছে সোনার ঘড়ি, "টিক্-টিক্-টিক্!"

কাকাতুয়া, কাকাতুয়া, আমার যাদুধন,
অন্য কোন কথা ঘড়ি বলে কি কখন ?

মাঝে মাঝে বলে ঘড়ি, "টঙ্-টঙ্-টঙ্,
মানুষ হইয়ে যেন হয়ো না ক সঙ।
ফিটফিটে বাবু হ'লে,
ভেবেছ কি ল'বে কোলে ?
সবাসে কে ভালবাসে দেখে রাঙা রঙ্।"
মাঝে মাঝে বলে ঘড়ি, "টঙ্-টঙ্-টঙ্।"

কাজ্‌লা-দিদি | যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
মাগো, আমার শোলোক-বলা কাজ্‌লা-দিদি কই ?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে খোকায় খোকায় জোনাই জ্বলে,—
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে' রই ;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা দিদি কই ?

সেদিন হ'তে দিদিকে আর কেনই বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো?
খাবার খেতে আমি যখন দিদি বলে' ডাকি, তখন
ও-ঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি,—তুমি কেন চুপটি করে' থাকো?

বল্ মা দিদি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল-বিয়ে হবে!
দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকোই গিয়ে—
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে' র'বে?
আমিও নাই দিদিও নাই—কেমন মজা হবে!

ভুঁইচাঁপাতে ভরে' গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস নে মা পুকুর থেকে আনবি যখন জল;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
দিস নে তারে উড়িয়ে মাগো, ছিঁড়তে গিয়ে ফল;
দিদি এসে শুনবে যখন, বলবি কি মা বল্!

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
এমন সময়, মাগো, আমার কাজ্‌লা-দিদি কই?
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝিঁ ডাকে ঝোপে-ঝাড়ে;
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না—তাইতে জেগে' রই;—
রাত হ'ল যে, মাগো, আমার কাজ্‌লা-দিদি কই?

কোন্ দেশে | সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চ'লতে গেলেই—
দ'লতে হয় রে দূর্বা কোমল?

কোথায় ফলে সোনার ফসল,—
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোথা ডাকে দোয়েল শ্যামা—
ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে ?
বাবুই কোথা বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি'—
আকুল করি' তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পা'ব—
বাউল সুরে মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে !

কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাইরে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে উঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃপিতামহের—
চরণ-ধূলি কোথা রে ?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !

মেঘ মুলুকে ঝাপ্‌সা রাতে,
রামধনুকের আব্‌ছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে,
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা,
নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন্ আকাশতলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ঝরণা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপ্‌নি ফোটে,
রঙিয়ে আকাশ, রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ!

আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাইবা তাহার অর্থ হোক্‌,
নাইবা বুঝুক বেবাক্‌ লোক।
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।

ছুট্‌লে কথা থামায় কে?
আজকে ঠেকায় আমায় কে?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্‌ তব্‌লা বাজে—
রাম-খটাখট্ ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ্‌,
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্‌।

আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘন্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত!

হ্যাংলা হাতী চ্যাং-দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরাণী পক্ষিরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

একুশে আইন ; সুকুমার রায়

শিবঠাকুরের আপন দেশে,
আইন কানুন সর্বনেশে !
কেউ যদি যায় পিছ্‌লে প'ড়ে,
প্যায়দা এসে পাক্‌ড়ে ধরে,
কাজির কাছে হয় বিচার—
একুশ টাকা দণ্ড তার॥

সেথায় সন্ধে ছটার আগে,
হাঁচতে হ'লে টিকিট লাগে—
হাঁচ্‌লে পরে বিন্‌ টিকিটে—
দম্‌দমাদম্ লাগায় পিঠে,
কোটাল এসে নস্যি ঝাড়ে—
একুশ দফা হাঁচিয়ে মারে॥

কারুর যদি দাঁতটি নড়ে,
চারটি টাকা মাশুল ধরে,
কারুর যদি গোঁফ গজায়,
একশো আনা ট্যাক্‌সো চায়—
খুঁচিয়ে পিঠে গুঁজিয়ে ঘাড়,
সেলাম ঠোকায় একুশ বার॥

চলতে গিয়ে কেউ যদি চায়,
এদিক্‌ ওদিক্‌ ডাইনে বাঁয়,
রাজার কাছে খবর ছোটে,
পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে,
দুপুর রোদে ঘামিয়ে তায়
একুশ হাতা জল গেলায়॥

যে সব লোকে পদ্য লেখে,
তাদের ধ'রে খাঁচায় রেখে,
কানের কাছে নানান্‌ সুরে,
নামতা শোনায় একশো উড়ে,
সামনে রেখে মুদীর খাতা—
হিসেব কষায় একুশ পাতা॥

হঠাৎ সেথায় রাত দুপুরে,
নাক ডাকালে ঘুমের ঘোরে,
অম্‌নি তেড়ে মাথায় ঘষে,
গোবর গুলে বেলের কষে,
একুশটি পাক ঘুরিয়ে তাকে
একুশ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখে॥

গোঁফ চুরি | সুকুমার রায়

হেড্‌ আফিসের বড় বাবু লোকটি বড় শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জান্‌ত ?
দিব্যি ছিলেন খোস্‌মেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা ব'সে ঝিম্‌ঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে !
আঁৎকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখ্‌টি ক'রে গোল
হঠাৎ বলেন, "গেলুম গেলুম, আমায় ধ'রে তোল" !
তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউ বা হাঁকে পুলিশ,
কেউবা বলে, "কামড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস্‌ ।"

ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক করছে ঘোরাঘুরি—
বাবু হাঁকেন, "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি"!
গোঁফ হারান! আজব কথা! তাও কি হয় সত্যি?
গোঁফ জোড়া ত তেমনি আছে, কমেনি এক রত্তি।
সবাই তাঁরে বুঝিয়ে বলে, সাম্‌নে ধ'রে আয়না,
মোটেও গোঁফ হয়নি চুরি, কক্ষনো তা হয় না।

রেগে আগুন তেলে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি,
"কারো কথার ধার ধারিনে, সব ব্যাটাকেই চিনি।
"নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,
"এমন গোঁফ ত রাখ্‌ত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।
"এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই"—
এই না ব'লে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়—
"কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।
"আফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর
"গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
"ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধ'রে খুব নাচি,
"মুখ্যুগুলোর মুণ্ডু ধ'রে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
"গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা?
"গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।"

মায়াতরু | অশোক বিজয় রাহা

এক-যে ছিলো গাছ,
সন্ধে হ'লেই দু-হাত তুলে জুড়তো ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠতো যখন
ভালুক হ'য়ে ঘাড় ফুলিয়ে করতো সে গরগর
বৃষ্টি হ'লেই আসতো আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠতো হেসে

কোথায় বা সেই ভালুক গেলো, কোথায় বা সেই গাছ,
মুকুট হ'য়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ ।

ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হ'তো কী-যে
ভেবে পাইনে নিজে,
সকাল হ'লো যেই
একটিও গাছ নেই,
কেবল দেখি প'ড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর
রুপালি এক ঝালর ।

কাজের লোক | নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

"মৌমাছি, মৌমাছি,
কোথা যাও নাচি' নাচি',
দাঁড়াও না একবার ভাই !"
"ওই ফুল ফুটে বনে,
যাই মধু আহরণে,
দাঁড়াবার সময় ত নাই ।"

"ছোট পাখী, ছোট পাখী,
কিচি-মিচি ডাকি' ডাকি'
কোথা যাও, বলে যাও শুনি ?"
"এখন না ক'ব কথা,
আনিয়াছি তৃণলতা,
আপনার বাসা আগে বুনি ।"

"পিপীলিকা, পিপীলিকা,
দল-বল ছাড়ি একা,
কোথা যাও, যাও ভাই বলি ।"
"শীতের সঞ্চয় চাই,
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই,
ছয় পায় পিল্ পিল্ চলি ।"

বঙ্গভূমির প্রতি | মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে !

আত্ম-বিলাপ | মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে ?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ? এ কি দায় !

২

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাত্রি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে ?
নীর-বিন্দু দূর্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলমলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁদিতে !
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে,—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু আশার ।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে ;
কি ফল লভিলি ?
জলন্ত পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি !
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় !
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে !

৫

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
কত যাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে !

৬

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায় ?

৭

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু জলতলে
ফেলিস্, পামর !
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে !

দ্বিতীয় স্তবক : আবৃত্তির জন্য

অনুশীলনের প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে যেসব শিক্ষার্থী আবৃত্তিতে পারদর্শী হয়ে উঠবেন তাঁদের জন্য পরিশিষ্টের এই স্তবকে কিছু কবিতা রাখা হোল। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত নানা কবির কবিতার বিষয়বস্তু ও ছন্দনির্মিতির বৈচিত্র্য সম্পর্কে নবীন আবৃত্তিকার যাতে কিছুটা ওয়াকিবহাল হতে পারেন একমাত্র সেই উদ্দেশ্য নিয়েই কবিতাগুলি সংকলন করা হয়েছে। নির্বাচনের ব্যাপারে কবিতার আবৃত্তিযোগ্যতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। বস্তুতপক্ষে, আবৃত্তিযোগ্য কবিতা হিসেবে কিছু কবিতাকে চিহ্নিত করতে আমার মন সায় দেয় না। কেননা, যে মুহূর্তে কিছু কবিতাকে আবৃত্তিযোগ্য কবিতা বলব সেই মুহূর্তেই স্পষ্ট ভেদরেখা টেনে দেওয়া হবে যে, এর বাইরে কোনো কবিতার বুঝি-বা আবৃত্তিযোগ্যতা নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সব কবিতাই আবৃত্তিযোগ্য। একজনের কাছে যে কবিতা আবৃত্তির উপযোগী নয়, অন্য জনের কাছে সেই কবিতাটিই হয়তো আবৃত্তিযোগ্যতার নিরিখে আদর্শ স্থানীয় কবিতা। নৃত্য গীত আবৃত্তির পাঁচমেশেলি বিরাট আয়তনের আসরে যেখানে বিবিধ রুচির শ্রোতৃসমাগম হয়, সেখানে যে কবিতাটিকে আবৃত্তির জন্য মনোনয়ন করতে দ্বিধা জাগে, সেই কবিতাটিই শুধুমাত্র আবৃত্তির নিটোল ঘরোয়া আসরে আবৃত্তিপ্রেমী শ্রোতার কাছে পরম তৃপ্তির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আবৃত্তিযোগ্যতা নিতান্তই আপেক্ষিকতানির্ভর অভিধা। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আবৃত্তির জন্য যে কবিতাই বাছি না কেন, তাকে একটা শর্ত পালন করতেই হবে, তাকে অবশ্যই কবিতা হতে হবে। 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি'—কবি জীবনানন্দ দাশের এই কথার জের টেনে বলা যেতে পারে—'সব ছন্দোবদ্ধ রচনাই কবিতা নয়, কোনো কোনোটি কবিতা'। কয়েকজন আবৃত্তিকারের মধ্যে ইদানীং একটা প্রবণতা লক্ষ্য করছি। সস্তায় হাততালি কুড়োনোর লোভে রাজনৈতিক কবিতা বা আন্দোলনের কবিতা বা প্রতিবাদের কবিতা ইত্যাকার গালভরা আখ্যা দিয়ে তাঁরা এমন কিছু আবৃত্তি করছেন যা কোনো বিক্ষোভ মিছিলের শাণিত স্লোগান কিংবা কোনো জনদরদী প্রগলভ নেতার ভাষণ ছাড়া আর কিছুই নয়, অন্তত

কবিতা পদবাচ্য তো নয়ই। এগুলোকে যদি কবিতা ব'লে মেনে নিতে হয় তাহলে তো স্বীকার ক'রে নিতে হয় যে, যারা ঐসব চিৎকৃত স্লোগানে নেতৃত্ব দেন কিংবা যেসব নেতা জ্বালাময়ী ভাষণ দেন, তাঁরাও উঁচুদরের আবৃত্তিকার। তাই কি?

প্রথম স্তবকের মুখবন্ধে আগেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা', কাজী নজরুলের 'সঞ্চিতা' এবং সুকান্তের 'সুকান্ত-সমগ্র' অন্তত এই তিনখানি বই আবৃত্তিশিক্ষার্থী সব সময় নিজের কাছে রাখবেন। রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী", "প্রশ্ন", "মৃত্যুঞ্জয়", "দুঃসময়," "অভিসার", "দেবতার গ্রাস", "হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি", "তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে" ও "ফাল্গুনের রঙিন আবেশ"—এই তিনটি "উদাসীন", "শেষ বসন্ত", "হঠাৎ দেখা", "আমি", "স্খলন", "সাধারণ মেয়ে", "বাঁশিওয়ালা", "আফ্রিকা", "পৃথিবী", "বাঁশি", "লীলাসঙ্গিনী," "শঙ্খ" ইত্যাদি কবিতা, কাজী নজরুল ইসলামের "বিদ্রোহী", "আমার কৈফিয়ৎ", "সৃষ্টি সুখের উল্লাসে", "ফরিয়াদ" প্রভৃতি কবিতা এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের "ছাড়পত্র", "প্রার্থী", "রবীন্দ্রনাথের প্রতি", "প্রিয়তমাসু", "বোধন" ইত্যাদি কবিতা শ্রোতৃমহলের অতি প্রিয় কবিতা। সেই কারণে, এই কবিতাগুলি আবৃত্তি করার জন্য নবীন আবৃত্তিকারকে সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। আরও কিছু কবিতা এই সংকলনের বাইরে রেখেছি। পরিশ্রমী আবৃত্তিকার সে সব কবিতা নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ ক'রে পড়বেন—এটাই বাঞ্ছনীয়। কবি জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতার বই থেকে জীবনানন্দ দাশের "বনলতা সেন", "সুচেতনা", "আট বছর আগের একদিন", "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি", "আবার আসিব ফিরে", বুদ্ধদেব বসুর "কবি মশাই", "জোনাকি", "চিল্কায় সকাল", "সমর্পণ" ও বিষ্ণু দে'র "ঘোড়সওয়ার," "সাত ভাই চম্পা" কবিতাগুলি আবৃত্তির জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে।

—দে. দু. ব

মাধবিকা | যতীন্দ্রমোহন বাগচী

দখিন হাওয়া—রঙিন হাওয়া, নূতন রঙের ভাণ্ডারী,
জীবন-রসের রসিক বঁধু, যৌবনেরি কাণ্ডারী।
সিন্ধু থেকে সদ্য বুঝি আসছ আজি স্নান করি'—
গাং-চিলেদের পক্ষধ্বনির শন্‌শনানির গান ধরি';
মৌমাছিদের মনভুলানি গুনগুনানির সুর ধরে'—
চললে কোথায় মুগ্ধ পথিক, পথটি বেয়ে উত্তরে?

লক্ষ ফুলের গন্ধ মাখি' লক্ষ আঁকি' চন্দনে,
যাচ্ছ ছুটে' কোন্ প্রিয়ারে বাঁধতে ভুজবন্ধনে?
অনেক দিনের পরে দেখা, বছর-পারের সঙ্গী গো,
হোক না হাজার ছাড়াছাড়ি, রেখেছ সেই ভঙ্গী তো!
—তেম্‌নি সরস ঠাণ্ডা পরশ, তেমনি গলায় হাঁকটি সেই,
দেখতে পেলেই চিনতে পারি, কোনোখানেই ফাঁকটি নেই।
—কোথায় ছিলে বন্ধু আমার, কোন্ মলয়ের বন ঘিরে',
নারিকেলের কুঞ্জ-বেড়া কোন্ সাগরের কোন্ তীরে।
সকলকে সেই বেতসবীথির বলো তো ভাই কোন্ গলি,
এলা লতার কেয়াপাতার খবর যে সব মঙ্গলই?

— ভালো কথা, দেখলে পথে, সবাই তোমায় বন্দে তো,—
বন্ধু বলে' চিনতে কারো হয়নি তো ভাই সন্দেহ?
নরনারী তোমার মোহে তেম্‌নি তো সব ভুল করে—
তেম্‌নিতর পরস্পরের মনের বনে ফুল ধরে!
আসতে যেতে দীঘির পথে তেম্‌নি নারীর ছল করা;
পথিকবধূর চোখের কোণে তেম্‌নি তো সেই জলভরা?
যুবতীরা ডাগর আঁখির কাজল-লেখা মন্তরে
আজও তো সেই আগের মতন প্রিয়জনের মন হরে?
পলাশ ফুলে হঠাৎ দেখে' নখক্ষতের চিহ্ন কার,
ঈষৎ হেসে কণ্ঠে বাঁধে পূর্বরাতের ছিন্নহার!
বকুলে সেই রং তো আছে, অশোকে তাই ফুটছে তো,
শাখায় তারি দুলতে দোলায় তরুণীদল জুটছে তো?

তোমায় দেখে' তেম্‌নি ডেকে উঠ্‌ছে তো সব বিহঙ্গ,
সবুজ ঘাসের শীষটি বেয়ে বয় তো চেয়ে পতঙ্গ?

—তেম্‌নি—সবই তেম্‌নি আছে!—হ'লাম শুনে' খুব খুশী,
প্রাণটা ওঠে চন্‌চনিয়ে মনটা ওঠে উস্‌খুসি'!
নূতন বলে কম্‌ল হৃদয়, রক্ত চলে চঞ্চলি',—
বন্ধু, তোমায় অর্ঘ্য দিলাম উচ্ছলিত অঞ্জলি।
গ্রহণ করো, গ্রহণ করো—বন্ধু আমার দণ্ডেকের—
জানি নাক আবার কবে দেখা তোমার সঙ্গে ফের।

অন্ধ বধূ | যতীন্দ্রমোহন বাগচী

পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি!
আস্তে একটু চল্‌ না, ঠাকুর-ঝি—
ওমা, এ যে ঝরা-বকুল!—নয়?
তাইত বলি, বসে দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল—মধুমদির বাসে—
আকাশ-পাতাল—কতই মনে হয়।
জ্যৈষ্ঠ আসতে ক'দিন দেরী ভাই,—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?

—অনেক দেরী? কেমন করে' হবে!
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,—
দখিন হাওয়া—বন্ধ কবে ভাই;
দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে—
শেওলা-পিছল—এম্‌নি শঙ্কা লাগে,
পা পিছ্‌লিয়ে তলিয়ে যদি যাই!
মন্দ নেহাৎ হয় না কিন্তু তায়—
অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে' যায়!

দুঃখ নাইক—সত্যি কথা শোন্,
অন্ধ গেলে কি আর হবে বোন ?
বাঁচবি তোরা—যাব ত তোর আগে ;
এই আষাঢ়েই আবার বিয়ে হবে,
বাড়ি আসার পথ খুঁজে না পাবে—
দেখবি তখন—বিদেশ কেমন লাগে !
—কি বললি ভাই, কাঁদবে সন্ধ্যা-সকাল ?
হা অদৃষ্ট, হায়রে আমার কপাল !

কত লোকেই যায় ত পরবাসে—
কাল-বোশেখে কে না বাড়ি আসে ?
চৈতালি কাজ, কবে ত সেই শেষ !
পাড়ার মানুষ ফিরল সবাই ঘর,
তোমার ভায়ের সবই স্বতন্তর—
ফিরে' আসার নাই কোনও উদ্দেশ।
—ঐ যে, হেথায় ঘরের কাঁটা আছে—
ফিরে আসতে হবে ত তার কাছে !

—এইখানেতে একটু ধরিস ভাই,
পিছল ভারি—ফস্কে যদি যাই—
এ অক্ষমার রক্ষা কি আর আছে !
আসুন ফিরে'—অনেক দিনের আশা,
থাকুন ঘরে, না থাক্ ভালবাসা—
তবু দু'দিন অভাগিনীর কাছে !
জন্মশোধের বিদায় নিয়ে ফিরে'—
সেদিন তখন আসব দীঘির তীরে।

'চোখ-গেল' ঐ চেঁচিয়ে হ'ল সারা !
আচ্ছা দিদি, কি করবে ভাই তা'রা—
জন্ম লাগি' গিয়েছে যার চোখ !
কাঁদার সুখ যে বারণ তাহার—ছাই !

কাঁদতে পেলে বাঁচত সে যে তাই,
কতক তবু কমৃত যে তার শোক !
'চোখ-গেল'—তার ভরসা তবু আছে—
চক্ষুহীনার কি কথা কার কাছে !

—টানিস কেন ? কিসের তাড়াতাড়ি ?
সেই ত ফিরে' যাব আবার বাড়ি,
একলা-থাকা সেই ত গৃহকোণ—
তার চেয়ে এই স্নিগ্ধ শীতল জলে
ফুটো যেন প্রাণের কথা বলে—
মরম-ভরা সুখের আলাপন,
পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মত'
জুড়ায় খানিক মনের ব্যথা যত !

এবার এসে, হাতটি দিয়ে গায়ে—
অন্ধ আঁখি বুলিয়ে বারেক পায়ে,
বন্ধ চোখের অশ্রু রুধি' পাতায়,
জন্ম-দুখীর দীর্ঘ আয়ু দিয়ে
চির-বিদায় ভিক্ষা যাব নিয়ে—
সকল বালাই বয়ে আপন মাথায় !
—দেখিস তখন, কাণার জন্যে আর
কষ্ট কিছু হয় না যেন তাঁর।

তার পরে—এই সেওলা-দীঘির ধার—
সঙ্গে আসতে বলবনাক আর,
শেষের পথে কিসের বল' ভয় ?
এইখানে এই বেতের বনের ধারে,
ডাহুক-ডাকা সন্ধ্যা-অন্ধকারে—
সবার সঙ্গে সাঙ্গ পরিচয় !
সেওলা-দীঘির শীতল অতল নীরে—
মায়ের কোলটি পাই যেন তাই ফিরে' !

দূরের পাল্লা | সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছিপ্‌খান্ তিন-দাঁড়—
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন্-ভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা।

পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল,—জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগ্‌ছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।

চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পান্‌কৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোম্‌টার বউটি।

ঝক্‌ঝক্ কলসীর
বক্‌বক্ শোন্ গো,
ঘোম্‌টায় ফাঁক বয়
মন উন্মন্ গো।

তিন দাঁড় ছিপখান্
মন্থর যাচ্ছে,
তিন জন মাল্লায়
কোন্ গান গাচ্ছে?

• • •

রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ি
তার হাসি মিষ্টি।

মুখখানি মিষ্টি যে
চোখদুটি ভোম্‌রা
ভাব-কদমের—ভরা
রূপ ছাখো তোমরা।

ময়নামতীর জুটি
ওর নামই টগরী,
ওর পায়ে ঢেউ ভেঙে
জল হ'ল গোখ্‌রী।

ডাক-পাখী ওর লাগি'
ডাক্ ডেকে হদ্দ,
ওর তরে সোঁত-জলে
ফুল ফোটে পদ্ম।

ওর তরে মরমে
নদ হেথা চল্‌ছে,
জলপিপি ওর মৃদু
বোল বুঝি বোল্‌ছে।

দুই তীরে গ্রামগুলি
ওর জয়ই গাইছে,
গঞ্জে যে নৌকো সে
ওর মুখই চাইছে।

আট্‌কেছে যেই ডিঙা
চাইছে সে পর্ষ,
সংকটে শক্তি ও
সংসারে হর্ষ।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোমরা
রূপশালি-ধান-ভানা
রূপ ছাখো তোমরা।

•   •   •

পান সুপারি! পান সুপারি!
এইখানেতে শঙ্কা ভারি,

পাঁচ পীরেরই শির্‌নি মেনে
চল্‌রে টেনে বৈঠা হেনে;
বাঁক সমুখে, সামনে ঝুঁকে
বাঁয় বাঁচিয়ে ডাইনে রুখে
বুক দে টানো, বৈঠা হানো—
সাত সতেরো কোপ কোপানো।
হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচ্‌তেছিলো সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থম্‌কে গেলো।
জম্‌জমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এলো, রাত্রি এলো।
ঝাপ্‌সা আলোয় চরের ভিতে
ফির্‌ছে কারা মাছের পাছে,
পীর বদরের কুদ্‌রতিতে
নৌকো বাঁধা হিজল গাছে।

*   *   *

আর জোর দেড় ক্রোশ—
জোর দেড় ঘণ্টা,
টান্ ভাই টান্ সব—
নেই উৎকণ্ঠা।

চাপ্ চাপ্ শ্যাওলার
দ্বীপ সব সার সার,—
বৈঠার ঘায় সেই
দ্বীপ সব নড়্‌ছে,
ভিল্‌ভিলে হাঁস তায়
জল-গায় চড়্‌ছে।

ওই মেঘ জম্‌ছে,
চল্ ভাই সম্‌ঝে,
গাও গান, দাও শিস্,—
বক্‌শিস্, বক্‌শিস্।

খুব জোর ডুব্-জল,
বয় স্রোত, ঝির্‌ঝির্,
নেই ঢেউ কল্লোল,
নয় দূর নয় তীর।

নেই নেই শঙ্কা,
চল্ সব ফুর্তি,—
বকশিস্ টংকা,
বকশিশ্, ফুর্তি।

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়,
ঝাউগাছ দুলছে,
ঢোল্-কল্মীর ফুল
তন্দ্রায় ঢুলছে।

লকলক্ শর-বন
বক্ তায় মগ্ন,
চুপ্‌চাপ্ চারদিক্—
সন্ধ্যার লগ্ন।

চারদিক্ নিঃসাড়্,
ঘোর-ঘোর রাত্রি,
ছিপ্-খান্ তিন-দাঁড়,
চারজন যাত্রী।

* * *

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,
ঝাউয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে
ঝিমায় বুঝি ঝিঁঝির গানে—
স্বপন পানে পরাণ টানে।
তারায় ভরা আকাশ ওকি
ভুলোয় পেয়ে ধুলোর 'পরে
লুটিয়ে প'লো আচম্বিতে
কুহক-মোহ-মন্ত্র-ভরে।

* * *

কেবল তারা! কেবল তারা!
শেষের শিরে মাণিক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথায় চাহি।

কোথায় এলো নৌকোখানা
তারার ঝড়ে হই রে কাণা,
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকো চলে আকাশ চিরে

জ্বল্‌ছে তারা, নিব্‌ছে তারা—
মন্দাকিনীর মন্দ সোঁতায়,
যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে কোথায়
জোনাক যেন পন্থা-হারা।

তারায় আজি ঝামর হাওয়া
ঝামর আজি আঁধার রাতি,
অগুন্‌তি অফুরান্ তারা
জ্বালায় যেন জোনাক্-বাতি।

কালো নদীর দুই কিনারে
কল্পতরুর কুঞ্জ কি রে?—
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে—
ফুল ফুটেছে মাণিক হীরে

বিনা হাওয়ায় ঝিল্‌মিলিয়ে
পাপ্‌ড়ি মেলে মাণিক-মালা,
বিনি নাড়ায় ফুল ঝরিছে
ফুল পড়িছে জোনাক-জ্বালা।

চোখে কেমন লাগ্‌ছে ধাঁধা—
লাগ্‌ছে যেন কেমন পারা,
তারাগুলোই জোনাক হ'ল
কিম্বা জোনাক হ'ল তারা।

নিথর জলে নিজের ছায়া
দেখ্‌ছে আকাশ-ভরা তারায়,
ছায়া-জোনাক আলিঙ্গিতে
জলে জোনাক দিশে হারায়।

মিশে হারায়, যায় ভেসে যায়
স্রোতের টানে কোন্ দেশে রে ?—
মরা গাঙ আর সুর-সরিৎ
এক হয়ে যেথায় মেশেরে।

কোথায় তারা ফুরিয়েছে, আর
জোনাক কোথা হয় শুরু যে
নেই কিছুরই ঠিক ঠিকানা
চোখ যে আলা, রতন উছে।

• • •

আলেয়াগুলো দপ্‌দপিয়ে
জলছে নিবে, নিবছে জ্বলে'
উল্কোমুখী জিব মেলিয়ে
চাটছে বাতাস আকাশ-কোলে।

আলেয়া-হেন ডাক-পেয়াদা
আলেয়া হতে ধায় জেয়াদা,
একলা ছোটে বন-বাদাড়ে
ল্যাম্পো-হাতে লকড়ি ঘাড়ে ;

সাপ মানে না, বাঘ জানে না,
ভূতগুলো তার সবাই চেনা,
ছুটছে চিঠি পত্র নিয়ে
রন্‌রনিয়ে হন্‌হনিয়ে।

বাঁশের ঝোঁপে জাগ্‌ছে সাড়া,
কোল্‌-কুঁজো বাঁশ হচ্ছে খাড়া,
জাগ্‌ছে হাওয়া জলের ধারে,
চাঁদ ওঠেনি আজ আঁধারে।

শুকতারাটি আজ নিশীথে
দিচ্ছে আলো পিচ্‌কিরিতে,
রাস্তা এঁকে সেই আলোতে
ছিপ্‌ চলেছে নিঝুম স্রোতে।

ফিরছে হাওয়া গায় ফুঁ-দেওয়া,
মাল্লা মাঝি পড়ছে থ'কে ;
রাঙা আলোর লোভ দেখিয়ে
ধরছে কারা মাছগুলোকে।

চলছে তরী, চলছে তরী—
আর কত পথ ? আর ক'ঘড়ি ?
এই যে ভিড়াই, ওই যে বাড়ী,
ওই যে অন্ধকারের কাঁড়ি—

ওই বাঁধা-বট ওর পেছনে
দেখ্‌ছ আলো ? ঐ তো কুঠি,
ঐখানেতে পৌঁছে দিলেই
রাতের মতন আজ্‌কে ছুটি।

ঝপ্‌ ঝপ্‌ তিনখান্
দাঁড় জোর চলছে,
তিনজন মাল্লার
হাত সব জ্বলছে

গুর্‌গুর্ মেঘ সব
গায় মেঘ-মল্লার,
দূর-পাল্লার শেষ
হাল্লাক্ মাল্লার।

কুম্‌ড়োপটাশ | সুকুমার রায়

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ নাচে—
খবরদার এসো না কেউ আস্তাবলের কাছে,
চাইবে নাকো ডাইনে বাঁয়ে চাইবে নাকো পাছে,
চারপা তুলে থাকবে ঝুলে হট্টমুলার গাছে !

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ কাঁদে—
খবরদার ! খবরদার ! বস্‌বে না কেউ ছাদে ;
উপুড় হয়ে মাচায় শুয়ে লেপ কম্বল কাঁধে,
বেহাগ সুরে গাইবে খালি 'রাধে কৃষ্ণ রাধে' !

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ হাসে—
থাক্‌বে খাড়া একটি ঠ্যাঙে রান্নাঘরের পাশে,
ঝাপ্‌সা গলায় ফার্সি কবে নিশ্বাসে ফিস্‌ফাসে,
তিনটি বেলা উপোস্ ক'রে থাকবে শুয়ে ঘাসে !

(যদি) কুমড়োপটাশ ছোটে—
সবাই যেন তড়বড়িয়ে জানলা বেয়ে ওঠে;
হুঁকোর জলে আলতা গুলে লাগায় গালে ঠোঁটে;
ভুলেও যেন আকাশ পানে তাকায় না কেউ মোটে!

(যদি) কুমড়োপটাশ ডাকে—
সবাই যেন শামলা এঁটে গামলা চ'ড়ে থাকে;
ছেঁচকি শাকের ঘন্ট বেটে মাথায় মলম মাখে;
শক্ত ইঁটের তপ্ত ঝামা ঘষতে থাকে নাকে।

তুচ্ছ ভেবে এসব কথা করছে যারা হেলা,
কুমড়োপটাশ জানতে পেলে বুঝবে তখন ঠেলা।
দেখবে তখন কোন্ কথাটি কেমন ক'রে ফলে,
আমায় তখন দোষ দিও না, আগেই রাখি ব'লে।

ভয় পেয়ো না | সুকুমার রায়

ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না—
সত্যি বলছি কুস্তি ক'রে তোমার সঙ্গে পারব না।
মনটা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগটি নেই,
তোমায় আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সাধ্যি নেই!
মাথায় আমার শিং দেখে ভাই ভয় পেয়েছ কতই না—
জানো না মোর মাথার ব্যারাম, কাউকে আমি গুঁতোই না?

এস এস গর্তে এস, বাস ক'রে যাও চারটি দিন,
আদর ক'রে শিকেয় তুলে রাখব তোমায় রাত্রি দিন।
হাতে আমার মুগুর আছে তাই কি হেথায় থাকবে না?
মুগুর আমার হাল্কা এমন মারলে তোমায় লাগবে না।
অভয় দিচ্ছি, শুনছ না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দুটা?
বসলে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা!

আমি আছি, গিন্নী আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে—
সবাই মিলে কামড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।

শাশ্বতী | সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে,
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া ;
স্বর্ণ সুযোগে লুকাচুরি-খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো-ছায়া ।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে ;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি :
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী ।
কুহেলীকলুষ, দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে ;
বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে ।
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকী ;
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা :
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি ;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা ॥

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে ।
সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে ;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে ।
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী ;[1]
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি ;

একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে ;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে ।[২]

শক্তিদল ফিরেছে সগৌরবে :
অথবা আবার তাকে সুধাসংকেতে ;
মনমুকুলিত তারই দেহসৌরভে
অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে ।
ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অনাদি সাগরে উধাও অগাধ থেকে ;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি ;
রাত্রি বাষ্পময় তারই প্রত্যভিষেকে ।[৩]
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি-সম ,
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে ,
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম ,
'কভু সে আজ আর কারে ভালোবাসে ।[৪]
স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা :
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না ॥

(১) প্রথম সংস্করণের পাঠ :
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী ,
দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ :
বাসা বেঁধেছিল সাতটি অমরাবতী ;
(২) প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ :
প্রলয়ের পথ দিল অবারিত ক'রে ॥
(৩) দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ :
দিবা শিশিরে তারই স্বেদ অভিষেকে ।
(৪) প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ :
আজি সে কেবল আর কারে ভালোবাসে ।

উটপাখী | সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?
কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকাবে? ধু ধু করে মরুভূমি,
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই,
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাকপুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা॥

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,
সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও,
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনও বিপদ্প্রাজ্ঞ নও।
নব সংসার পাতি গে আবার চলো
যে-কোনও নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে॥

কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা
গ'ড়ে তুলব না লোহার চিড়িয়াখানা,
ডেকে আনব না হাজার হাজার ক্রেতা
ছাঁটতে তোমার অনাবশ্যক ডানা।

ভূমিতে ছড়ালে অকাতরে পালকগুলি,
শ্রবণশোভন গীজন বানাব তাতে,
উড়াও তাদের উড্ডীন পদধূলি
পুচ্ছে পুচ্ছে খুঁজব না অমারাতে।
তোমার নিবিড়ে বাজাব না ঝুমঝুমি,
নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে;
সে-পাড়া-জুড়ানো বুলবুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় যে উপনিবেশে।

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি:
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি।

পরমা । মণীশ ঘটক

আর কেহ বুঝিবে না, তোমাতে আমাতে
এ বোঝাপড়ার পালা সাঙ্গ করে যাব আজ রাতে
অন্তরঙ্গ আলাপনে।
রাত্রির অকাল সমাপনে
শান্তস্বর, নিস্তব্ধ হয়ে এল বায়ু

তৃতীয়ার চন্দ্রের প্রমায়ু
হোলো শেষ। মেঘলোক হয়ে পার
ঘনিষ্ঠ আশ্লেষ বহে পরম আত্মীয় অন্ধকার।

হলা পিয় সহি,
কাম্বর জিগীষা বক্ষে অতীতের সে নিষাদ নহি আমি নহি।
একদা যে আসঙ্গের ক্রূর আক্রমণ
সদর্পে উপেক্ষিয়া কুমারীর আত্মরক্ষা পণ
বধির বাসব হস্তচ্যুত বজ্রসম
তোমারে করিলো চূর্ণ, আমারি নির্মম
স্বার্থ পরমার্থ দ্বন্দ্বে আজি নির্বাপিত
সে অনল, স্মৃতি ভস্মস্তূপে সমাহিত।

অনন্ত কাল আবর্তনে
মহীরুহ হয়েছে অঙ্গার হয়তো পরম কোন ক্ষণে
অঙ্গারে ফুটিবে হীরা আজি সে প্রসঙ্গ অবান্তর।

পূর্ণ ... যৌবনের মধ্যাহ্ন ভাস্কর
সেদিন জ্বলিতেছিল এ দেহ অম্বরে
দিকে দিগন্তরে
সঘনে শ্বসিতেছিল অগ্নিবর্ষী শ্বাস
চক্ষে ভরি ত্রাস
তুমি কেন ঝাঁপ দিলে সে ধ্বংস উৎসবে?
যৌবন গৌরবে
বল্কল বাঁধন মুক্ত তুঙ্গ স্তনদ্বয়
সহসা উদ্বেল হোলো শুভ্র বক্ষময়।
অজ্ঞাত শঙ্কায়
অপাঙ্গে অনঙ্গতীর মুহুর্মুহু ধর্ষিল হায়।
শিহরিল প্রবাল অধর
কেন্দ্রীভূত কামনার চুম্বক বিদ্যুতে থরথর।

আশ্রম আশ্রয় ত্যজি আজন্ম তাপসী কমণ্ডলু
নিষ্কলুষা কুহেলীর নৃত্যচ্ছন্দে হলে আবির্ভূতা
নিষ্করুণ কিরাতের পরুষ সংস্পর্শে আচম্বিতে,
মন্ত্রমুগ্ধা, হারালে সম্বিৎ
হায় সখি হায়
তুমি ত জানিলে নাকো সেই মৃগয়ায়
এক অস্ত্রে হত হোলো মৃগী ও নিষাদ!
আদি বিপ্র উন্মোচিল প্লাবনের বাঁধ,
সেই পথ দিয়া
প্রেম এলো লজ্জাময় দুকূল প্লাবিয়া
জগতীর সমারোহে,
অনাহত আলো হাওয়া বহে
দুর্বার প্রবাহে তুলি উদ্দাম কল্লোল,
আমার নিখিল তারি উল্লাসে আজিও উতরোল

যুবনাশ্ব না? : মণীশ ঘটক

আরে কে ও,
যুবনাশ্ব না?
এসো এসো সাক্ষাৎ, এতদিন পর,
তোমার আমলের
কোনো শালা আর বেঁচে নেই এই অধম ছাড়া।
নরক গুলজার করে একা আমিই থেকে গেছি।

কী করে যে আজও টিঁকে আছি
দেবা ন জানন্তি।
তবে হয়ে এসেছে বাপ্, আমারো হয়ে এসেছে
চারদিকে চোখ মারছ
দেখছ কি বাপধন?
কুম্ভীপাক, পুন্নাম, রৌরব—
সব আহামরি জায়গা।

আগুন জ্বলছে ? দাউ দাউ করে
তা পালাবে কোথায় দোস্ত
যে দিক দিয়েই সটকাতে যাবে
ঘাড় মটকাবার জন্যে হাজির আছে
যমদূতেরা,
আর শিককাবাব করে ছেড়ে দেবে ।

মজা কি জানো স্যাঙাৎ,
আগুন জ্বালছি জিইয়ে রাখছি
তুমি আমিই
পোড়াচ্ছি, পুড়ছি তুমি আমিই
আমরা—আমাদের ।
ইয়ার্কি নয় দোস্ত
সাচ্ বাৎ ।

কি চেয়েছিলে ? কি চাও ?
খেতে, পরতে, ভালোবাসতে ?
বৌ বাচ্চা নিয়ে ছবি এঁকে গান গেয়ে,
মনের কথা বলে, লিখে, অভিনয় করে
প্রসব, সৃষ্টি করতে ?
ফিরে ফিরে মাটির টানে
নিজের প্রাণগুণের মধ্যে বার বার জন্মাতে ?
মানে
বাঁচতে চাও, বাঁচতে চাও ?
হায় বেরাদার
মাইক গর্জাচ্ছে হুকুম নেই, হুকুম নেই ।

মনে পড়ছে না,
রাম শ্যাম যদু মধু আরো অনেক জনা
তারাও তাই চেয়েছিল,
আজ কোথায় তারা ?
যমরাজার চ্যালার ডাণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে

তোমার আমার শরীরেও
এই একই পরোয়ানা জারি,
তবু শোক
ভেঙো মন, বুক বাঁধো, এগোও।

বৃষ্টি | অমিয় চক্রবর্তী

কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে

ফাল্গুন বিকেলে বৃষ্টি নামে।
শহরের পথে দ্রুত অন্ধকার।
লুটোয় পাথরে জল, হাওয়া তমস্বিনী।
আকাশে বিদ্যুৎজ্বলা বর্শা হানে
ইন্দ্রমেঘ।
কালো দিন গলির রাস্তায়।
কেঁদেও পাবে না তাকে অজস্র বর্ষার জলধারে।

নিবিড় জাজিম সব কক্ষের বুকে
অবারিত।
চকিতে গলির প্রান্তে লাল আভা: দুরন্ত সিঁদুরে
পরায় মুহূর্ত টিপ,
নিভে যায় চোখে
কম্পিত নগরীর বাড়ির জটিল কোণা রেখা
নিরাসক্তিতে লয় ছেড়ে
আবার ঝরায় জল।
জলে নাম, জলে নাম, অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া
খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।
মত্ত দিন, মুগ্ধ ক্ষণ, প্রথম বর্ষার
অবিরহ,

সেই স্মৃতিকণ
জ্যোৎস্না
মৃত্তিকার সত্তা স্মৃতিহীনা
প্রশস্ত প্রাচীন নামে নিবিড় সন্ধ্যায়,
এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব ওঠে।
ভেসে মুছে ধুয়ে ঢাকা স্পষ্ট আকাশে দৃষ্টিলোক।
কী বিহ্বল মাটি, গাছ, দাঁড়ানো মানুষ দরজায়
গুহার আঁধারে চিত্র, ঝড়ে উতরোল
বারে-বারে পাওয়া, হাওয়া, হারানো নিরন্ত ফিরে ফিরে—
ঘনমেঘলীন
কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

সংগতি | অমিয় চক্রবর্তী

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা,—
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয়-কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।
তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।
জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সন্ধ্যার আলো পাখি উড়ায়েছে পাখা,
পাখায় [illegible] তার আঁকা
প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
— [illegible]

তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা কিছু [illegible] বাজে
[illegible]।

তোমাদের [illegible] ঢাকায় [illegible] ধুলো,
যারা মরে যায় তারা শুধু—[illegible]গুলো,
কঠিন, [illegible], উদ্ধত, অসহায়,
তারা পায়, যারা [illegible] তবু না পায়।
এমন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায়—
[illegible]

সবচে [illegible] হয়েছে [illegible],
[illegible] বাঁচে যে পুরোনো পথে [illegible],
সমাকাশী আঁকি [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] নি[illegible] চট্টোপাধ্যায়

বলেছিনু — [illegible] উজ্জ্বল রাত্রি,
নিশার আকাশে জ্বলে তারকা অগণ্য,
অনন্ত ঊর্ধ্বে [illegible],
নিয়ে ঘুমায় কালো [illegible] অরণ্য।

[illegible] মোরে [illegible] কুসুম সুগন্ধে
নন্দিত বন-পথে চলার আনন্দ,

* বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র [illegible]
যার পায়, যারা সবই থেকে না'হ পায়,

কূলে কূলে গান গেয়ে চলে নদী ছন্দে,
ফুলেরে দুলিয়ে বায়ু বহিছে সুমন্দ।

মাঠে মাঠে সারাবেলা খেলে বায়ু মত্ত,
পাতায় পাতায় ঝলে শিশিরের বিন্দু,
পলাশে শিমুলে সারা কানন আরক্ত,
অন্তরে উদ্বেল আনন্দ-সিন্ধু।

দাও মোরে নির্জন নদীকূলে শান্ত
ক্ষুদ্র কুটীরখানি কোলাহল-শূন্য,
পারে তারে একা একা ফিরি উদ্‌ভ্রান্ত,
অন্তর মুক্তির সঙ্গীতে পূর্ণ।

দাও মোরে সুন্দরী প্রেয়সীর সঙ্গ
ছায়াঘন পুষ্পিত মাধবীর কুঞ্জে,
ঝরণায় গান গায়, নাচিছে কুরঙ্গ,
মধুকর গুঞ্জরে বনফুল-পুঞ্জে।

আজ বলি—ফিরে নাও যত ছিল স্বপ্ন,
নাও ফুল, নাও পাখী, কাননের কান্তি,
আপনারে লয়ে আর রহিব না মগ্ন,
শান্তির মত আর কিছু নেই ভ্রান্তি।

দাও মহামানবের ফেনিল সমুদ্র,
ওই সে গরজি আসে উদ্দাম ছন্দে,
তাথিয়া তাথিয়া থিয়া আগে নাচে রুদ্র
ভাঙনের উচ্ছল গভীর আনন্দে।

আজি দাও ধূলিমাখা পথ জনাকীর্ণ,
ভীমরবে ঘন ঘন বাজে জয়-ডঙ্কা,
জনতার হুঙ্কারে আকাশ বিদীর্ণ,
মানুষের মনে নেই মরণের শঙ্কা।

দিগন্ত জুড়ি চলে মুক্তির সৈন্য
বন্যার ধারা সম কুটিল ভ্রূভঙ্গে,
পঙ্কিল জীবনের যত কিছু দৈন্য
ভেসে যায় এই মহামরণ তরঙ্গে।

পশ্চাতে ডাকা যত হৃদয়ের কান্না,
সম্মুখে মৃত্যুর ঘন-নীল বক্ষ,
কুণ্ঠিত জীবনের লাঞ্ছনা আর না —
মুক্তির চেয়ে বড় আছে কোন্ লক্ষ্য?

ওই ডাকে প্রভাতের গর্বিত সূর্য,
আলোয় মিলাল কালো অতীতের রাত্রি,
মহাবীর, জাগো জাগো, বাজিতেছে তূর্য,
তুমি যে নবীন-প্রাণ আলোকের যাত্রী।

হঠাৎ যদি | প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা,
করি গোটাকয়েক আইন জারি
তারপরে অনায়াসে দূর ক'রে দিই সাজা।

মন্ত্রীগুলোকে ক'রে হুকুম সব
ছুটি দেবো, আজকে মহোৎসব।
ঝুরি ফাটাবে ফুল চিকন চিক
জ্বালবে ঝালর ঢাকি চতুর্দিক,
দিলদরিয়া মেজাজ ক'রে কই
বাজনগুলো সব স্ফূর্তি ক'রে বাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

হাওয়ায় বলি, হল্লা ক'রে চল
তারার বাতি নিভিয়ে দলে-দল
অন্ধকারে সত্যি কথার শেষে
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে।
ঘুমের ঘোরে সেপাইগুলো ঢোলে,
তাদের ধ'রে খুব ক'ষে দিই সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

সুপ্তিমগন পদ্মাবতীর পুরে
মহল বেড়াই টহল দিয়ে ঘুরে।
ধীরে গিয়ে বসি শিয়রদেশে
একটি মালা পরায়ে দিই কেশে,
হৃদয়খানি জোর ক'রে নিই কেড়ে;
বুকে বেঁধে দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

ওলট-পালট করি বিশ্বখানা
ভাঙি যেথায় যত নিষেধ মানা;
মনের মতো কানুন করি ক'টা
রাজা হওয়ার খুব ক'রে নিই ঘটা।
সত্য, তা সে যতই বড় হোক
কঠোর হ'লে দিই তাহারে সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

নিরর্থক : প্রেমেন্দ্র মিত্র

যতই কাজের ভিড়ে হও না
আনমনেই তোমায় খুঁজবে
শাখা, পাতি, কাঠালে, কুলোয়
কত কী যে কানে গুঁজবে !
চাঁদ দেখবে, দেখবে, দেখবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
কোনো ঠিক শিরায় শোণিতে
অজান্তে ছোঁয়া বুঝবে !

যেখানেই কেন বন্ধ্যা হও না,
ঘুরেই নিজের ফিরবে !
অন্যমনের তারাতে চাইলে
সেই নেশাতেই ফিরবে !
ডাকে সাড়া দেবে, দেবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
ইশারে, সোহাগে, আদরে, বাসরে,
মামুলী ছন্দ কে ছিঁড়বে ?

নিরুদ্দেশে পাল তুলে তবু
নিজেরই সীমানা ভুলবে,
যেখানেই কেন উধাও হও না,
পায়ে তাল দেওয়া ভুলবে !
দোলা দেবে, দেবে, দেবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
ছাড়া পেতে ছোটো যেখানে, খুঁটির
বাঁধন কী ক'রে খুলবে ?

যেখানেই কেন নোঙর ফেল না,
সাগর তবুও ডাকবে !
নদী ছেড়ে যদি ডাঙ্গায় তবু
ঝোড়ো হাওয়া তালে লাগবে !

নাড়া দেবে, দেবে, দেবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
কসলের জল ঢালে যে, সে-মেঘই
মোহ-মুদ্গর হাঁকবে!

জীবনানন্দ | প্রেমেন্দ্র মিত্র

সেই এক নাগরিক
এই শহরের পথে
একা একা ঘুরেছে অনেক।
ট্রাম, বাস, বিজ্ঞাপন,
মোড়ে মোড়ে ভিড় আর আলো,
আর গাঢ় স্তব্ধ মধ্যরাত
মনুমেণ্ট গীর্জার মাথায়—
সব কিছু দেখেছে সে
কখনো প্রবাসী কিংবা প্রণয়ীর মত।

তারপর
নিরিবিলি আপনার নীড়ের গভীরে,
মিশিয়েছে তার সাথে
ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে
হলুদ ফসলে ভরা মাঠ,
চিল-পুরুষের ডাক
সূচিবিদ্ধ শূন্যতার মত,
আর বুঝি প্যাঁচাদের ডানায় ধূসর
রাত্রির কুয়াশা, ঠিক ভুলে-যাওয়া শোকের মতন।

নেই সেই নাগরিক আর।
নগর-আত্মার কাছে নিবেদিত হ'য়ে
রেখে গেছে তবু এক সবুজ প্রত্যয়,
আভা যার কিছু কিছু
ছড়াবেই বহুদূর সমুদ্র-সময়।

সে বুঝি গিয়েছে জেনে,
সত্য যা তা আপনাতে আপনিই ধ্রুব নয় সব !
তারে পূর্ণ করে' চলে
আমাদেরই রক্তে-বওয়া
গূঢ় এক দীপ্ত অনুভব !

হারিয়ে | প্রেমেন্দ্র মিত্র

কোনো দিন গেছ কি হারিয়ে,
হাট-বাট নগর ছাড়িয়ে
দিশাহারা মাঠে,
একটি শিমুলগাছ নিয়ে
আকাশের বেলা যেথা কাটে ?

সেখানে অনেক পথ খুঁজে
[illegible] [illegible] চোখ বুজে
মেলিয়ে হৃদয়।
[illegible] শিমুল শুধু একা
চুপ করে' রয়।

পথ খুঁজে যারা হয়রান
কোনো দিন সেই ময়দান
তারা পেয়ে যায়।
হঠাৎ অবাক হয়ে
আশে পাশে ওপরে তাকায়।

কোনো পথ যেখানেতে নেই
সেখানেই মেলে এক সেই
আরেক আস্বাদ।
সব পথ হারাবার পর
বুঝি খোঁজ মেলে আপনার।

একদিন যেও না হারিয়ে
চেনা মুখ শহর ছাড়িয়ে
অজানা প্রান্তরে,
একটি শিমুল আর আকাশ যেখানে
মুখোমুখি চায় পরস্পরে।

বদলটা অন্ধকারে হয় | অরুণ মিত্র

বদলটা অন্ধকারে হয়,
ঘুমঘুম ট্রেনে চেপে আমি রওনা হই।
চকের জলন্ত ঘণ্টাঘর আর আমাকে টানে না
পড়শীরা তাদের দুর্গের ফোকর থেকে
হাসি ছুঁড়ে বলে না, অভিযানে যাও।
অভিযান!
পতঙ্গের মতো ঝটপট
দু'চোখ বন্ধ ক'রে মাথাকোটা,
আবার ফিরে এলে
ঘুলঘুলির ফাঁকে বরণ-মুদ্রা
যেন মস্ত বিজয়কে আমি বন্দিনী ক'রে এনেছি।
অথচ আমার তো জানা
পায়ের তলায় রাস্তাগুলো কেমন উল্টে থাকে,
এবং বুকে হেঁটে আমার যাওয়া
সেই স্তম্ভটা পর্যন্ত,
ফিরতি পথে একশোবার হাঁটু ভেঙে বসা
আর শুকনো পাতার গাদায় মুখ গোঁজা,
মহল্লায় এসে গেলে পথ জুড়ে দুর্গ,
পাঁচিলের ভিতরে আমার জন্যে তৈরী
নিঝঝুম বিশ্রাম।

আমি রাতের ট্রেনে পাড়ি দিই,
সমস্ত পথ ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ
আমাদের কথায় শব্দ,
জানলা দিয়ে তাকালে
এপার ওপার কালো দীঘি
পাড় অবধি গাছগাছালির ঢল,
চোখের দু'পাতা এক করলে
শনশন কালবৈশাখী
আর মৌসুমী হাওয়ার মর্মর।
মেঘ কেটে গেলেই রোদ
আমার ছোটবেলার হাতোপুটির রোদ,
প্রকাণ্ড বটশিমুলের মাথায় সূর্য
উপরে নিচে পাশে পাহাড় বাজনা
নীলমাটির মাতন.
আমি পৌঁছলাম।

দুরন্ত স্রোতে আমার পা
ঘাসমাটিপাথরে ছুঁয়ে
ঘরবাড়ি টলতে টলতে
আমাকে মাঝখানে নিয়ে দুরন্ত,
লক্ষ বুক বিস্ফোরণের আশায়
আর, কি এ আহা আগমনীর গান,
কোন আশ্বিনের সুর
বুলার ছোট মুঠোয় ধরা,
আমি পৌঁছলাম
আমার বুকের বাংলায় আমার বাংলাদেশে

রাজধানী | জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

ইতিহাসই জানে, আর তুমি জানো নাজির হাসান,
দরিবা কালানে এক পুরোনো দালানে বসে—
ধাঁধিলাগা দিল্লীর খোলা-আকাশ চোখে
তুরুক্-সওয়ার ঘোড়া খুরে খুরে শব্দের স্বপ্নই দেখো।
এখন হঠাৎ টুক্‌রো বর্তমান নিয়ে,
টাঙাওয়ালা, স্কুটারের শব্দ ধাবমান,
মন্‌সবদার কোনো বাস থেকে নামে—,
কব্‌রীর দল মুখে চমকে ওঠো নাজির হাসান॥

অনেক দূরের পথ—ইন্দ্রপ্রস্থ পার হয়ে,
অতিবৃদ্ধ পিতামহ রাজধানী পাশা খেলা হেরে,
যুগে যুগে পাঠান মুঘল্ রাজ্যে যুধিষ্ঠির হয়ে
মিশে গেছে ইংরাজের কালে।
এখন পাণ্ডব-পণ্ড ইন্দ্রপ্রস্থে, পাণ্ডুর বাতাসে,
বিবস্ত্র বেপথু কোনো দ্রৌপদীর কান্না নিয়ে,
আধুনিক রেডিওর গান, আর রাস্তায়
বরাত্-মিছিলে, মেশে সিনেমার ধুন্!
শ্রদ্ধা হয় তোমাকেই, তোমার এই বিচিত্র কেশাগ্রে,
সময়ের মদ পান করে মত্ত সুচারু গেলাসে,
রাজধানী ছিলে তুমি সিপাহী বিদ্রোহেও—।
রাস্তায় রাস্তায় মোড়ে ফাঁসাকাঠ, খুনী দরবাজা
হুঁশিয়ারী চীৎকার!—ক্ষুধিত পাষাণ!

একটি প্রবল ইচ্ছা সমবেত হয়ে,
মরে মরে ধূলি হয়ে গেছে সব দিল্লীর রাস্তায়।
তবু, কতখানি সব মনে আছে তোমার জানি না।
নাজির হাসান,
সেদিনও যেমন,
এখনও অগুণ্‌তি সব সবুজ টিয়ার ঝাঁক
ময়ূরের বর্ণালী বিলাস,

সন্ধ্যার আরক্ত আকাশ আর লাল কেল্লা ছুঁয়ে
যমুনার পারে উড়ে যায়, বর্ণাঢ্য পাখায় —
লাল-নীল-সবুজের শামিয়ানা
ঢেকে রাখে আকাশের চোখ।
শাহ্‌জাহান আলমগীর বাহাদুর শাহেরাও
পিষে গেছে সব—
হাতির পায়ের তলে অপরাধী যেমন।
ঘাম আর গায়ের রক্ত জল করে করে,
গড়ে তোলে সাধারণ লোক,
ভাস্কর কামার,
নিপুণ প্রতিমা সব
প্রাসাদে মসজিদে
এরই নর্ম বিচিত্র আড়ালে
চাঁদনি চকের কালো অন্ধকার গলির গহনে
তোমাকেও চিনেছিল, নাজির হাসান,
সুরমাটানা মৃত্যুহানা চোখ
তুর্কী সুন্দরীর।
তোমার যৌবন ছিল আঙুরের মত,
নিটোল, মদির।

আজ সবই ইতিহাস।
অথচ তুমি ও আমি, আমরা সবাই
এখানেই আছি, এই রাজধানীতেই
মিলে মিশে এক গালিচায়।
ওপরে, পালাম থেকে জেট প্লেন
পুরোনো আকাশটাকে ছিঁড়ে চলে যায়।
সন্ধ্যা নামে, শবাচারী শকুনের ভিড়ে—
আগুনের আলো জ্বলে, হল্লা শোনা যায় দূরে,
রাস্তার মোড়ে।
আমি সেই মন্বন্তরে, দিল্লীর বাস থেকে নেমে
জানাই সেলাম—।

পুরোনো কালের ঢুলু ঢুলু চোখে
চারপাইএ উবু হয়ে বসে,
ফর্‌শীর নল মুখে চম্‌কে ওঠো নাজির হাসান।

রবীন্দ্র ঠাকুর | জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

প্রথম কিশোর-চোখে মেলে ধরেছিলে দূর
প্রান্তরের আলো।
আনন্দের নবধারাপাতে কোন বিস্ময়ের ভাষা
ফুটেছিল মুখে। বাধাবন্ধহীন আশা
স্বপ্ন-ভঙ্গ নির্ঝরের দুরন্ত দুরাশা
রক্তের চঞ্চল গানে—তোমারই সে সুর!
রবীন্দ্র ঠাকুর॥

বিচিত্র এ ঋতুজালে জড়ানো জীবন।
সোনার স্বপনঘেরা মাঠ পথ নদী বন পর্বত প্রান্তর,
জনপদবধূ গ্রাম পদ্মাপার দেশ-দেশান্তর।
বর্ষার আকাশ জুড়ে মেঘের মাদলে মত্ত
শ্রাবণী গাজন—
তোমারই যে ইন্দ্রজাল, ইন্দ্রধনু মন।
মর্মে মর্মে ভরে দিলে বিচিত্র সে সুর
রবীন্দ্র ঠাকুর॥

তোমার অরণ্য হতে ছিন্নপত্র ভেসে আসে
আমারই অঙ্গনে।
গন্ধ পাই, ফুটে গেছে শালের মঞ্জরী
দূর বসন্তের বনে
হঠাৎ-উধাও হওয়া সুদূর পিয়াসী মন,
রাঙামাটি-পথচলা প্রাণের বাউল—
আঙুলে আঙুলে কাঁপা একতারা হৃদয়ের তারে
বাজায় রাগিণী।

স্বপ্নের নীল পাখি ডানা নাড়ে প্রাণের গহনে।
জানা-অজানার মাঝে, দেখা-না-দেখায় মেশা
রহস্য-আলোক
জাগালো প্রথম শোক। অন্তর মন্থন করে
উঠে এলো আবেগের বর্ণলক্ষ্মী—বাজালো নূপুর।
সে তোমারই সুর জেনো, রবীন্দ্র ঠাকুর॥

তোমার বিহঙ্গ-মন হঠাৎ কখন নিচে
নেমে আসে মানুষের মনে
কালো মাটি দিয়ে গড়া পৃথিবীর বাসা—
তারই পরে করে ভর।
নিবিড় রসের ধারা পান করে তৃষিত অন্তর।
আমার চৈতন্যলোক আলোড়িত করে তুমি দিলে,
মানুষের সহজ নিখিলে।
তোমারই ঢাকীর ঢাক বাজে খালে বিলে।
তারই প্রতিধ্বনি ভরে বিপুল সুদূর—
রবীন্দ্র ঠাকুর॥

অনেক তো দিলে তুমি
মধুর, শ্যামল, কাম্য জীবনের গান—
তোমার সঙ্গীতছায়াস্নিগ্ধ এ পৃথিবী
চূর্ণ চূর্ণ হবে আজ, ভাবতেও পারি না।
দানবের ষড়যন্ত্রে
খাণ্ডবের দাবদাহ পলাশের বনে—
আণবিক ধ্বংসের প্রাঙ্গণে।
হিংসার বিষাক্ত বাষ্প গগনে গগনে।
তুমি তো জান না,
তোমারই সে-কৃষ্ণকলি
অনাহারে মরে ধুঁকে ধুঁকে কোনো অন্নহীন গ্রামে।
আবিশ্ব মড়ক নামে।
সে হরিণ-চোখ আজ জ্বলে জ্বলে যায় বুঝি পুড়ে
নিঠুর মৃগয়া চলে সারা বিশ্ব জুড়ে।

তোমার প্রাণের কান্তি দাও আমাদের।
বজ্র হয়ে বাজুক এ বাঁশী।
দুর্মদ সুন্দর এক যৌবন-প্লাবনে
মৃত্যুর ভ্রূকুটি যাক ডুবে।
তোমার নামেই আমরা শপথ করেছি —
তোমারই দেওয়া এ গান, আকাশ আলোর হাসি
বিশ্বের অন্তরে রাখবো—আমরণ পণ।
আমাদের ঐকতানে তোমার এ অগ্নিবীণা বাজুক মধুর —
রবীন্দ্র ঠাকুর॥

ডাক্ সাজ প্রতিমায় রং দেয় অভিরাম পাল | জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

বাড়ীভাড়া বাকি কয়মাস, তবু
রুগ্ন ক্লান্ত দেহটুকু ঘিরে
অত্যাশ্চর্য আবরণ নিয়ে, ঘোরে
তালি দেওয়া অস্তিত্বের সামগ্রী সংগ্রহে —
অভিরাম পাল।
লগ্ন-জরী কন্যা তার,
স্ত্রীও ধোঁকে শ্বাস রোগে।
রেশন আনার কড়ি, বাড়ন্ত, সংসারে।
বাঁচবার অধিকার ধার করে
কয়েকদিন চলে।
তারপর অনিবার্য, শেষ হয়ে যাওয়া।
এই তো সেদিন,
ছোট ভাই মারা গেল গুলি খেয়ে
রাস্তার মোড়ে।
ওদিকে, অনেক রাত্রে ফেরে,
একদা সুন্দরী তার বোন—
তণিমাকে চেনে সব পাড়ার মস্তান্।

অভ্যাস পঙ্কিল ঘৃণ্য জীবনের ক্লেদ পুঞ্জ
শত-ছেদ ঘিরে,
অবিরাম ঘূর্ণাবর্ত রচে।
ইতিমধ্যে আকাশ কি ফরসা হয়ে ওঠে!
নীল নীল আকাশের গায়ে লাগে
কাশ-ফুল মেঘ!
ছোট ছোট সারি সারি আশ্বিনের বাৎসরিক সমারোহ
ভেসে ওঠে চোখে।
ঢাকীরা বায়না নেয়।
স্কুলের উদগ্রীব ছেলে-মেয়েদের শিরদাঁড়া বেয়ে
ছুটি শিরশিরিয়ে ওঠে
খেলা-খেলা অন্ধকারে-আলো,
ভাঙা দালানের কোণে,
উঠোনের ঘাস-ওঠা বুকে।
স্টেশন, ট্রেনের বাঁশী, পোড়া কয়লার ধোঁয়া-গন্ধ, আর
হঠাৎ দূরের দেশ, পাহাড়ের বাঁক ঘুরে পদ্ম-বিল।
এই সব চাল চিত্র নিয়ে,
গহনার নৌকা করে প্রতিমারা পিতৃগৃহে আসে।
বুকে টোকা পড়ে যায় ভাঙা দরজায়—
সামন্ত বাড়ীর   পেয়াদারা
বায়না নিয়ে আসে,—মোটাধাম্ পূজার দালান।
ভুলে গেল,
আজ কাল পরশুর কথা ভুলে গেল।
অনশন অর্ধাশন বিরোধ বিদ্রোহ আর মিছিলের সং।
সব ভুলে গিয়ে, আশ্বিনের সোনার সকাল।
ডাক সাজ প্রতিমায় রং দেয় অভিরাম পাল।

কাস্তে | দিনেশ দাশ

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
শেল্ আর বোম হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!

বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি[1]
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ-যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে!

লোহা আর ইস্পাতে দুনিয়া[2]
যারা কাল করেছিল পূর্ণ,[3]
কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে
নিজেরাই চূর্ণ-বিচূর্ণ।

চূর্ণ এ লোহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
ক্ষয়িত গলিত হয় মাটিতে,[4]
মাটির—মাটির যুগ ঊর্ধ্বে!

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই, চেয়ে দেখ বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে?
এ-মাটির কাস্তেটা বন্ধু!

বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র পাঠ:

(১) নতুন চাঁদের বাঁকা
(২) ইস্পাতে কামানেতে দুনিয়া
(৩) কাল যারা করেছিলো পূর্ণ,
(৪) গ'লে পরিণত হয় মাটিতে,

ব্যাঘ্র-দিন । দিনেশ দাস

সুন্দরবন !
আমার গ্রামের শিয়রে জাগিছে সাগরান্ত
সুন্দরবন !
সুন্দরবনের আত্মা আমার ব্যাঘ্রদিন
খুঁজছে কোথায় ব্যাঘ্র-দিন,
যেথা নখর
তীক্ষ্ণ থাবায় ভয়ঙ্কর,
বর্শা ফলকে
পলকে পলকে
জীবন মৃত্যু সম্মুখীন,
হারাল কোথায় ব্যাঘ্র-দিন !

এই যে পৃথিবী চক্রবালে
দূর দূর অন্তরালে
কেনিয়ায়
সুদূর জঙ্গল আফ্রিকায়
তারা কি এখন অমলীন
আমাদের সেই ব্যাঘ্র-দিন ?

সেই পুরাতন দিনগুলি আজ নির্বাসিত
পৃথিবীতে
চতুর্দিকে
তাকিয়ে থাকে,
ফাঁক পেলে তারা ছিঁড়বে এই সভ্যতাকে,
আফ্রিকারই জাফ্রি-ফাঁকে
তাকিয়ে থাকে ।

অনন্তকাল রইবে না কেউ অমলীন,
তাই তো সভ্য-জগতে মশাল কী দুর্দিন :
আবার তারা যে করবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ
শঙ্কাহীন
সেই পুরাতন ব্যাঘ্র-দিন ।

দোলনা | দিনেশ দাস

আজকে ছোট দোলনাখানি ঝুলিয়ে দাও
ঘুমের চামর বুলিয়ে দাও
জীবনদোলা দুলিয়ে দাও।

নীল আকাশের নীলগুলি সব নিংড়ে আনো
নতুন মেঘের সজল কালো মনভুলানো
নিংড়ে আনো
হাজার কচি করুণ চোখে মেঘের কাজল বুলিয়ে দাও
ককিয়ে-ওঠা কান্নাগুলি ভুলিয়ে দাও
আজকে ছোট দোলনাখানি দুলিয়ে দাও।

আজকে দেশের এ-প্রান্তরে
তেপান্তরে
হাজার শত দেবতা-শিশু ককিয়ে মরে
অনাবৃত অনাদৃত
জীবন্মৃত স্তূপীকৃত।

আজকে পথে নীড়-হারানো
হাজার হাজার নতুন জীবন কুড়িয়ে আনো
কুড়িয়ে আনো
হাজার কচি শুকনো চোখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দাও
কান্নাহাসির জীবনদোলা দুলিয়ে দাও।

আলোর গান | পরমানন্দ সরস্বতী

একটি ছোটো পাখি নির্জন ডালে বসে
অনেকক্ষণ ধরে অবিরল আমন্ত্রণ জানিয়েছে,
আশ্চর্য সকাল হলো—
আলোর স্পর্শে কুঁড়ি হল ফুল,
আলোর নদীতে ডানা ভাসায় প্রজাপতি
কী বিচিত্র রঙের মায়া ছড়ালো—

মৌমাছি, মাছি, কালোভ্রমর করে গুঞ্জন
কেউ বসে নেই—
এরা সবাই পৃথিবীকে কিছু দেয়,
কী সুন্দর লাগে পৃথিবী

রাত্রির আকাশ হয় অন্ধকার
কিন্তু অন্ধকারে হারিয়ে যায় না রাত্রি
জেলে রাখে অসংখ্য তারা
আলোর ফুলকি—
অপরূপ হয়ে ওঠে অন্ধকার

শরীর তোমাকে ঘিরে আছে,
শরীরের সুখ — আদিম বাসনা,
সেখানে জেলে রাখ
তোমার মনকে, আত্মাকে —
অপরূপ হয়ে উঠবে তুমি
মৌমাছি অতি ক্ষুদ্র শরীরে করে বাস,
সে ফুলের পাতায় বসে
পিঁপড়ে থাকে রুক্ষ ধুলোয়
ধুলোর রেণু থেকে খুঁজে নেয় অমৃতের কণা।

আর তুমি শুধু শরীরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবে,
ঘোর অন্ধকারে থাকবে ডুবে ?
অসংখ্য কামনার কীট
তোমাকে রাখবে ঢেকে,
আর ক্ষমাহীন মৃত্যু আনবে কষ্ট,
দেহে জরার চকখড়ি যাবে এঁকে।

কত রৌদ্র রাত্রি
অপরূপ আকাশ ঝরছে
তোমার চারদিকে—
কী তুমি পেলে,
কী দিয়েছো পৃথিবীকে ?

ছোটো বুনোফুল বুকে নেয় আলোর পরশ
একটা জায়গা সে আলো করে রাখে,
পায়ের নিচের ঘাস
অক্লান্ত সবুজ স্নেহে ঢেকে রাখে রুক্ষ মাটির বুক।
তুমি শুধু কামনার কালি মেখে
কালো করে যাবে ঈশ্বরের আকাশ,
দুষ্ট হিংসার ক্ষতে, লোভের প্রহারে হবে
তুমি নিস্তব্ধ, বিকৃত—
বিধাতার মহৎ সৃষ্টি তুমি
তোমার সত্তার গভীরে জ্বলছে
অনির্বাণ অগ্নি,
সেই অগ্নির অক্ষরে লিখে রাখ
আপন স্বাক্ষর,
চিরদিন জ্বলুক   জ্বলুক মৃত্যুকে তুচ্ছ করে
কয়েকটি উজ্জ্বল প্রহর।
শরীরের ক্ষুধায় অন্ধকারে হারিয়ে যাবে তুমি ?
এই পৃথিবীর আকাশ আলো মাটি
সবই সুন্দর হতে চায়,
অশেষ সুন্দর হবার বেদনা সবার বুকে—
ঈশ্বর তোমার মধ্যে সুন্দর হয়ে বাঁচতে চান,
কান পাত তুমিও শুনবে বুকের অন্ধকারে
কে কাঁদছে,
তুমি সুন্দর হও।
এজন্য তিনি সৃজন করেছেন
তোমাকে ঘিরে এত রূপ রস
আনন্দের আয়োজন॥

আমার চাই ফুলের আগুন | পরমানন্দ সরস্বতী

১

আমার চাই ফুলের আগুন
বসন্তকে আপনি পুড়ুক
শিব অশিবের সঙ্গ সখ্য,
মনে দোলার মতন কি তা।

বাঘ ধরেছি সোনার খাঁচায়
দু'টো ঘুঘু একটা কুলায়।
ছুঁড়ে ফেলুন শীতের ফুল
ডাঁসামাছের বিঁধছে হুল।
আলোর ঝাঁপি খোলা মিছে
গুঞ্জন খুঁজন তার পিছে।

আমি এখন ভীষণ কাতর
ইতর ফুলের চাই আতর।
বিকোয় কি ফুল কথার হাটে?
দুই ডাকিনী নাচছে নাটে।

আমার এখন চাই কি, কি,
রক্ত মাংস চর্বি ঘি
সুখের মলম মাখে গায়ে
সোনার পাখি রুপোর দাঁড়ে
আকাশ কুসুম সাপের মণি,
সেই সঙ্গে চাই হতে ধনী

২

রক্ত রঙে ঝরছে পলাশ
আমাকে দিন দু'টো গোলাপ।
পুরুষ ফুলের পরাগ পরশ
খোঁড়া অন্ধ করুক সরস।

শালি অন্নে নুন ঘি—
সুখের আপনি বুঝেন কি ?
ইষ্টনাশের মিষ্টি মুখ
অলস স্বপ্নে ভরে বুক।
যদি মেটে গানের বাই,
কোকিল পুড়ে ছাই খাই।
অতি তীব্র এই নেশা
রক্তে আবার বিষ মেশা।

সেজ বিছানো পরের ঘরে,
আপনি রবেন হৃদয় ভরে।
একটা ঘরে দুইটা নায়ক
বুকে বিঁধছে কঠিন সায়ক।
কোথায় যাই, কি যে করি !
নিজের জ্বালায় নিজে মরি,
গলায় দেবার খুঁজছি দড়ি
রক্ত এবং প্রেমের ঋণ
শোধবো কিসে তা বলে দিন ॥

ঝাউয়ের শব্দ | হরপ্রসাদ মিত্র

একটি সরল সূত্রে সমস্ত ঘটনা বাঁধা নয়।
কতো শারীরিক স্বাদ কতো মানসিক কাটাকুটি
শ্রাবণে শরৎ যেন যখন হঠাৎ হাসে রোদ,
গাছের মসৃণ ডালে কাঠবিড়ালীর চলা-ফেরা,
পাকা পেয়ারার গন্ধে আচ্ছন্ন বাতাস
আনে অন্য পৃথিবীর স্বাদ।

একটি সরল সূত্রে সমস্ত ঘটনা বাঁধা নয়।
কোনো শান্ত উপত্যকা, কোনো দূর সমুদ্রের জল,

কোনো মিলনের সুখ ছিল।
শ্রাবণে প্রগাঢ় মেঘে সব ঢেকে দেয়।
অদ্ভুত যন্ত্রণা এই শরীরের প্রতি রোমকূপে,
বাতাস কী শব্দ করে ঝাউয়ের পাতায়।

একটি সরল সূত্রে সমস্ত কাহিনী বাঁধা নয়।
নবাঙ্কুর্‌কি কটি যুবকের বেপরোয়া মুখ
আতশবাজির মতো জ্বলে নিভে যায়;
যুবতীরা হৃদয়ের দোর খুলে রাখে
যথাযথ বাস্তব আইনে।
জন্ম মৃত্যু রোগ শোক স্বর্গ ও নরক যথাযথ।
বাতাস কী শব্দ করে ঝাউয়ের পাতায় দিন-রাত!

একটি সরল সূত্রে সকল ঘটনা বাঁধা নয়।
রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধের কুহক ফেলে রেখে
শালিক ফড়িং পশু মানুষেরা সব চলে যায়।
নতুন পৃথিবী জন্ম নেয়।
বাতাস কী শব্দ করে ঝাউয়ের পাতায়।

মুখ দেখি কাঁসের আলোতে | মণীন্দ্র রায়

শস্য প্রতীক্ষায় থাকে,
বোবা বীজ পাথুরে চাতালে
নিষ্ফলা; মাটিকে আমি
কোপাই, লাঙলে বিঁধি
জল ঢেলে কাদা ছানি,
রোদ্দুরে ওল্‌টাই, দিনে দিনে
বকলায় নিঃশব্দ গূঢ় গবেষণাগারে
জড়ের চেতনা; ক্রমে
মাটি কথা বলে;
ভরে মাঠ প্রেমের ফসলে।

আমি মাঠ ছেড়ে যাব আকাশে ; উধাও
ওড়ে এরোপ্লেন ; ভেবে ছাখো
গতির শিরায় তার কেমন গণিত :
দ্রুত প্রপেলারে, পাখা, পুচ্ছ-তাড়নায়
বেতারে রেডারে শত জটিল আলোয়
সুইচের লাল-নীল বোতামের চোখে
ঝড়ের ঝাপটে, হাওয়া-শূন্যের থাবায়
সে আমার কালজয় তৃষা—
তৃপ্ত করে আমারই মনীষা।

হে আমার অধ্যুষিত দেশ।
মাটি ও নদীতে তুমি,
বৃক্ষে তুমি, শস্যে ও সেবায় ;
তুমি আছ যন্ত্রে বাষ্পে বিদ্যুতে খনিতে,
গন্‌গন্‌ বয়লারে তুমি, কর্মের চাকায়—
তবুও তোমাকে আমি পাইনা কেন-যে ?
আছি কার খোঁজে ?
সেকি তুমি মাঠ নও, গাছ নও,
নও জলধারা ?
নও শুধু অন্ন, নও কেবলি নির্মাণ ?
যন্ত্রের পিছনে মন, লাঙলের পিছে
মানুষ, মানুষ তুমি, চেতনা, হৃদয় ;

তুমি স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, দীর্ঘ ইতিহাস
পানিপথে, পলাশিতে, ব্যারাকপুরের
তোপের আগুনে, ক্রোধে, আর যুগে যুগে
ঘর বাঁধা, বুকে টানা, পথে পথে হাঁটা
ঢেউয়ের উত্থান আর পতনের মতো
ক্রমাগত, যুগপৎ, সংঘর্ষে সবল
খণ্ড খণ্ড কামনায় সমগ্র ভুবন
ভেঙে গড়ে ধাবমান, হে মানুষী দেশ,
চলন্ত স্বপ্নের ওই দ্রুত খরস্রোতে
মুখ দেখি কাঁসের আলোতে ?

নক্সীকাঁথার কাহিনী | মণীন্দ্র রায়

সামনে তার হারিকেন চিমনিভাঙা কালিতে আচ্ছন্ন,
শীতের সন্ধ্যায় ফের সরঞ্জাম নিয়ে বসল মেয়ে।
ছেঁড়া কাপড়ের ফালি, রঙিন সেমিজ টুকিটাকি—
আর দেরি নয়,
পৌষে না হোক মাঘে সে আসবেই, সময় আসন্ন;
ছুঁচে চলে হাত, চলে লাল নীল সুতো, নক্সা ওঠে;
মুখে তার আলো পড়ে, চারিদিক ছায়া-ছায়া, আর
মন স্বপ্নময়।

উঠোনে নিমের ছায়া, ঈষৎ হাওয়ায় পাতা কাঁপে,
পোষা কুকুরের ছানা কুণ্ডলী পাকিয়ে বারান্দায়,
এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে এলোমেলো কথা ভেসে আসে,
চাপা অন্ধকার!
এ সময়ে মন যেন বুকের খাঁচায় মাথা কোটে,
ঝাপটিয়ে দুখানি ডানা খোঁজে মুক্ত স্মৃতির আকাশ—
হায়রে কোথায় সেই হারানো সংসার, কতো দূরে
নীল পদ্মাপার।

তবু শোক নয়, দুঃখ অশ্রু মোছে আপন উত্তাপে।
(যেখানে আদর নেই, অভিমান কে করে নির্বোধ!)
লাজুক গাঁয়ের মেয়ে, নির্ঝরের গুহা ভেঙে সেও
নেমেছে প্রান্তরে।
স্বামীকে পাঠায় রোজ ফুটপাতের দোকান আগলাতে,
তিন বাড়ি কাজ সেরে গা-গতরে ক্লান্তি ব'য়ে নিজে
জিনায়ে স্বপ্নকে তার বাঁধে রাঙা সুতোর নক্সায়
কাঁথার উপরে।

কে দেখেছে জীবনের অপচয় বেশি তার চেয়ে?
কে সয়েছে এত গ্লানি রাণাঘাটে, ক্যাম্পে ক্যাম্পে, পথে,
উড়িষ্যার তেপান্তরে জনহীন দ্বীপান্তরে আর
হাওড়ার স্টেশনে?

অচল পয়সার মতো পরিত্যক্ত, তবু বার বার
কে এমন ফিরে আসে, ঘর বাঁধে, কার এত আশা ?
দারিদ্র্যের কাঁটাগাছে দুরন্ত স্বপ্নের রাঙাফুল
ফোটাতে কে জানে !

সন্ধ্যায় লণ্ঠন জেলে বসে তাই বারান্দায় মেয়ে।
নিভে গেছে দিন তার, ক্ষয়ে যায় রাত্রির বিশ্রাম,
সেলায়ের ফোঁড়ে ফোঁড়ে যন্ত্রণা ও স্বপ্ন তবু যেন
স্বর্গে তোলে মাথা।
পৌষে না হোক মাঘে যে আসবে সে নবজাতকের
ধূলিশয্যা ঢেকে দিতে পৃথিবীর মতো ধৈর্যময়ী
সুতীব্র ইচ্ছায় বিঁধে আদিগন্ত শস্যের মাটিতে
রচে নক্সীকাঁথা॥

মিছিলের মুখ | সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ,
মুষ্টিবদ্ধ একটি শাণিত হাত
আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত ;
বিস্রস্ত কয়েকটি কেশাগ্র
আগুনের শিখার মত হাওয়ায় কম্পমান।
ময়দানে মিশে গেলেও
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের ফেনিল চূড়ায়
ফস্‌ফরাসের মত জ্বলজ্বল করতে থাকল
মিছিলের সেই মুখ।

সভা ভেঙে গেল, ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ল ভিড়
আর মাটির দিকে নামানো হাতের অরণ্যে
পায়ে পায়ে হারিয়ে গেল
মিছিলের সেই মুখ।

আজও দুবেলা পথে ঘুরি
ভিড় দেখলে দাঁড়াই
যদি কোথাও খুঁজে পাই মিছিলের সেই মুখ।

কারো বাঁশির মত নাক ভাল লাগে,
কারো হরিণের মত চাহনি নেশা ধরায়—
কিন্তু হাত তাদের নামানো মাটির দিকে,
মহাক্রুদ্ধ সমুদ্রে জলে ওঠে না তাদের দৃপ্ত মুখ
কম্যুনার্দের মত।
আমাকে উজ্জীবিত করে সমুদ্রের একটি স্বপ্ন
মিছিলের একটি মুখ।

অন্য সব মুখ যখন দুর্মূল্য প্রসাধনের প্রতিযোগিতায়
কুৎসিত বিকৃতিকে চাপার চেষ্টা করে,
পচা শবের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্যে
গায়ে সুগন্ধি ঢালে,
তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুখ
নিষ্কোষিত তরবারির মত
জেগে উঠে আমাকে জাগায়।

অন্ধকারে হাতে হাতে তাই গুঁজে দিই আমি
নিষিদ্ধ এক ইস্তাহার,
জরাজীর্ণ ইমারতের ভিৎ ধ্বসিয়ে দিতে
ডাক দিই
যাতে উদ্বেলিত মিছিলে একটি মুখ দেহ পায়
আর সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত ভালবাসা
দুটি হৃদয়ের সেতুপথে
পারাপার করতে পারে।

কেন এল না | সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সারাটা দিন ছেলেটা নেচে নেচে বেড়িয়েছে।

রাস্তায় আলো জলেছে অনেকক্ষণ
এখনও
বাবা কেন এল না, মা ?

বলে গেল
মাইনে নিয়ে সকাল-সকাল ফিরবে।
পুজোর যা কেনাকাটা
এইবেলা সেরে ফেলতে হবে।

বলে গেল।
সেই মানুষ এখনও এল না।
কড়ার গায়ে খুন্তিটা
আজ একটু বেশি রকম নড়ছে।
ফ্যান গালতে গিয়ে
পা-টা পুড়ে গেল।

জানলার দিকে মুখ করে
ছেলেটা বই নিয়ে বসল মাদুরে
সামনে ইতিহাসের পাতা খোলা—

ঘড়িতে টিকটিক শব্দ।
কলে জল পড়ছে।
ও-বাড়ির পাঁচিলটা থেকে লাফিয়ে নামল
একটা গোঁফঅলা বেড়াল।

বাপের-আদরে মাথা-খাওয়া ছেলের মত
হিজিবিজি অক্ষরগুলো একগুঁয়ে
অবাধ্য—
যতক্ষণ পুজোর জামা কেনা না হচ্ছে
নড়বে না।

এখনও
বাবা কেন এল না, মা ?

রান্না কোন্‌কালে শেষ
পা ধোয়াও সারা
মা এখন বুনতে বসে
কেবলি ঘর ভুল করছে।

খুট করে একটা শব্দ—
ছিটকিনি খোলায়।
কে ?
মা, আমি খোকা।

গলির দরজায় ছেলেটা দাঁড়িয়ে।
এখন রেডিওয় খবর বলছে।
মানুষটা এখনও কেন এল না ?

একটু এগিয়ে দেখবে বলে
ছে[illegible]লটা রাস্তায় পা দিল।
মোড়ে [illegible] ভিড় ;
একটা কালো [illegible]পা গাড়ি ;
আর খুব বাজি [illegible]টছে।

কিসের পুজো আজ ?
ছেলেটা দেখে আসতে গেল ?

তারপর অনেক রাত্তিরে
বারুদের গন্ধে-ভরা রাস্তা দিয়ে
অনেক অলিগলি ঘুরে
মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে
বাবা এল।

ছেলে এল না।

শুধু ভাঙা নয় | সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।
চাষের জন্যে যে জমিটা পেলে ভাল হয়
সে তো ঠিক
বালি চিক-চিক
ভাঙা নয়।

দেখ দেখ, এই ছোট্ট সবুজ উঠোনেই—

হামাগুড়ি দেয়,
ব্যথা পেলে কাঁদে,
প'ড়ে গেলে ঠেলে ওঠে কের,
ছোট ছোট দুটো মুঠো দিয়ে বাঁধে
সাধ আহ্লাদ আমাদের।

হাত ছেড়ে দিলে দেয়ালটা ধ'রে
করে হাঁটি-হাঁটি পা-পা।
ভুলে যেন তাকে
দিও না কো মাটি চাপা।

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।

এখনও আকাশ সূর্যের রঙে
রাঙা নয়।
শিয়রে দাঁড়িয়ে থাবা তুলে আছে
গলিতনখ এ রাত্রি।
তবু যদি দুটি একটি করেও পাপড়ি
খুলে যায়,
কাছে থেকো—
পাছে কোনো মদমত্ত হাতির পায়ে
সেটুকুও হয় খেঁতো।

ক্রমাগত চোখ থাড়িয়ে থাড়িয়ে
যারা হয়ে গেছে অন্ধ
তাদের নাকের কাছে ধ'রে দিও
ফুলের একটু গন্ধ।

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।

মৃত্যুটা যত বড়ই হোক না—
জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে
ঢ্যাঙা নয়।

যার লাগে না কো মিষ্টি
মানুষের এই সৃষ্টি,
যে বলবে এই পৃথিবীতে আছে
এক রং
শুধু রক্তের—
যত থাক নামডাক তার
যত বড় দল থাকুক অন্ধভক্তের—
টেকে কি না টেকে
একবার ভালো কবিরাজ ডেকে
অচিয়ে দেখানো দরকার।

ভেঙো না কো, শুধু ভাঙা নয়।
মন দাও আজ
এর চেয়ে আরও তাজা রঙে এঁকে
দেশ জুড়ে আরও ভালো এক ছবি
টাঙানোয়।
আও একটি জীবনকে ঘরে আনা যাক
—একটুও যার ভাঙা নয়।

এখন ভাবনা | সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১

এখন একটু চোখে চোখে রাখো—
দিনগুলো ভারি দামালো ;
দেখো,
যেন আমাদের অসাবধানে
এই দামালো দিনগুলো
গড়াতে গড়াতে
গড়াতে গড়াতে
আগুনের মধ্যে না পড়ে।

আমার ভালোবাসাগুলোকে নিয়েই
আমার ভাবনা।
এখন সেই বয়েস, যখন
দূরেরটা বিলক্ষণ স্পষ্ট—
শুধু কাছেরটাই ঝাপ্‌সা দেখায়।

এখন সেই বয়েস, যখন
আচম্‌কা মাটিতে
পড়ে যেতে যেতে মনে হয়
হাতে একটা শক্ত লাঠি থাকলে ভাল হত।

২

পিছনে তাকালে আজও দেখতে পাই—
সিংহের কালো কেশর ফুলিয়ে
গর্জমান সমুদ্র ;
দেয়ালে গুলির দাগ,
ভাঙা স্লেট, ছেঁড়া জুতোয়
ছত্রাকার রাস্তা,
পায়ে পায়ে ছিটিয়ে যাওয়া রক্ত।

মুক্তির বহুবর্ণ বাসনার নিচে
যৌবনকে পণ ধরেছিল জীবন।

ঠিক তেমনি দূরে,
কত দূরে ঠিক জানি না,
আজও দেখতে পাচ্ছি—
হিরণ্যগর্ভ দিন
হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আসছে।
গান গেয়ে
আমাকে বলছে দাঁড়াতে।

গুচ্ছ গুচ্ছ ধানের মধ্যে দাঁড়িয়ে
তার বলিষ্ঠ হাত দুটো আমি দেখতে পাচ্ছি—
আমি শেষবারের মত
মাটিতে প'ড়ে যাবার আগে
আমার ভালবাসাগুলোকে
নিরাপদে তার হাতে
পৌঁছে দিতে চাই।

মেজাজ | সুভাষ মুখোপাধ্যায়

থলির ভেতর হাত ঢেকে
শাশুড়ি বিড় বিড় করে মালা জপছেন;
বউ
খট্‌খট্ খট্‌খট্ করে হেঁটে গেল।

আওয়াজটা বেয়াড়া, খোকার আটপৌরে নয়।
যেন বাড়িতে ফেরিঅলা ডেকে
শখ করে নতুন কেনা হয়েছে।

সুতরাং
মালাটা থেমে গেল ;   এবং
চোখ দুটো বিষ হয়ে
ঘাড়টাকে হেলিয়ে দিয়ে যেদিকে বউ যাচ্ছিল
সেই দিকে চলে পড়ল।
নিচের চোয়ালটা সামনে ঠেলে
দাঁতে দাঁত লাগল।
বিলক্ষণ রাগ দেখিয়ে
পরমুহূর্তেই শাশুড়ির দাঁত চোখ ঘাড় চোয়াল
যে যার জায়গায় ফিরে এল।
তারপর সারা বাড়িটাকে আঁচড়ে আঁচড়ে
কলতলায়
ঝমর ঝম খনর খন ক্যাচ ঘ্যাঁষঘিঁষ ক্যাঁচর ক্যাঁচর
শব্দ উঠল।
বাসনগুলো কোনোদিন তো এত ঝাঁঝ দেখায় না—
বড় তেল হয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে মালাটা দাঁড়িয়ে পড়ল।
নোড়া দিয়ে মুখ ভেঙে দিতে হয়—
মালাটা একবার ঝাঁকুনি খেয়ে
আবার চলতে লাগল।

নাকে অস্ফুট শব্দ করে
থলির ভেতর পাঁচটা আঙুল হঠাৎ
মালাটার গলা টিপে ধরল।
মিনুদের আক্কেলও বলিহারি!
কোত্থেকে এক কালো অলক্ষুণে
পায়ে খুরঅলা খিঙ্গী মেয়ে ধরে এনে
ছেলেটার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।
কেন? বাংলাদেশে ফরসা মেয়ে ছিল না?
বাপ অবশ্য দিয়েছিল থুয়েছিল—

হাঁ, দিয়েছিল!
গলায় কণ্ঠি দিয়ে আদার করা হয়েছিল না?

এবার মালাটাকে দয়া করে ছেড়ে দেওয়া হল।
শাশুড়ির মুখ দেখে মনে হচ্ছিল
থলির ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এই সময়ে
কী যেন তিনি লুকোচ্ছিলেন।
একটা জিনিস—
ক'মাস আগে বউমা
মরবার জন্যে বিষ খেয়েছিল
ভাগ্যিস্যে ডাক্তার না হলে
ও-বউ এ-বংশের গালে ঠিক চুনকালি মাখাত।
কেন? অসুখ করে মরলে কী হয়?
ঢঙী আর বলেছে কাকে!

হাতে একরাশ ময়লা কাপড় নিয়ে
কালো বউ
গটগট গটগট করে সামনে দিয়ে চলে গেল।

নাঃ, আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।
'বউমা—'
'বলুন।'
উঁহু, গলার স্বরটা ঠিক কাছা-গলায়-দেওয়ার মত নয়,
বড্ড ক্যাড়া।
হঠাৎ এই দেমাক এল কোত্থেকে?
বাপের বাড়ির কেউ তো
ভাইফোঁটার পর আর এদিক মাড়ায় নি?

বাড়িটা যেন ঝড়ের অপেক্ষায়
থমথম করছে।
ছোট ছেলে কলেজে,

মেজোটি সামনের বাড়ির রোয়াকে বসে
রাস্তায় মেয়ে দেখছে ;
ফরসা ফরসা মেয়ে
বউদির মত ভূতুড়ি কালো নয়।

বালতি ঠনঠনিয়ে
বউ যেন মা-কালীর মত রণরঙ্গিণী বেশে
কোমরে আঁচল জড়িয়ে
চোখে চোখ রেখে শাশুড়ির সামনে দাঁড়ালো।

শাশুড়ির কেমন যেন
হঠাৎ গা ছমছম করতে লাগল।
তাড়াতাড়ি থলির মধ্যে হাতটা লুকিয়ে ফেলে
চোখ নামিয়ে বললেন :   আচ্ছা থাক, এখন যাও।
বউ মাথা উঁচু করে
গটগট গটগট করে চলে গেল।

তারপর একা একা পা ছড়িয়ে বসে
মোটা চশমায় কাঁথা সেলাই করতে করতে
শাশুড়ি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে ভাবতে লাগলেন
বউ হঠাৎ কেন বিগড়ে গেল
তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার।

তারপর দরজা দেবার পর
রাত্রে
বড় ছেলের ঘরে আড়ি পেতে
এই এই কথা কানে এল—

বউ বলছে :   'একটা সুখবর আছে।'
পরের কথাগুলো এত আস্তে যে শোনা গেল না।
খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ,
মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করছিল।

কিন্তু তারপরটা শেষ হওয়া দরকার—
বউয়ের গলা, মা কান খাড়া করলেন।
বলছে: 'দেখো, ঠিক আমার মত কালো হবে।'
এরপর একটা ঠাস করে শব্দ হওয়া উচিত।
ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছে:
'কী নাম দেব, জানো?
আফ্রিকা।
কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে।'

যেতে যেতে | সুভাষ মুখোপাধ্যায়

তারপর যে-তে যে-তে যে-তে
এক নদীর সঙ্গে দেখা।

পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা
পরনে
উড়ু-উড়ু ঢেউয়ের
নীল ঘাগরা।

সে নদীর দুদিকে দুটো মুখ।

এক মুখে সে আমাকে আসছি বলে
দাঁড় করিয়ে রেখে
অন্য মুখে
ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

আর
যেতে যেতে বুঝিয়ে দিল
আমি অমনি করে আসি
অমনি করে যাই।

বুঝিয়ে দিল
আমি থেকেও নেই,
না থেকেও আছি।

আমার কাঁধের ওপর হাত রাখল
সময়
তারপর কানের কাছে
ফিসফিস করে বলল—

দেখলে!
কাণ্ডটা দেখলে!
আমি কিন্তু কক্ষনো
তোমাকে ছেড়ে থাকি না।

তার কথা শুনে
হাতের মুঠোটা খুললাম।
কাল রাত্রের বাসি ফুলগুলো
সত্যিই শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।

২

গল্পটার কোনো মাথামুণ্ডু নেই বলে
বুড়োধাড়ীদের একেবারেই
ভাল লাগল না।
আর তাছাড়া
গল্পটা বনোনো।

পাছে তারা উঠে যায়
তাই তাড়াতাড়ি
ভয়ে ভয়ে আবার আরম্ভ করলাম :
'তারপর যে-তে যে-তে যে-তে···
দেখি বনের মধ্যে
আলো-জ্বালা প্রকাণ্ড এক শহর।

সেখানে খাঁ-খাঁ করছে বাড়ি ;
আর সিঁড়িগুলো সব
যেন স্বর্গে উঠে গেছে।

তারই একটাতে
দেখি চুল এলো করে বসে আছে
এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা।'...

লোকগুলোর চোখ চকচক করে উঠল।

তাদের চোখে চোখ রেখে
আমি বলতে লাগলাম—

'তারপর সেই রাজকন্যা
আমার আঙুলে আঙুল জড়ালো।
আমি তাকে আস্তে আস্তে বললাম :

'তুমি আশা,
তুমি আমার জীবন।'

শুনে সে বলল :
'এতদিন তোমার জন্যেই
আমি হাঁ করে বসে আছি।'
বুড়োধাড়ীরা আগ্রহে উঠে বসে
জিগেস করল : 'তারপর ?'

ব্যাপারটা তাদের মাথায় যাতে ঢোকে
তার জন্যে
ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে
মিলিয়ে যেতে যেতে আমি বললাম—

'তারপর ? কী বলব—
সেই রাক্ষসীই আমাকে খেলো।'

নিরাকাশ | সন্তোষকুমার ঘোষ

কোথায় উঠবে ভেবে ভেবে সেদিন সন্ধ্যাতারাটা দিশাহারা। চেনা, প্রতিদিনের জানা আকাশটাকে আর খুঁজে পায় না। গেল কোথায়? এই তো গতকালও এখানেই ছিল। মেঘ-টেঘ উড়িয়ে দিয়ে একেবারে নিপাট নীল। তারাটা শুনেছে, দিনের যৌবনে এই আকাশটাই একদম গনগনে হয়ে থাকে। একটা কোণে একটু লালচে ছিট ছড়িয়ে পড়ে। তো, সেই বিকেলের দিকে। এখন এই সন্ধ্যাবেলা সেই আকাশ গা-ঢাকা দিল কোথায়? এদিকে তারাটার ফোটার সময় যে পেরিয়ে যায়! সে কাতর প্রার্থনা জানাতে থাকে, সময়টুকু ফুরোবার আগেই তুমি ফিরে এসো, হে আকাশ, আমার আকাশ!

ঝিকমিক আলো ফেলে ফেলে তারাটা তাকে খোঁজে। নেই। কোথায় অনেকখানি নীলচে বাষ্প জমেছে, তার আড়ালে কি লুকোলো আকাশটা? তারাটা গন্ধ শোঁকে। নেই। অত বড় মস্ত একটা ঢাকনার আকার যার, সে গা-ঢাকা দিলই বা কী করে, অবাক কাণ্ড। হার মানছি। ফিরে এসো তুমি।

তুমি নেই বলে দ্যাখো আকাশ, আজ রাত্তির হতে পারেনি, অথচ সব অন্ধকার। কাল সকালেও দিনের পায়ের আওয়াজ বাজবে কোথায়, হলই বা দশ দিক আলোয় আলো। দিন নেই, রাত নেই, এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার, অদ্ভুতভাবে উধাও হয়ে গিয়ে ঘটাতে খালি তুমিই পারো।

মানছি তো, তুমি পারো, পারো, পারো। এবার ফেরো। আকুল তারাটা বলতে থাকল, জানি তোমার মায়া-দয়া নেই, তুমি খামখেয়ালী, নীলের নিচে তুমি ভীষণ কালো। রোজ কত উল্কা ছুঁড়ে দাও খেলতে খেলতে, কত বুড়ো-ধাড়ি তারাদেরও ঝরিয়ে দাও, তাদের শুকনো ফুলের মতো ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে মারো। কোনোটাকে বা শেষ করো আঁতুড়েই। তোমার অঢেল তারা, তাই দু-দশটা কেন, হাজার-দু'হাজার খসে পড়লেও কিচ্ছু যায় আসে না। কিন্তু আমাদের—তারাদের—যে একটাই আকাশ। সেটাও হারিয়ে গেলে আমরা কোথায় উঠব, কোথায় ফুটব, আর একটা আকাশ কোন্‌খানে, কখনও কি, খুঁজে পাব?

নিরাশ, নিরাশ্রয় সন্ধ্যাতারা ভয়ে ভয়ে চোখ বোজে। তার গা-ঢালা আলো গলে গলে পড়ে যায়, সে আস্তে আস্তে জোনাকির টিপের মতো ছোট্ট হতে থাকে।

জননী জন্মভূমিশ্চ | বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

যিনি চলে গেলেন
তাঁকে ম্লান মুখেই চলে যেতে দিয়েছি ,
সেজন্য আমার ভিতরে কি
কোনো গভীর বেদনা আছে ?

মানুষ নামের এক রকম পাথর,
তাতে আলো পড়ে না
অন্ধকার নড়ে না
কিছুই হয় না…

মাঝে মধ্যেই মনে হয়
আয়নার সামনে কেউ দাঁড়ালে
শুধু আয়নাটাই কথা বলে ।
কী যে বলে, তা শুনবার মানুষ
আজ আর আমি খুঁজে পাই না ।

২

আমার জন্মভূমি,
আমি অনেক দিন তাঁকে দেখি না
তাঁর কোনো খবর রাখি না ।
তিনি কি এখনও কুয়াশায় কাঁথামুড়ি দিয়ে
আগের মতোই নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে আছেন ?

আমার ছেলেবেলায়
যেমন তাঁকে দেখেছিলাম,
শীর্ণ দুটি হাত ঘুমের ভেতর কেঁপে কেঁপে উঠছে !

নাকি অনেকক্ষণ ভোর হয়ে গেছে
পাখি ডেকেছে, ফুল ফুটেছে ।

তারপর বাঘের মতো এক দুপুর এসে আমার মায়ের
পাড়া-জ্বালানো ছোট ছেলেটাকে···

তার কোনো চিহ্নই আর পাওয়া গেল না,
নদীর এপারে না
ওপারে না।

হয়তো সে আমার নিজের ভাই ছিল না,
কিন্তু তাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।
চারদিকে এখন কত ফুল, কত পাখি···
হয়তো এভাবেই একদিন দুপুর গড়িয়ে
বিকেল আসে।

তারপর সন্ধ্যা নামবে, রাত গভীর হবে—
আমি তখন পাথরের মতো ঘুমুবো।

এসো, আমরা প্রেমের গান গাই | বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাজা দেখলাম, রানী দেখলাম
এবার একটু মানুষের কাছে বসতে চাই।

এসো আমরা প্রেমের গান গাই।

এসো, আমাদের প্রিয় কবির কাছে যাই,
তাকে বলি :
আপনি গাছ ফুল পাখি ভালবাসেন
আপনি মানুষ ভালবাসেন—

'প্রেমের গান গাইতে আমাদের গলা কেঁপে যায়,
আপনি আমাদের গান শেখান।'

রাজা দেখলাম, রানী দেখলাম
এবার আমরা আমাদের প্রিয় কবির কাছে ফিরে যাবো।

তিনি আমাদের সেই গান শেখাবেন
যা তুমি আর আমি গাইতে চাই।

এইসব ছাইপাঁশ কবিতা আর ভাল লাগে না।
আর ভাল লাগে না ওদের মুখের ওপর
ঘৃণার কবিতা ছুঁড়ে দিতে।

এ কোনো মানুষের জীবন নয়, কবির জীবন নয়!

কিন্তু আমাদের চারদিকে বড় বেশি অন্ধকার।
আমরা কবির কাছে যেতে চাই, কিন্তু অন্ধকার···

অন্ধকারে আলাদিনের দৈত্য আমাদের পথ রুখে দাঁড়ায়
সে আমাদের কাছ থেকে কবিতা লেখার খাজনা চায়
সে আমাদের আইন শেখাতে চায়।

এসো, তাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিই, আমরা খাজনা দেবো না।
আমরা সেই রাজা মানি না যার কাছে প্রেমের গান কোনো গান নয়।
আমরা সেই রানী মানি না যিনি আমাদের ভয় দেখিয়ে খাঁচার
পাখি বানাতে চান।

তাকে আমরা সহজ, স্পষ্ট গদ্য ভাষায় আমাদের বক্তব্য বলবো;
তার জন্য, রাজা রানীদের জন্য, কোনো ঘৃণার কবিতাও আর নয়।

তারপর, অন্ধকারে যেদিকে দু'চোখ যায়, আমরা এগিয়ে যাবো।
কবিকে না পাই, আমরা চিৎকার করে তাঁর কবিতা বলবো—
আমাদের বেসুরো গলায় হয়তো উচ্চারণ ঠিকমত হবে না,
হয়তো তাঁর প্রেমের গান কান্নার মত শোনাবে;

কিন্তু আমরা চেষ্টা করবো, আমাদের গান যেন কান্না না হয়
যেন আমাদের ভালবাসা কবিতার আগুনে নম্র হয়, পবিত্র হয়—

মানুষের জন্য। আমরা মানুষকে স্পর্শ করতে চাই।
আমাদের প্রেমের গান
যদি গান হয়ে না ওঠে, তবু মানুষ আছে, মানুষ থেকে যায়···

তারপর নতুন কবিরা আসবে, শুদ্ধ উচ্চারণে তারা প্রেমের গান গাইবে…
আমরা তো শুধু রাস্তা হাঁটছি…
অন্ধকারে চলতে চলতে, আছাড় খেতে খেতে, বারবার ভুল
গান গাইতে গাইতে
তুমি আর আমি কান পেতে থাকবো

তুমি আর আমি কান পেতে থাকবো : 'কে যায় অন্ধকারে?'…
'কে আসে?'

বেহুলা-নাচানো স্বর্গ | বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অয়ি পদ্মপলাশলোচনা
তোর চোখে কি পড়লো ধুলো?
যেন নীলাকাশ জুড়ে লাল মেঘ
আর মেঘে মেঘে ঝড় এলো!

তোর কী হ'লো আজকে ললনা?
কোন্ কুটিল ঐরাবত
দিল নীলোৎপলেও বেদনা
আহা, রাঙা হ'লো কোকনদ!

নাকি নিয়তির বাঁকা তলোয়ার
নীল নয়নে দিয়েছে দাগ—
ঝাঁকে ফুলে ফুলে তাজা রক্ত
তোর শিলীমুখ অনুরাগ?

এই নিশীথ-শিথিল নিদাঘে
ওকি কালবৈশাখী জ্বালা!
বুঝি পূর্বরাগের সোহাগে
নিলি নীলকণ্ঠের মালা?

তাই অহিদংশনে জরোজর
তোর কম্পিত পয়োধরে
এত বজ্রবদলের ঘটা কি ?
দেখে ইন্দ্রেরও ভয় করে।

তুই তথাপি বেহুঁশ নটিনী ?
চার দেয়ালের বাঁধনে
নষ্টা নক্তচারীর ভিড়ে কি
তোর লজ্জাও নেই মনে !

এ কি যৌন-জ্বরের জলসায়
তুই শুধু দিলি অঞ্জলি—
হাসি কান্নার চুনি-পান্নায়
খুঁজে দিলি ছেঁড়া কঙ্কলা।

ও কি দেবতা অসুর তড়পড়
বোবা যন্ত্রের কোলাহলে !
এই বেহুলা-নাচানো স্বর্গ ?
সে যে আগুনের মতো জ্বলে !

মেঘ বৃষ্টি ঝড় | মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

চলে এলুম, তোমায় ছেড়ে চলে এলুম।
নদী আমার হারানো দিন ভালোবাসার ভীরু আশায়,
তবু তোমায় ছেড়ে এলুম ছেড়ে এলুম।

চষা-জমির কানে কানেই ভোরবেলায় সোনালী গান
পেয়েছিলুম পেয়েছিলুম তার বুকেই ফিরে আসার
ইশারা : প্রাণ, সবুজ ধান, সোনালী ধান।

তবু কখন ঈশানে মেঘ ঈষৎ চায়—
তবুও তার ধূসর চোখ ঘূর্ণি-ঘুমঘুম হাসায়
মাটির বুক কাটায় ঘষে প্রাণ বাঁচায়।

কোথায় ডুবে মিলিয়ে যায় নদী তোমার তাল-তমাল।
মরাই নেই, ধানও নেই সবুজ ধান ভালোবাসার।
ঈশান আনে জোর তুফান, ঘোর আকাল।

২

সব শেষ?
সবুজ দিন, শ্রান্তিহরা আকাশ নেই নেই—
সব শেষ?
ছাড়াই মাঠ, ছাড়াই হাট ধূসর পায়ে পায়ে
মিলছি ভুখ-মিছিলে গাঁয়ে গাঁয়ে,
কারখানায় অন্ধ, দিকভ্রান্ত, ভয় ভয়,
মনের দিকপ্রান্তে ঠিক সন্ধ্যা হয় হয়,
ভালোবাসার
ভীরু আশার
এই কি শেষ নয়?

কখন এরি মধ্যে সেই আশার হাতছানি—
তোমায় খুঁজি; এদিক-ওদিক চলছে কানাকানি।
কোথাও তুমি নেই-যে তাও জানি।
সেই তোমার সবুজ শাড়ি, কালো কাজল-চোখ
ছিঁড়ল টেনে সংগ্রামের সংঘাতের নখ।
সময় নেই, সময় নেই
কবে জানাই শোক।

তবু জানাই শোক!

হঠাৎ কালো হাওয়ায় তাই কিসের গুঞ্জন
যত্নে যদি মেলাই হাত মেলায় হাত মন,
কিসের গুঞ্জন।
শুরু মেঘ লক্ষ বুকে হৃদয় দেয় শোধ।
যন্ত্রণায় যুদ্ধ। প্রতিরোধ।

আকাশভরা হাওয়ায় ঝরা-পাতার মর্মর—
কখন এল ঝড়?

৩

শেষ রাত্রে মরুধূলির ঝড় এল।
তারপর হঠাৎ এলোমেলো
হাওয়া, হাওয়ায় বৃষ্টি নামল।
তারপর কখন ভোরের চমক। বৃষ্টি থামল।

৪

জানতুম। তুমি ঘোমটা-টানা ফুল রজনীগন্ধা,
লজ্জা-পাওয়া দাঁড়িয়ে-ওঠা সন্ধ্যা—
নিরাশ্রয় এক গাঁয়ের মেয়ে।
ধান ভানতে, জল আনতে
অজানাতে পথ বেয়ে:

সুখেই ছিলুম, এমন দিনে আকাল এল।
ঘর ছাড়লুম, জীবন কী যে দশায় গেল:
সঙ্গে তুমি। পথ হারালে
পা বাড়ালে
ঝড়ে।
রইল না কেউ ঘরে সুখের ঘরে।

তারপর সেই ঝড়ের হাওয়ায়
হঠাৎ-জাগা অন্ধকারে আবার দেখি তোমায়:
পাগলা হাওয়ায় চুল উড়ছে
চুল ঘুরছে
জ্বালামুখীর সাপ—
চোখে তোমার প্রলয়-পীত তাপ—
তখন আবার ভাবলুম, একি তুমিই? তুমি সুখী তো নও!
প্রাণের মধ্যে আজও আদিম আগুন কি বও?
তাই কি ঝড়ের হাজার ফণায় আগুন জ্বলে?
তারপর সেই আগুন গলে চোখের জলে।
আমার মনের আবাদ ভরে বৃষ্টি ঝরে-- সোনাও ফলে।

গান ধরলুম আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।
ফিরব যখন ভাঙা বাসায়—দাওয়ায় মাটি লেপে
চাষ করব, গান ধরব, ধানও দেব মেপে।
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।

তারপর কখন ভোর হয়েছে,
বৃষ্টি নেই, হাওয়ায় আলোর ঘোর রয়েছে।
উঠে বসলুম,
সুখে হাসলুম,
মনে ভাবলুম—এবার তুমি আসবে,
আবার ভালোবাসবে।
আবার আমি ঘর বাঁধব, মন সাধব জীর্ণ দেহে
জীবনকে ফের গড়ে তোলার গভীর স্নেহে।

জননী যন্ত্রণা | মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

জন্মে মুখে কান্না দিলে, ভাসিয়ে দিলে ভেলা
একূল-ওকূল দুকূল মজা কালনাগিনীর দ'য়
রাত মজাল ডোবাল দিন ঢেউয়ের ছেলেখেলা
সামনে—সে জল, জল পেছনে ভরাডুবির ভয়।
জীবন চেয়ে পেলাম কেবল হাওয়ার হা হা হা হা
পাহাড় থমকে পাথর, নদীর পা টিপে পথ ভাঙা
বাপের চোখে অভিসম্পাত দূর আকাশের চাওয়া
একটি পাশে আছড়ে পড়ে মূর্ছা বোন : ভাঙা।
ঘাট চাইতে হাট পেরোলাম, গান চেয়ে কান্না
রাতের জন্যে ঘর যা পেলাম—পা তো টানে না
ছায়ার মত এক কোণে বউ, দুয়ারে তার ছা—
হাসতে জানে না বাছা কান্না জানে না।
এক যে ছেলে, জোয়ান ছেলে, কই সে ছেলের মা
ঘর যে তোমার ঘরে ঘরে জননী যন্ত্রণা।

জন্মে দুঃখে কান্না দিলে, ভাসিয়ে দিলে ভেলা
একূল-ওকূল দুকূল বন্যা কালনাগিনীর দয়
জলকে দিলাম সাঁতার দিলাম ঢেউকে হেলাফেলা
চরকে দিলাম ডুবাডুবি—কান্না আমার নয়।
কালিঢালা নদী, বাঁকে ও কার নৌকা, আলো
নেই-মনিষ্যি তেপান্তরে পথ চিনে কে যায় ?
সে আমি সেই আমরা—আমরা কে মন্দ কে ভালো
কেউ মাঠে কেউ ঘরে কেউ বা জেলে কারখানায়।
একটি তারা নিভিয়ে কখন হাজার তারা জ্বালে :
এক ছেলেকে হারালে—ছেলে এলাম হাজার জনা
একটি আশা অনেক দুঃখের পাপড়িতে মুখ মেলে :
এক নামে যেই ডাকলে—অনেক হলাম যে একজনা।
ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা —
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা।

বাংলা, হায় বাংলা | মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মন যখন মরুভূমি, সে দগ্ধ দিন, দুপুর
আগুন, ঘরে আগুন দেহে আগুন প্রাণ চিতায়,
জীবন ফণিমনসা, তার বিষ, বিষের কাঁটায়
রক্ত সেই রক্ত রেখে ঊর্ধ্বমুখ উধাও
মন যখন চাতক চায় স্ফটিক জল, ডানায়
তখন তুমি হাওয়া ? তখন গুনগুনিয়ে শোনাও
মাঠপারের বাউল মাঠে-মাঠে উদাস ? কখন
ভাটিয়ালিতে সজল মায়া-কাজল তুমি ? কখন
বাংলা ? হ'লে বাংলা ? তুমি বাংলাদেশ আমার !

কত না দিন কাটল সংসারের আলোছায়ায়
তোমার মুখ চেয়ে, কী সুখ-দুঃখে জমজমাট।
কখনো নীল আকাশ ধান হলুদ মাঠ সবুজ
কমলারঙ-সন্ধ্যা সাধ-মেটানো দিনশেষের,

কখনো আশা ভাষা হারাল, না-বলা ভালবাসাই
সবুজে লালে আব্‌ছা-নীলে কমলাঘোর রাতের
স্বপ্নে নীল তুষার, গ'লে গ'লে সকালে বেড়ায়
ফুটল সে-ই বেগ্‌নি ফুল—উঁকিতে তার নরম
খুশিতে তুমি বাংলা হ'লে বাংলাদেশ আমার!

তবু তো ঢের বর্গী এল ধুলো ধুলোয় ধূসর
রাঙামাটির পথে, পদক্ষেপ রক্তে রঙিন;
বুলবুলিরা ধান খেয়েছে প্রায় প্রতিটি বছর;
বাকি-বকেয়া খাজনা শুধে ভিটেমাটির মায়াও
ছেড়েছি বারবার ফিরেছি দেশে দেশান্তরেই।
নানা পথের পরে কদমছায়াছড়ানো মায়ায়
রক্তে তবু যমুনা কোন্ পিছটানেই উজান—
ফিরেছি বারবার ভেবেছি এ কি করুণ-কঠোর
নিশির ডাক? হাতছানি কি? নাকি বাংলা আমার!

আজও তো দিকভ্রান্ত, বড় শ্রান্ত আজ সবাই
বাংলা, হায় বাংলা, কই বাতাস?—বন্ধ বাতাস।
নিজের হাতে দিলাম ঘরে আগুন, পাক আকাশ,
বাংলা, কই বাংলাছোঁওয়া বেগ্‌নি ফুল বেড়ায়?
এখন বুকচাপা নিঝুম অন্ধকার, এখন
বন্ধ দ্বার—দু'হাত খালি আঘাত, জোর আঘাত—
দরজা খোল একটিবার দরজা খোল, দাঁড়াও
দাঁড়াও চোখে জল ঠোঁটের কমলামেশা হাসির
আভাসে ফের দাঁড়াও, মুখ তোল না, মুখ ফেরাও
বাংলা তুমি বাংলা তুমি বাংলাদেশ আমার!

কলকাতার যীশু । নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

লাল বাতির নিষেধ ছিল না,
তবুও ঝড়ের-বেগে-ধাবমান কলকাতা শহর
অতর্কিতে থেমে গেল ;
ভয়ংকরভাবে টাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল
ট্যাক্সি ও প্রাইভেট, টেমপো, বাঘমার্কা ডবলডেকার।
'গেল গেল' আর্তনাদে রাস্তার দু-দিক থেকে যারা
ছুটে এসেছিল—
ঝাঁকা মুটে, ফিরিওয়ালা, দোকানী ও খরিদ্দার—
এখন তারাও যেন স্থির চিত্রটির মতো শিল্পীর ইজেলে
মগ্ন হয়ে আছে।
স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
টাল মাটাল পায়ে
রাস্তার এক-পার থেকে অন্য পারে হেঁটে চলে যায়
সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু

খানিক আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে চৌরঙ্গীপাড়ায়।
এখন রোদ্দুর ফের অতিদীর্ঘ বল্লমের মতো
মেঘের হৃদ্‌পিণ্ড ফুঁড়ে
নেমে আসছে ;
মায়াবী আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর।

স্টেটবাসের জানলায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি একবার তোমাকে।
ভিখারী-মায়ের শিশু,
কলকাতার যীশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ ;
জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষ্‌টানি,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই,
দুদিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।

যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে
সমগ্র বিশ্বকে তুমি পেতে চাও
হাতের মুঠোয়। যেন তাই
টাল্‌মাটাল পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক-কিনার থেকে অন্য-কিনারে চলেছ।

অমলকান্তি | নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অমলকান্তি আমার বন্ধু,
ইস্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম।
রোজ দেরি করে ক্লাসে আসত, পড়া পারত না,
শব্দরূপ জিজ্ঞেস করলে
এমন অবাক হয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকত যে,
দেখে ভারী কষ্ট হত আমাদের।

আমরা কেউ মাষ্টার হতে চেয়েছিলাম, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
অমলকান্তি সে-সব কিছু হতে চায়নি।
সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।
ক্ষান্তবর্ষণ কাক-ডাকা বিকেলের সেই লাজুক রোদ্দুর,
জাম আর জামরুলের পাতায়
যা নাকি অল্প-একটু হাসির মতন লেগে থাকে।

আমরা কেউ মাষ্টার হয়েছি, কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারেনি।
সে এখন অন্ধকার একটা ছাপাখানায় কাজ করে।
মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে;
চা খায়, এটা-ওটা গল্প করে, তারপর বলে, "উঠি তাহলে।"
আমি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

আমাদের মধ্যে যে এখন মাষ্টারি করে,
অনায়াসে সে ডাক্তার হতে পারত;
যে ডাক্তার হতে চেয়েছিল,
উকিল হলে তার এমন-কিছু ক্ষতি হত না।

অথচ, সকলেরই ইচ্ছেপূরণ হল, এক অমলকান্তি ছাড়া।
অমলকান্তি রোদ্দুর হতে পারে নি।
সেই অমলকান্তি—রোদ্দুরের কথা ভাবতে ভাবতে
যে একদিন রোদ্দুর হতে চেয়েছিল।

কলঘরে চিলের কান্না | নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এখনো তোমার সেই ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পাই;
এখনো তোমার সেই দারুণ বিলাপ
কানে বাজে।
গগনবিহারী চিল,
খর দীপ্ত দুপুরবেলায়
তুমি এক আকাশের থেকে অন্য আকাশের দিকে
তেজস্বী ও স্বভাবত সঙ্গিহীন সম্রাটের মতো
সহজ উল্লাসে
বাতাসে সাঁতার কেটে চলেছিলে।
যেতে যেতে,
শূন্যের মেখলা থেকে যে রকম উল্কা খসে যায়,
তুমিও সহসা সেই রকম
ঊর্ধ্বাকাশ থেকে এই গৃহস্থবাড়ির বারান্দায়
ছিটকে পড়েছিলে।

মুহূর্তে কাকের মেলা বসে গেল ছাতের কার্নিশে।
কা-কা অট্টহাসির বিদ্রূপে
ভরে উঠল দ্বিপ্রহর।
তখনো মরোনি তুমি। দুই চক্ষু
ঘোলাটে ও ঘূর্ণমান, বাদামী শরীর
কেঁপে কেঁপে উঠছে, ফের আকাশে উঠবার
শক্তি নেই, তবু তুমি
শরীরের শেষ বিন্দু সামর্থ্য সংগ্রহ করে
প্রাণপণে ঝাপটাচ্ছ ডানা, কখনো-বা
বাঁকিয়ে উদ্ধত গ্রীবা

খুশীমতো দেখে নিচ্ছ
অদূরে অপেক্ষমান শত্রুদের।

গগনবিহারী চিল! যারা ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, আর
পারে না বলেই যারা
পৃথিবীর
ভাগাড়ে ও আঁস্তাকুড়ে কাপুরুষ মস্তানের মতো
দঙ্গল পাকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের
হাতে কি কখনো আমি ঊর্ধ্বচারী মানুষের
লাঞ্ছনা দেখিনি?
দেখেছি অসংখ্যবার। বুঝেছি যে, লাঞ্ছনাই স্বাভাবিক।
এমন কি, লাঞ্ছনা আর নিগ্রহের ফলে
মানুষের দীপ্তি ও মহিমা আরও বেড়ে যায়।
অথচ সমস্ত দেখে, সমস্ত বুঝেও—মূর্খ আমি—
দলবদ্ধ কাকের গুণ্ডামি থেকে
তোমাকে বাঁচাতে গিয়েছিলুম। তোমাকে
বারান্দার থেকে তুলে এনে
স্নানঘরের মধ্যে আটকে রেখে
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবতে পেরেছিলুম, তোমার
মর্যাদা বাঁচানো গেল।

এখন বুঝতে পারি, বস্তুত তোমাকে
এক বিদ্রূপের থেকে আরও ক্রূর, আরও ভয়ংকর
বিদ্রূপের ভিতরে নিক্ষেপ করেছিলুম সেদিন।
গগনবিহারী চিল,
বৈদূর্যমণির তীব্র দাহনে উজ্জ্বল খর দুপুরবেলায়
সম্রাটের মতো তুমি সমস্ত আকাশ ঘুরে এসে
তারপর
শহরতলির এক গৃহস্থের
ছয় বাই তিন ফুট ওই কলঘরের অন্ধকারে বন্দী হয়েছিলে।
সারারাত্রি ঝাপট মেরেছ তুমি
কাঠের দরজায়,

নগরে খাঁচাভেঙে মেঝে, সারারাত
আপন সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসিত, বিচ্যুত হবার
অপমানে, গ্লানিতে ও যন্ত্রণায়
চিৎকার করেছে।

অমন ধারালো, শুকনো, বুককাটা আর্তনাদ আমি
কখনো শুনিনি।
মনে হয়েছিল, যেন পাখি নয়, বিশ্ব-চরাচর
আজ রাত্রে ওই
কলঘরের অন্ধকারে বন্দী হয়ে চিৎকার করছে।
গগনবিহারী চিল,
সকালে তোমাকে আমি মুক্তি দেব বলে
দরজা খুলে যখন দেখলুম,
মেঝের উপরে তুমি স্থির ও নিঃশব্দ হয়ে পড়ে আছ,
তখন আবার মনে হয়েছিল,
তুমি পাখি নও, তুমি অফুরন্ত আকাশের প্রাণমূর্তি, যেন
সমস্ত আকাশ আজ
নিতান্ত ছাপোষা এক গৃহস্থের
কলঘরের ক্লিন্ন অন্ধকারে
মরে পড়ে আছে।

উলঙ্গ রাজা | নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সবাই দেখছে যে, রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছে : শাবাশ, শাবাশ!
কারও মনে সংস্কার, কারও ভয় ;
কেউ-বা নিজের বুদ্ধি অন্য মানুষের কাছে বন্ধক দিয়েছে ;
কেউ-বা পরান্নভোজী, কেউ
কৃপাপ্রার্থী, উমেদার, প্রবঞ্চক ;
কেউ ভাবছে, রাজবস্ত্র সত্যিই অতীব সূক্ষ্ম, চোখে

পড়ছে না যদিও, তবু আছে ;
অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়।

গল্পটা সবাই জানে।
কিন্তু সেই গল্পের ভিতরে
শুধুই প্রশস্তিবাক্য-উচ্চারক কিছু
আপাদমস্তক ভিতু, ফন্দিবাজ অথবা নির্বোধ
স্তাবক ছিল না।
একটি শিশুও ছিল।
সত্যবাদী, সরল, সাহসী একটি শিশু।

নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের প্রকাশ্য রাস্তায়।
আবার হাততালি উঠছে মুহুর্মুহু ;
জমে উঠছে
স্তাবকবৃন্দের ভিড়।
কিন্তু সেই শিশুটিকে আমি
ভিড়ের ভিতরে আজ কোথাও দেখছি না।

শিশুটি কোথায় গেল ? কেউ কি কোথাও তাকে কোনো
পাহাড়ের গোপন গুহায়
লুকিয়ে রেখেছে ?
নাকি সে পাথর-ঘাস-মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে
ঘুমিয়ে পড়েছে
কোনো দূর
নির্জন নদীর ধারে কিংবা কোনো প্রান্তরের গাছের ছায়ায় ?
যাও, তাকে যেমন করেই হোক
খুঁজে আনো।
সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে
নির্ভয়ে দাঁড়াক।
সে এসে একবার এই হাততালির ঊর্ধ্বে গলা তুলে
জিজ্ঞাসা করুক :
রাজা, তোর কাপড় কোথায় ?

পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে | রাম বসু

অনেকক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে
বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ,
ফুটো চাল থেকে আর জল গড়িয়ে পড়বে না
খোকাকে শুইয়ে দাও।

খোকাকে শুইয়ে দাও
তোমার বুকের ওম্ থেকে নামিয়ে
এই শুকনো জায়গাটায় শুইয়ে দাও,
গায়ে কাঁথাটা টেনে দাও
অনেকক্ষণ বৃষ্টি থেমে গেছে।

মেঘের পাশ দিয়ে কেমন সরু চাঁদ উঠেছে
তোমার ভুরুর মতো সরু চাঁদ
তোমার চুলের মতো কালো আকাশে,
বর্ষার ঘোলা জল মাঠ ছাপিয়ে নদীতে মিশে গেছে
কুমোরপাড়ার বাঁশের সাঁকোটা ভেঙে গেছে বোধহয়
বোধহয় ভেসে গেছে জলের তোড়ে
অভাবের টানে যেমন আমাদের আনন্দ ভেসে যায়।

নলবনের ধার দিয়ে
পানবরজের পাশ দিয়ে
গঞ্জের স্টীমারের আলো—
আলো পড়েছে ঘোলা জলে
রামধনুর মতো
রামধনুর মতো এই রাত্রির বেলা।
ধানখেত ভাসিয়ে জল গড়ায় নদীতে
স্টীমারের তলায়
আমাদের অভাবের মতো
ঠিক আমাদের কপালের মতো।

আমাদের পেটে তো ভাত নেই
পরনে কাপড় নেই
খোকার মুখে দুধ তো নেই এক ফোঁটাও,—
তবু কেন এই গন্ধ হাসিতে উছলে ওঠে
তবু কেন এই স্টীমার শব্দেতে ভরে ওঠে
আমাদের অভাবের নদীর ওপর
কেন ওরা সব পাঁজরকে গুঁড়িয়ে যায় ?

শোন,—
বাইরে এস
বাঁকের মুখে পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে
শোন, বাইরে এস,
ধান-বোঝাই নৌকো রাতারাতি পেরিয়ে যায় বুঝি
খোকাকে শুইয়ে দাও
বিন্দার বৌ শাঁখে ফুঁ দিয়েছে।

এবার আমরা ধান তুলে দিয়ে
মুখ বুজিয়ে মরবো না
এবার আমরা প্রাণ তুলে দিয়ে
অন্ধকারে কাঁদবো না
এবার আমরা তুলসীতলায়
মনকে বেঁধে রাখবো না।

বাঁকের মুখে কে যাও, কে ?
লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও
লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও !
আমাদের হাঁকে রূপনারাণের স্রোত ফিরে যাক
আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধার ফর্সা হয়ে যাক
আমাদের হৃৎপিণ্ডের তাল দামামার মতো
ঝড়ের চেয়েও তীব্র আমাদের গতি।
শাসনের মুগুর মেরে আর কতকাল চুপ করিয়ে রাখবে ?
এস
বাইরে এস —

আমরা হেরে যাবো না
আমরা মরে যাবো না
আমরা ভেসে যাবো না
নিঃস্বতার সমুদ্রে একটা দ্বীপের মতো আমাদের বিদ্রোহ
আমাদের বিদ্রোহ মৃত্যুর বিভীষিকার বিরুদ্ধে --

এস বাইরে এস
আমার হাত ধর
সমান মাঝি ডাক দিয়েছে।

প্রদর্শনী | গৌরাঙ্গ ভৌমিক

পূর্ব-তোরণ খুলে দিয়েছি, বন্ধুগণ,
আপনারা যে যার পোষাক পরে এগিয়ে আসুন ধীরে ধীরে,
অনেকদিনের প্রয়াসের ফল আমার এই প্রদর্শনী।

সামনের দরজাটা এখন ঝুঁকে পড়েছে বাঁদিকে, একটু টালমাটাল আর কি।
বাঁশের খুঁটি লাগিয়েছি স্বদেশী শিল্পের খাতিরে, বন্ধুগণ,
ভেতরে ঢুকলে দেখতে পাবেন, সরল স্নিগ্ধ ছায়ার এলোমেলো মাতলামি,
কম্পমান ফুলের গাছ থেকে মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে
প্রাচীনতম লেবুবনের দিকে।
ইচ্ছে ছিল, ভোর ভোর একটা বৈদ্যুতিক আলোর বাল্ব
ঝুলিয়ে দেব মাঝখানে। সেটা হল না।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার প্রয়োজনে
এখানে একটু কুয়াশা সৃষ্টি করেছি বাধ্য হয়ে।

সীমান্তের প্রাচীর থেকে আপনারা এগিয়ে আসুন
ক্রমশঃ ভেতরের দিকে।
বন্ধুগণ, এখানে একটু সাবধান হওয়া দরকার।
কয়েকটি স্বদেশী কুকুর পাহারা দিচ্ছে পিতামহের মূর্তিতল,
পাশেই অনন্ত ও ভবিষ্যৎকালের প্রতীকস্বরূপ

কয়েকটি বৃত্তকেই দেখতে পাবেন
বর্তুল কাচের ভেতর।
আজকের প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ এই মাকের মহল।

এবার একটু বাঁয়ে যেতে হবে, বন্ধুগণ, এবার একটু বাঁয়ে।
চেয়ে দেখুন, প্রেমিকের মতো মুখ করে
একজন যুবক দাঁড়িয়ে আছে ছোরা হাতে,
সুন্দরবনের বাঘের মতো ভয়ঙ্কর সুন্দর তার মুখ,
চোখে আশ্চর্য দীপ্তি, গায়ে আরণ্যক গন্ধ,
ভেবে দেখুন, আপনারা এগোবেন কিনা, এখনো সময় আছে।
এ দৃশ্য দেখাতে ভারি ভয় করছে আমার,
ভারি ভয় করছে…
ভারি ভয়…
তাহলে এদিকে আসুন, বন্ধুগণ, খানিকটা স্মৃতিচারী হোন,
একজন কিশোর এখন সাঁতার কাটছে অম্লান জলে, চেয়ে দেখুন,
সাঁতার কাটতে কাটতে সে চলে যাচ্ছে
জঙ্গলের ভেতর, তার বয়স বেড়ে যাচ্ছে,
আর সেই বয়সের নিদারুণ উত্তেজনায় ও ভয়ে
সে কেবল দৌড়চ্ছে আর দৌড়চ্ছে
এক জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আরেক জঙ্গলের ভেতর।
এ পথ দিয়েই আপাতত প্রদর্শনীর শেষতম রাস্তাটি খুঁজে নিতে হবে
একান্ত সাবধানে। নাহলে
আপনারা আটকে পড়বেন এক রহস্যময় মায়াজালের ভেতর।

দেখুন, ঐ যে বৃদ্ধ জাদুকর এবং তাঁর স্ত্রী
একজন যুবককে পোষ মানাচ্ছেন রূপকথার গল্প শুনিয়ে—
সে দোষ কার? লোভের ফাঁদে পা দিচ্ছে কে? ঐ যুবক
আপাতত রাজকুমারীর স্বপ্ন দেখবে কিছুকাল, তারপর
অপূর্ব এক ধূসর সূর্যালোকে বৃত্তের ভেতরে বৃত্ত তৈরি করবে,
বৃত্তের ভেতরে বৃত্ত—
কিন্তু বাইরে বেরুবার পথ খুঁজে পাবে না কোনোদিন।

একেকটি বৃক্ষের ভেতরে বসে সে শিক্তা হবে, শিক্ষানবিস হবে।
আপাতত প্রেমে, ঘৃণায়, কর্তব্যবোধে তার হৃদয় আচ্ছন্ন!

আপনারা কি সবাই এই মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়তে চান?
কে চান না? চলে যান ঐ নিচু প্রাচীরের কাছে,
সাবধান! যমদূতের মতো ওখানে আছে কয়েকটি পাহারাদার।
ওদের চোখ এড়িয়ে ঐ প্রাচীর ডিঙোতে হবে আপনাদের।
তারপর দৌড়ে চলে যেতে হবে সামনের বিশাল প্রান্তরে।
ওখানে বৃক্ষের প্রবেশ নিষেধ।

এই প্রদর্শনী থেকে বাইরে যাওয়ার ওটাই একমাত্র রাস্তা!

অবিকল আমি | গৌরাঙ্গ ভৌমিক

মেলায় হারিয়ে-যাওয়া সেই শিশুটিকে কেউ খুঁজে পায়নি।
আমি তাকে পথ হারাতে দেখেছিলুম নদীর মোহনায়,
সেকথা কাউকে বলিনি।

সেবার একজন কিশোর বাউলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক পাখিওয়ালার।
যেমনভাবে সে পাখি ধরত, পাখির গলা নকল করত
শিকারের আনন্দে,
ঠিক তেমনি কৌশলে সে বাউলকে পৌঁছে দিয়েছিল
ভিখিরীদের আস্তানায়—সেকথা জানতুম আমি।

জানতুম, তবু কাউকে বলিনি। মধ্য ফাল্গুনে
এক যুবক সন্ন্যাসীর রক্তে আগুন ধরেছিল সেবার।
কয়েকটা রক্তচোষা গিরগিটি
লাফিয়ে পড়েছিল তার বুকের ওপর—
সে দৃশ্য দেখেছি আমি।
এখন আমাকে কেউ প্রশ্ন করো না—
কে সেই হারিয়ে-যাওয়া বালক? কে সেই বাউল ভিখিরী?
কে সেই রক্তে আগুন-ধরা যুবক?
তার উত্তর দেব না আমি।

ঘাতকের পাশে-গুপ্তচর আমাকে দেখছে আর দেখছে ছবি হাতে—
যেন গোপন সংবাদের সূত্রে তদন্ত করছে আমার শরীর।
আশ্চর্য! তার হাতের ছবিটা যেন অবিকল আমারই মতো?

বলো তারে, 'শান্তি শান্তি' | শঙ্খ ঘোষ

১

মাগো, আমার মা—
তুমি আমার দৃষ্টি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

এই যে তালো ধুলোয় ধুলোয় ছড়িয়ে আছে দুয়ারহারা পথ,
এই যে স্নেহের সুরে আলোয় বাতাস আমায় ঘর দিল যে দিল—
আকাশ দুটি কাঁকন বাঁধে, বলে, আমার সন্ধ্যা আমার ভোর
সোনায় বাঁধা—ভুলে যা তুই ভুলে যা তোর মৃত্যু-মনোরথ।
সেই কথা এই গাছ বলেছে, সেই কথা এই জলের বুকে ছিল,
সেই কথা এই তৃণের ঠোঁটে—ভুলে যা তুই, দুঃখরে তোল তোর,
ধুলোতে তুই নম্র হলে আনন্দে এই শূন্য খোলে জট।

তুমি, আমার মা—
শান্তি তোমার ঘট ভরেছে, দুঃখ তোমার গড়বে কি গাঁথা?
তুমি আমার চক্ষু ছেড়ে কোথাও যেও না।

২

আকাশ বলে বাতাস বলে ব্যথা।
ব্যথার তুলি শলাশলাল মেঘে।
তাহলে তুমি ক্রোধের নীরবতা
দুঃখ আমার টলবে বুকে লেগে।

দুঃখ আমার বুকের টলোমলো
জলের বুকে সন্ধ্যা দিল এঁকে—
ব্যথায় লেগে বন-বনানী হলো
আমার মতো, আমার মতো কে কে?

আমার মতো বাতাস জানে ডানা,
আমার মতো সূর্য জানে ফুল,
তোমার চোখে নিদ্রা হলো টানা
মরণমুখী সূর্য আর আগুনলোভী চাঁদে
আকাশ পরে মিছে ছুটি ভুল।

৩

মাগো, আমার মা—
তুমি আমার এ ঘর ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।

মৃত্যু তোমায় ভয় পেয়েছে, রাত্রি এল অন্তদীঘির পার,
যেখানে এই চোখ মেলেছ সেইখানে কার শান্তি কেঁদে মরে?
নিশুতি রাত ঝুমঝুমিয়ে আর্তনাদের বর্শা এল ছুটে—
যেখানে যাও সেখানে নেই শান্তি তোমার সেখানে নেই আর।
দিন ছুটেছে রৌদ্ররথে শহরগ্রামে সাগর-বন্দরে
যেখানে যাও সেখানে চাপরক্ত পাবে শীর্ণ করপুটে—
আকাশ-ভাঙা বন-বনানী শান্তি বাঁধে শান্তি বাঁধে কার।

তুমি আমার মা—
শান্তি তোমার ঘট ভরেছে, রক্তে ঘটের সিঁদুর হবে টানা,
তুমি আমার ঘর ছেড়ে মা কোথাও যেয়ো না।

৪

বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে কেন?
নীল দুয়ারে যা দিল তাই মেঘের সেনাগুলো।
বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে কেন?
ভয়ের দুয়ার-বন্ধ ঘর কাঁপছে জড়োসড়ো—
বাজনা বাজে, চৌকিদার, বাজনা বাজে বড়ো!

মাগো, আমার মা—
ঝড় নেমেছে দুয়ারে তার বর্শা লাগো-লাগো
তুমি আমার বাজনা শুনে শঙ্কা যেনো না।
বাজনা বাজুক, ভয় পেয়ো না, বাজনা বাজুক মা।

বাবুমশাই | শঙ্খ ঘোষ

'সে ছিল একদিন আমাদের যৌবনে কলকাতা।
বেঁচে ছিলাম বলেই সবার কিনেছিলাম মাথা
আর তাছাড়া ভাই

আর তাছাড়া ভাই আমরা সবাই জেনেছিলাম হবে
নতুন সমাজ, চোখের সামনে বিপ্লবে বিপ্লবে
যাবে খোল-নলিচা

যাবে খোল-নলিচা পালটে, বিচার করবে নীচুজনে'
—কিন্তু সেদিন খুব কাছে নয় জানেন সেটা মনে
মিত্র বাবুমশয়

মিত্র বাবুমশয় বিষয়-আশয় বাড়িয়ে যান তাই,
মাঝেমধ্যে ভাবেন যাদের নুন আনতে পান্তাই
নিত্য ফুরোয় যাদের

'নিত্য ফুরোয় যাদের সাধ-আহ্লাদের শেষ তলানিটুকু
চিরটা কাল রাখবে তাদের পায়ের তলায় কুকুর
সেটা হয় না বাবা

সেটা হয় না বাবা' বলেই থাবা বাড়ান যতেক বাবু
কার ভাগে কী কম পড়ে যায় ভাবতে থাকেন ভাবুক
অম্‌নি দু'চোখ বেয়ে

অম্‌নি দু'চোখ বেয়ে অলপ্পেয়ে ঝরে জলের ধারা,
বলেন বাবু 'হা, বিপ্লবের সব মাটি সাহারা'
কুমীর কাঁদতে থাকে

কুমীর কাঁদতে থাকে 'আয় আমাকে নামা নামা' ব'লে
কিন্তু বাপু আর যাব না চরাতে-জঙ্গলে
আমরা ঢের বুঝেছি

আমরা ঢের বুঝেছি খেঁদীপেঁচী নামের এসব আদর
সামনে গেলেই ভরবে মুখে, প্রাণ ভরে তাই সাধো
তুমি সে-বস্তু না

তুমি   সে-বন্ধু না, যে-খুশখুলা জলে হাজার চোখে
            দেখতে পাবে তাকে, সে কি যেমনতেমন লোকে
তাই   সব অমাত্য

তাই   সব অমাত্য, পাত্রমিত্র এই বিলাপে খুশি
            শুঁড়িখানাই কেবল সত্য, আর তো সবই ভুষি
ছি ছি   হায় বেচারা'

ছি ছি   হায় বেচারা! শুনুন যাঁরা মস্ত পরিত্রাতা
            এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা
হেঁটে   দেখতে শিখুন

হেঁটে   দেখতে শিখুন ঝরছে কী খুন দিনের রাতের মাথায়
            আর একটা কলকাতায় সাহেব আর একটা কলকাতায়
সাহেব   বাবুমশায়।

যমুনাবতী | শঙ্খ ঘোষ

One more unfortunate
            Weary of breath
Rashly importunate
            Gone to her death.—Thomas Hood

নিভন্ত এই চুল্লীতে মা
            একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
            বাঁচার আনন্দে।

নোটন নোটন পায়রাগুলি
            খাঁচাতে বন্দী
দু'এক মুঠো ভাত পেলে তা
            ওড়াতে মন দি'।

হায় তোকে ভাত দিই   কী করে যে ভাত দিই হায়
হায় তোকে ভাত দেব   কী দিয়ে যে ভাত দেব হায়.

নিভন্ত এই চুল্লী তবে
একটু আগুন দে—
হাড়ের শিরায় শিখার মাতন
মরার আনন্দে।
দু'পারে দুই রুই কাৎলার
মারণী ফন্দী
বাঁচার আশায় হাত-হাতিয়ার
মৃত্যুতে মন দি'।

বর্গী না টর্গী না, যমকে কে সামলায়!
ধার-চকচকে থাবা দেখছ না হামলায়?
যাস্নে ও-হামলায়, যাস্নে।

কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে, জ্বলে না —
মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না—
চলল মেয়ে রণে চলল।
বাজে না ডম্বরু, অস্ত্র ঝন্ ঝন্ করে না, জানল না কেউ তা
চলল মেয়ে রণে চলল।
পেশীর দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে
চলল মেয়ে রণে চলল।

নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল
মৃত্যুরই গান গা—
মায়ের চোখে বাপের চোখে
দু-তিনটে গঙ্গা।
দূর্বাতে তার রক্ত লেগে
সহস্র সঙ্গী
জাগে ধক্ ধক্, যজ্ঞে ঢালে
সহস্র মণ ঘি।

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।

যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে।

নিভন্ত এই চুল্লীতে বোন আগুন ফলেছে।

এই গৃহে অগ্নি এসেছেন | কবিতা সিংহ

এসো, আজ এই গৃহে অগ্নি এসেছেন
অগ্নি গৃহীর ঘরে, গৃহী আজ
স্থিরাসন, দীপ্ত, বিনয়ী
এখন প্রত্যেকে তাঁকে, অর্ঘ দেবো অরণ্য আনিত
এক একটি সুপক্ক শাখা।

এসো, আজ অগ্নি ঘিরে বসো যত সন্তান সন্ততি
করতলে তাপ নাও, ঠাণ্ডা কপোল ছোঁও হাতে
ঐ তিনি ঊর্ধ্ববাহু, উর্মিময়, পরেছেন কমলা কাষায়
ঐ তিনি, আলোয় আলোকময়
সহস্র হস্তের বরাভয়ে।

এখনিতো শূলপক্ক করে নিতে হবে স্বামী আমাদের
নিহত হরিণ!
এখনিতো তোমাদের শ্রমস্বেদে কর্ষিত সুপুষ্ট নীবার
পরমান্ন পাক গন্ধে ভরে যাবে আমাদের গুহা
প্রপিতামহের আঁকা, গুহাচিত্র খুলে দেবে, গৃহস্থ অগ্নির ছটা
খুলে ধরবে স্বর্ণচিত্রনিভা!

প্রপিতামহের কথা, প্রপিতামহীর কথা, তাদের গল্পের মতো
আর কিবা, এতো পুরাতন।

এসো, আজ এই গৃহে—খাণ্ডব দাহন শান্ত অগ্নি এসেছেন,
এখনিতো আমাদের সমস্ত আকর থেকে
নিষ্কাশন করে নিতে হবে
ভিতরের অমল ধাতুকে!
অভ্র কাঞ্চন, সিতরূপা, লালতামা, হলুদ পিত্তল

এখনিতো আমাদের নিজস্ব কালের, গোপন সংকেত যতো
রেখে দিয়ে যেতে হবে প্রস্থানের পথে।

এসো, আজ এই গৃহে অগ্নি এসেছেন
তাঁকে ছোঁও, সাক্ষী করো, বলো স্বামী
সিন্দুর অগ্নিল সিঁথিহীন, অন্য নারী ভালোবাসবে না
বলো পুত্র, বলো কন্যা, শেষকৃত্যে মুখে অগ্নি দেবে ?
কে বলে নির্লিপ্ত উনি
অগ্নি সব ক্রোধ নিয়েছেন
অগ্নি সব কাম নিয়ে মজ্জার ভিতরে প্রাণ
রেখে দেন শুক্রে সঞ্চিত
অগ্নি এসেছেন গৃহে
আমাদের কেন্দ্রের ভিতরে তিনি
ওম্ ! তিনি স্বাহা।
এখনিতো হাতে হাত, রক্তে রক্ত অচ্ছেদ্য বন্ধন
এখনিতো অগ্নি গৃহী, উত্তরকালের ছক
মানুষের ভৃগু সমাজ !
আমরা সৃজন করবো অগ্নিসাক্ষী, পাথর গুহায়।

ঈশ্বরকে ইভ | কবিতা সিংহ

আমিই প্রথম
জেনেছিলাম
উত্থান যা
তারই ওপিঠ
অধঃপতন।

আলোও যেমন
কালোও তেমন
তোমার সৃজন
জেনেছিলাম
আমিই প্রথম।

তোমায় মানা
বা না মানায়
সমান ওজন
সমান ওজন
জেনেছিলাম
আমিই প্রথম।

জ্ঞানবৃক্ষ
ছুঁয়েছিলাম
আমিই প্রথম
লাল আপেলে
পয়লা কামড়
দিয়েছিলাম
প্রথম আমিই
আমিই প্রথম।

আমিই প্রথম
ডুমুর পাতায়
লজ্জা এবং
নির্লজ্জতায়
আকাশ পাতাল
তফাৎ করে
দেওয়াল তুলে
দিয়েছিলাম
আমিই প্রথম।

আমিই প্রথম
নর্ম সুখের
দেহের বোঁটায়
দুধ ছেনে
অন্ন ছেনে
তোমার পুতুল
বানানো যায়

জেনেছিলাম
হেসে কেঁদে
তোমার মুখই
শিশুর মুখে
দেখেছিলাম
আমিই প্রথম।

আমিই প্রথম
বুঝেছিলাম
দুঃখে সুখে
পুণ্য পাপে
জীবন যাপন
অসাধারণ
কেবল সুখের
সৌখিনতার
সোনার শিকল
আমিই প্রথম
ভেঙেছিলাম
হইনি তোমার
হাতের সুতোয়
নাচের পুতুল
যেমন ছিল
অধম আদম

আমিই প্রথম
বিদ্রোহিনী
তোমার ধরায়
আমিই প্রথম।

প্রিয় আমার
হে কৃতদাস
আমিই প্রথম
ত্রাতানারী

স্বর্গচ্যুত
নির্বাসিত
জেনেছিলাম
স্বর্গেতর
স্বর্গেতর
মানব জীবন
জেনেছিলাম
আমিই প্রথম।

কয়েকটি জরুরী ঘোষণা | পূর্ণেন্দু পত্রী

আগামী চোদ্দ বছর মহিষ কিংবা নেউল রঙের
মেঘের মুখদর্শন করবে না কেউ।
আগামী চোদ্দ বছর আমাদের কবিতা থেকে ছিঁচড়ে-নাচন বৃষ্টির নির্বাসন।
স্বেচ্ছাচারী এবং হামলাবাজ হাওয়াকে চোদ্দ বছরের
সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছি আমি
আর পশ্চিমের জেলায় জেলায় টেলিফোনে ট্রাংকলে
রেডিওগ্রামে জানিয়ে দিয়েছি
সমস্ত বিক্ষুব্ধ জলস্রোত যেন মাটিতে নাকখত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়
দুর্গত মানুষের কাদা-পায়ে।
প্রত্যেক নদীর বাঁধকে বলে দিয়েছি হতে হবে হিমালয়ের কাঁধ সমান
প্রত্যেকটা নদীকে হতে হবে পাড়াগাঁর লাজুক বৌ
প্রত্যেকটা ব্যারেজকে জননীর গর্ভ।
ভবিষ্যতে আর কোনদিন যদি মানুষকে ভাসতে দেখি শিকড়হীন উলঙ্গ
আর কোনদিন যদি মানুষের সাজানো-নিকোনো
স্বপ্নসাধের ভিতরে ঢুকে পড়ে
দুঃস্বপ্নের খলখল হাসি, আঁকাবাঁকা সাপ, মরা কুকুরের কান্না আর ভাঙা শাঁখা
আর কোনদিন যদি মানুষের শ্রেষ্ঠতম সংলাপ হয়ে ওঠে হাহাকার
আর কোনদিন যদি মানুষের আলতা-সিঁদুর পরা সতী-লক্ষ্মী গৃহস্থালিকে
হেলিকপ্টার থেকে মনে হয় ছেঁড়া-কাঁথা-কানির টুকরো
আমি বাধ্য হবো সভ্যতার বিরুদ্ধে ফাঁসীর হুকুম দিতে।

যতদিন মানুষের গায়ে দুর্দিনের দুর্গন্ধ এবং নষ্ট জলরেখা
রোদের কামাই করা চলবে না একদিনও।
মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত আমি দেখে যেতে চাই
সমস্ত পুরুষ সূর্যমুখী, নারীরা ঝুমকো জবা আর শিশুরা
কমলা রঙের বোঁটায় সাদা শিউলি।

আনন্দ-ভৈরবী | শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ়-শেষের বেলা
উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ-ভৈরবী।

আজ সেই গোঠে আসে না রাখাল ছেলে
কাঁদে না মোহনবাঁশিতে বটের মূল
এখনো বরষা কোদালে মেঘের ফাঁকে
বিদ্যুৎ-রেখা মেলে

সে কি জানিত না এমনি দুঃসময়
লাফ মেরে ধরে লাল মোরগের ঝুঁটি
সে কি জানিত না হৃদয়ের অপচয়
কৃপণের বামমুঠি

সে কি জানিত না যত বড়ো রাজধানী
তত বিখ্যাত নয় এ-হৃদয়পুর
সে কি জানিত না আমি তারে যত জানি
আনখ সমুদ্দুর

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
এমন ছিলো না আষাঢ়-শেষের বেলা
উদ্যানে ছিলো বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ-ভৈরবী।

জরাসন্ধ | শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

যে-মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখদুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ, তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি। এ-মাঠ আর নয়, ধানের নাড়ায় বিঁধে কাতর হ'লো পা। সেবন্নে শাকের শরীর মাড়িয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবো জলে তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুনমশলার পাত্র হ'লো, মা। আমি যখন অনন্ত অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর ক'রে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমি কখনো অনন্ত অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।

কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা-কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে নামলে সমুদ্র স'রে যাবে   শীতল স'রে যাবে   মৃত্যু স'রে যাবে।

তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো, বা অন্ধকার হবো।

আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।

চতুরঙ্গ | শক্তি চট্টোপাধ্যায়

খুব বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
শস্য ফুটলে আমি নেবো তার মুগ্ধ দৃশ্য
নিজস্ব গৃহে প্রজা বসিয়েছি প্রায়ান্ধকার
কিছু-কিছু নেবো কিছুদিন বেশি বাঁচতে চাই না।

এই অপরূপ পৃথিবী, সেদিকে যাবো না মিথ্যা
বাসনা যেমন চঞ্চল তার নিশানা জানি না
রমণী কখন প্রিয় করে হা যে হৃদয় জানে কি
তবু বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না।

শুধু যা দৃশ্য, অন্তঃস্থল খোঁড়ে খুঁড়ুক
ভাসমান নদী ভাসাও নৌকা ভাসাও নৌকা
যৌবন যায়, চ'লে যাবো আমি ; চাষা বা ডুবুরি।
ক্ষেতে সংসারে অক্ষয় বাঁচো দৃঢ় জলৌকা।

আহা বেশি দিন বাঁচবো না আমি বাঁচতে চাই না
কে চাইবে রোদ আচিতা অনল, কে চিরবৃষ্টি ?
অনভিজ্ঞতা বাড়ায় পৃথিবী, বাড়ায় শান্তি
প্রাচীন বয়সে দুঃখশ্লোক গাইবো না আমি গাইতে চাই না।

একটি পরমাদ | শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বহুকালের সাধ ছিলো তাই কইতে কথা বাধছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি — ওই একটি পরমাদ ছিলো।
যখন তুমি দাঁড়াও এসে
আন্ধারে-রোদ্দুরে ভেসে
হাসির ছটা ভুলিয়ে গেলো—ভিতরে কেউ কাঁদছিলো
বহুকালের সাধ ছিলো, তাই কইতে কথা বাধছিলো।

ও মন দরদ দিয়েছো তায়
রাত-ভেজানো বনের লতায়
একদিবসের প্রেমে প্রখর স্মরবিরহ বাদ ছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি, ওই একটি পরমাদ ছিলো।
ডাকাত ভালোমানুষ সেজে
আড়ালে হাত কামড়ে নিজের
রক্তচোষা এক চাশোষার হৃদয়হরণ সাধ ছিলো ॥

একা গেলো | শক্তি চট্টোপাধ্যায়

চুম্বন করিনি আগে, ভুল হয়ে গেছে
গ্রহণ করিনি আগে, ভুল হয়ে গেছে
তেমন বাসিনি ভালো, ভুল হয়ে গেছে
বিসর্জন দিতে আজ গরম পাথর

বুক ভেঙে ওঠে
পাথরে পাথর লেগে ভেঙেছে চিবুক
মুখময় অশ্রু যেন জলপ্রপাতের
প্রলয় আদলে গড়া
বৃষ্টি হোক, বৃষ্টি হয়ে যাক্
আকাশ খোলসা হবে
পাথরের ক্রন্দন তরুণী
এ-সময়ে
কাঁদে, ফিরে ফিরে কাঁদে
ঘুরে ঘুরে কাঁদে
শবদেহ, মৃন্ময়ীর—
শান্ত শব দেহ
মুখশ্রী সিঁদুরে
গর্বিনী
শুয়ে আছে
একাকী, আগুনে ছাই হবে ব'লে
আছে, জীবনবিচ্ছিন্ন
মাটি-প্রতিমার মতো
মৃন্ময়ী, যথার্থ নাম!

চুম্বন করিনি আগে, ভুল হয়ে গেছে
গ্রহণ করিনি আগে, ভুল হয়ে গেছে
তেমন বাসিনি ভালো ভুল হয়ে গেছে
[দীপক চুম্বন করে মৃন্ময়ীর মুখ]
দুহাতের মধ্যে করে মুখশ্রী স্থাপিত
উন্মাদ চুম্বনে ভ'রে প্রয়াত শ্রীমুখ
মাতালের দল পায়ে ছেড়ে চলে যায়
চিতা, মাতৃমুখী···
আবার উঠবে]
সর্বত্র গুঞ্জন, ছিঃ ছিঃ একী ছেলেখেলা!
একী রসরসিকতা, ভাঁড়ামি শ্মশানে?
পবিত্রতা নষ্ট, নষ্ট চাংড়াদের হাতে!

ডাকো কোতোয়াল, একে বন্দী ক'রে রাখো
শাস্তি দাও, মর্যাদা ভেঙেছে
হাতকড়া লাগাও, ওকে পিছ্‌মোড়া বাঁধো
শয়তান, লাম্পটা ক'রে পার পেয়ে যাবে
আমাদের হাত থেকে ?
কর্‌তে দিয়েচে !
বলে, বিদেশেও নারী
ঝাঁটা মারি ওই নামে
শেয়াল শয়তান !

মৃন্ময়ীর স্বামী, দিব্য, উঠে এসে বলে :
এখানে গোলমাল নয়, ও ঠিকই করেছে
অধিকার বোধে ঠিকই চুম্বন করেছে।
এখানে গোলমাল নয়, ওর ভালোবাসা
আদান-প্রদানে, কখনো বিশ্বাসী নয়
ওকে শক্ত চেনা, শিকড় কিভাবে বুঝবে
উচ্চ বৃক্ষচূড় ? বোঝা যায়।
ছেড়ে দাও ওকে, একা
আর একাকী হলো
ও আর মৃন্ময়ী ছিলো প্রকৃত দুজন
মনে মনে।

টালীগঞ্জে বসে আছে ঝুল বারান্দায়
দিব্য ও দীপক
সামনে আদি গঙ্গাজল কাদা মেখে ঘোরে
জোয়ারে, ভাসন্ত ফোলা কুকুরের মাংসে কাক
মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নেয়।
দূরে পাতা পোড়া গাছ নারকেলের
ডেক্‌লোয় শকুন
গোদা চিল চক্রে উড়ে
স্থানীয় না-জানা ব্যথা
চাগিয়ে ছড়িয়ে দেয় একটানা কর্কশে

অনেক অনেকদিন বসে থাকে দিবা ও দীপক
এইখানে। মৃন্ময়ীও বসে।
: মৃন্ময়ী শোনাও গান, ভারি মন খারাপ।
: সে তো পার্পিচুয়াল, নতুন তো নয়।
: নতুন তো কিছু নেই, দিবা, তুমি বলো
কীভাবে নতুন হয় প্রকৃত পুরনো
: দিবু, তাও জানে।
ও শুধু তোমার সঙ্গে তর্ক করে সুখী।
: মৃন্ময়ী সমস্তে পায় সুখ।
আশ্চর্য প্রতিভা ওর—
সুখ শান্তি নিংড়ে আনে এমনও কি যোগাযোগ থেকে
: নিংড়ে আনা আর্ট মশাই, সবাই পারে না।
: তাই—তো তোমাকে ভালোবাসি
এত্তোখানি [হাত-ফাঁকে দেখায়]
: মরে যাই, মরে যাই···
ভালোবাসা খুচরো পয়সা নাকি
খালধারে কলমী দাম, ছিকের মতন
এত্তো শস্তা। বলে দিলে হলো?

বাড়িতে মৃন্ময়ী নেই, দাগ রয়ে গেছে
কাঁচামিঠে পথে যেন শকটের দাগ
রয়ে গেছে, কোন্ দিকে? ক্ষুৎ পিপাসায়
নয়, কোন কাজে কর্মে এবং অকাজে
সহজ যাবার দাগ, তেমনি মৃন্ময়ী
দাগ রেখে চলে গেছে ভিতরে-বাহিরে
দেয়ালের ঘুঁটে-খসা সে ভীষণ দাগ
ইঁট সরে গেলে শাংত বালের জমাট
যেমন হা হা-র ভাঙে, তেমনি সংসার
রক্তহীন, প্রাণশূন্য, স্বজনরহিত।

[আলোচনা করে, যাবে, সে-বাড়ির দিকে
আসছে কাল বা পরশু, দুঃস্বপ্ন মতন
যেতে হবে।

মৃন্ময়ী হঠাৎই গেছে অগোছালো করে।
কিছুটা গোছাতে হবে, জীবিতেরা চায়!
মুছতে হবে পদচ্ছাপ, হস্তাবলেপন
নানাস্থানে, পেটিকোট শাড়ি জামা সবই
গুছিয়ে তুলতে হবে তোরঙ্গেতে ওর,
ডালায় লিখতে হবে—মৃন্ময়ী, মৃন্ময়ী।
রাখতে হবে তাঁজে তাঁজে সংবাদপত্র, চিঠি ও কাগজ
ব্যবহৃত গন্ধদ্রব্য, চশমা ঘড়ি, রঙিন রুমাল—
এইসব।]

: দিবা, কেন নিজেকে জ্বালাবে ?
: জ্বলতে দাও, মৃন্ময়ী জ্বলেছে।
: জীবন্ত জ্বলেনি
: পাপস্খালন হোক, যদি হয়, অন্যথা করো না
অন্তত কয়েকটি মাস, দু'এক বছর
বুকের ভিতরে চিতা বাতাস নাড়ুক
পারে তো ওড়াক ছাই, পোড়াক স্বস্তি
বেওয়ারিশ করে দিক মৃত্যু যাযাবরী
দূর থেকে
জানো, দেখেছিলো ফ্ল্যাট, ছোট্ট ছিমছাম
দক্ষিণের দিকে
পরিকল্পনা ছিল ছবিতে সাজাবে
টেরাকোটা ইঁট বসাবে দু-একটা দেয়ালে
অর্কিড ঝোলাবে থামে পোর্সেলিন-টাবে
ইস্কুলের চাকরি ছাড়বে, রঙের সমুদ্রে
ব্রেষ্ট স্ট্রোক দিতে দিতে ভেসে যাবে একা
সাফল্যে, সুদূরে।
বলেছিলো, কথা দাও, তোমরা দাঁড়াবে
সমুদ্রের তীরে এসে, সারিবদ্ধভাবে।
জানো, একা কোনো কিছু আমার লাগে না
ভালো।

সুতরাং, একা চলে গেলো
কলহের কূটকচাল
লাগাতে পারবে না ভালো, এই ভেবে, একা চলে গেলো
বলেও গেলো না।
বড় বেশি বাঁচতে চেয়েছিলো ব'লে
চলে যেতে হলো।
যেতে এ ভাবেই হয়
চাও বা না-চাও
একা গেলো, দোসর নিল না।

সত্যবদ্ধ অভিমান | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ-হাতে কোনো পাপ করতে পারি ?
শেষ বিকেলের সেই ঝুল বারান্দায়
তার মুখে পড়েছিল দুর্দান্ত সাহসী এক আলো
যেন এক টেলিগ্রাম, মুহূর্তে উন্মুক্ত করে
নীরার সুষমা
চোখে ও ভুরুতে মেশা হাসি, নাকি অভ্রবিন্দু ?
তখন সে যুবতীকে খুকি বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়—
আমি ডান হাত তুলি, পুরুষ পাঞ্জার দিকে
মনে মনে বলি,
যোগ্য হও, যোগ্য হয়ে ওঠো—
ছুঁয়ে দিই নীরার চিবুক
এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ-হাতে আর কোনোদিন
পাপ করতে পারি ?

এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি—
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায় ?
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে পড়ে বিষম জরুরী
কথাটাই বলা হয়নি

শুধু মরালীর মতো নারীটিকে নিয়ে যাবে বিদেশী বাতাস
আকস্মিক ভূমিকম্পে ভেঙে যাবে সবগুলো সিঁড়ি
থমকে দাঁড়িয়ে আমি নীরার চোখের দিকে···
ভালোবাসা এক তীব্র অঙ্গীকার, যেন মায়াপাশ,
সত্যবদ্ধ অভিমান—চোখ জ্বালা করে ওঠে,
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায় ?

চিনতে পারো নি ? | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
তুমি আমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী,
মনে পড়ে না ?
কেন তোমার ব্যস্ত ভঙ্গী ?
কেন আমায় এড়িয়ে যাবার চঞ্চলতা !
আমার অনেক কথা ছিল, তোমার জামার বোতাম ঘিরে
অনেক কথা
এই মুখ, এই ভুরুর পাশে চোরা চাহনি,
চিনতে পারো নি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
আমি তোমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী,
মনে পড়ে না ?
আমরা ছিলাম গাছের ছায়া, ঝড়ের হাওয়ায় ঝড়ের হাওয়া
আমরা ছিলাম দুপুরে রুক্ষ
ছুটি শেষের সমান দুঃখ—
এই ছাখো সেই গ্রীবার ক্ষত, এই যে ছাখো চেনা আঙুল
এখনো ভুল ?
মনে হয় না তোমায় সেই নিরুদ্দেশ সখার মতো ?
কেন তোমার শাস্ত চিবুক, কেন তোমার প্রতিরোধের
কঠিন ভঙ্গি
চিনতে পারো নি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
শত্রু নই তো, আমরা সেই ছেলেবেলায় খেলার সাথী
মনে পড়ে না ?
আমরা ছিলাম নদীর বাঁকে ঘূর্ণিপাকে সন্ধেবেলা
নিষিদ্ধ দেশ, ভাঙা মন্দির, দু'চোখে ধোঁয়া
দেবী মানবীর প্রথম দিশা, প্রথম ছোঁয়া, আত্মহত্যা পণ
গোপন ঘরে এক শিহরণ, কৈশোরময় তুমুল খেলা—
লুকোচুরির খেলার শেষে কেউ কাককে খুঁজে পাইনি
দ্যাখো সে মুখ, চোখা চাহনি
একই আয়না
চিনতে পারো না ?

যদি নির্বাসন দাও | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো !
বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলাদেশ
নদীর শিয়রে ঝুঁকে পড়া মেঘ
প্রান্তরে দিগন্ত নির্নিমেষ—
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।

ধানক্ষেতে চাপ চাপ রক্ত
এইখানে ঝরেছিল মানুষের ঘাম
এখনো স্নানের আগে কেউ কেউ করে থাকে নদীকে প্রণাম
এখনো নদীর বুকে
মোচার খোলায় ঘোরে
লুঠেরা, ফেরারী !
শহরে বন্দরে এত অগ্নি-বৃষ্টি
বৃষ্টিতে চিক্কণ তবু এক একটি অপরূপ ভোর,

বাজারে ক্রূরতা, গ্রামে রণহিংসা
বাতাবি লেবুর গাছে জোনাকির ঝিকমিক খেলা
বিশাল প্রাসাদে বসে কাপুরুষতার মেলা
বুলেট ও বিস্ফোরণ
শঠ তস্করের এত ছদ্মবেশ
রাত্রির শিশিরে কাঁপে ঘাসফুল—
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।

কুয়াশার মধ্যে এক শিশু যায় ভোরের ইস্কুলে
নিথর দীঘির পাড়ে বসে আছে বক
আমি কি ভুলেছি সব
স্মৃতি, তুমি এত প্রতারক?
আমি কি দেখিনি কোনো মন্থর বিকেলে
শিমুল তুলোর ওড়াউড়ি?
মোষের ঘাড়ের মত পরিশ্রমী মানুষের পাশে
শিউলি ফুলের মত বালিকার হাসি
নিইনি কি খেজুর রসের ঘ্রাণ
শুনিনি কি দুপুরে চিলের
তীক্ষ্ণ স্বর?
বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলাদেশ…
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো।

কেউ কথা রাখে নি | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে নি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমী তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল
শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে।

তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা এসে চলে গেল, সেই বোষ্টুমী
আর এলো না
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি।

মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছিল, বড় হও, দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিনপ্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
যেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে!
নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিনপ্রহরের বিল দেখাবে?

একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারি নি কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাস-উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণকঙ্কন-পরা ফর্সা রমণীরা
কতরকম আমোদে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি!
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস, একদিন আমরাও…
বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাস-উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না!

বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে!
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্নতন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখে নি বরুণা, এখনো তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে-কোন নারী!
কেউ কথা রাখে নি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না!

উত্তরাধিকার | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ
তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট আর
ফুসফুস-ভরা হাসি
দুপুর রৌদ্রে পায়ে পায়ে ঘোরা, রাত্রির মাঠে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা
এসব এখন তোমারই, তোমার হাত ভরে নাও আমার অবেলা
আমার দুঃখবিহীন দুঃখ ক্রোধ শিহরণ
নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম আমার যা-কিছু ছিল আভরণ
জ্বলন্ত বুকে কফির চুমুক, সিগারেট চুরি, জানালার পাশে
বালিকার প্রতি বারবার ভুল
পরুষ বাক্য, কবিতার কাছে হাঁটু মুড়ে বসা, ছুরির ঝলসু
গূঢ় অভিমানে মানুষ কিংবা মানুষের মত আর যা কিছুর
বুক চিরে দেখা
আত্মহনন, শহরের পিঠে তোলপাড় করা অহংকারের দ্রুত পদপাত
একখানা নদী, দু'তিনটে দেশ, কয়েকটি নারী—
এ সবই আমার পুরোনো পোশাক, বড় প্রিয় ছিল, এখন শরীরে
আঁট হয়ে বসে, মানায় না আর
তোমাকে দিলাম, নবীন কিশোর, ইচ্ছে হয় তো অঙ্গে জড়াও
অথবা ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও, যা খুশী তোমার
তোমাকে আমার তোমার বয়সী সব কিছু দিতে বড় সাধ হয়।

উনিশ শো একাত্তর | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মা, তোমার কিশোরী কন্যাটি আজ নিরুদ্দেশ
মা, আমারও পিঠোপিঠি ছোট ভাইটি নেই
নভেম্বরে দারুণ দুর্দিনে তাকে শেষ দেখি
ঘোর অন্ধকারে একা ছুটে গেল রাইফেল উদ্যত।

এখন জয়ের দিন, এখন বন্যার মত জয়ের উল্লাস
জননীর চোখ শুকনো, হারানো কন্যার জন্য বৃষ্টি নামে
হাতখানি সামনে রাখা, যেন হাত দর্পণ হয়েছে
আমারও সময় নেই, মাঠে মাঠে কনিষ্ঠের লাশ খুঁজে ফিরি।

যে যায় সে চলে যায়, যারা আছে তারাই জেনেছে
একা একা হাহাকার ; আজিজুর, আজিজুর, শোন—
আমার হলুদ শার্ট তোকে দেবো কথা দেওয়া ছিল
বেহেস্তে যাবার আগে নিলি না আমার স্নেহ-ঘ্রাণ ?

লিকলিকে লম্বা ছেলে যেন একটা চাবুক, চোয়ালে
কৈশোরের কাটা দাগ, যা'র চোখে আজও সোনাধান
চিরকাল জেগে ! বাজি রেখে নদীর গভীর থেকে মাটি
তুলে আনতো
মশাল জ্বালিয়ে আমি ভাগাড়ের হাড়মুণ্ডে চিনবো কি তাকে ?

মা, তোমার লাবণ্যকে শেষ দেখি জুলাইয়ের তেসরা
শয়তানের তাড়া খেয়ে ঝাঁপ দিল ভরাবর্ষা নদীর পানিতে
জাল ফেলে তবু ওকে টেনে তুললো, ছটফটাচ্ছে যেন
এক জলকন্যা
স্টিমারঘাটায় আমি তখন খুঁটির সঙ্গে পিছমোড়া বাঁধা ।

ক'টা জন্তু নিয়ে গেল টেনে হিঁচড়ে, হঠাৎ লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে
তাকালো সবার চোখে, দৃষ্টি নয়, দারুণ অশনি
ঐটুকু মেয়ে, তবু এক মুহূর্তেই তার রূপান্তর ত্রিকাল-মায়ায়
কুমারীর পবিত্রতা নদীকেও অভিশাপ দিয়ে গেল ।

মা, তোমার লাবণ্যকে খুঁজেছি প্রান্তরময়, বাদাড়ে খন্দখোলে
ছেঁড়া বা রক্তাক্ত শাড়ি—লুণ্ঠিতা সতীর যত চিহ্ন পড়ে আছে
দূরে কাছে কয়েক লক্ষ আজিজুর অন্ধকার জুড়ে আছে
ধপধপে হাড়ে
কোথাও একটি হাত মাটি খিমচে ধরতে চেয়েছিল ।

যে যায় সে চলে যায়, যারা আছে তারাই জেনেছে
বাঁ হাতের উল্টোপিঠে কান্না মুছে হাসি আনতে হয়
কবরে লুকিয়ে ঢোকে ফুল চোর, মধ্য রাতে ভেঙে যায় ঘুম
শিশুরা খেলার মধ্যে হাততালি দিয়ে ওঠে, পাখিরাও
এবার ফিরেছে ।

চে গুয়েভারার প্রতি | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়
আমার ঠোঁট শুকনো হয়ে আসে, বুকের ভেতরটা ফাঁপা
আত্মায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পতনের শব্দ
শৈশব থেকে বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়—
বোলিভিয়ার জঙ্গলে নীল প্যান্টালুন পরা
তোমার ছিন্নভিন্ন শরীর
তোমার খোলা বুকের মধ্যখান দিয়ে
নেমে গেছে
শুকনো রক্তের রেখা
চোখ দুটি চেয়ে আছে
সেই দৃষ্টি এক গোলার্ধ থেকে ছুটে আসে অন্য গোলার্ধে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়।

শৈশব থেকে মধ্য-যৌবন পর্যন্ত দীর্ঘ দৃষ্টিপাত—
আমারও কথা ছিল হাতিয়ার নিয়ে তোমার পাশে দাঁড়াবার
আমারও কথা ছিল জঙ্গলে কাদায় পাথরের গুহায়
লুকিয়ে থেকে
সংগ্রামের চরম মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হওয়ার
আমারও কথা ছিল রাইফেলের কুঁদো বুকে চেপে প্রবল হুংকারে
ছুটে যাওয়ার
আমারও কথা ছিল ছিন্নভিন্ন লাশ ও গরম রক্তের ফোয়ারার মধ্যে
বিজয়-সঙ্গীত শোনাবার—
কিন্তু আমার অনবরত দেরি হয়ে যাচ্ছে!

এতকাল আমি একা, আমি অপমান সয়ে মুখ নিচু করেছি
কিন্তু আমি হেরে যাইনি, আমি মেনে নিইনি
আমি ট্রেনের জানলার পাশে, নদীর নির্জন রাস্তায়, ফাঁকা
মাঠের আলপথে, শ্মশানতলায়
আকাশের কাছে, বৃষ্টির কাছে, বৃক্ষের কাছে, হঠাৎ-ওঠা
ঘূর্ণি ধুলোর ঝড়ের কাছে

আমার শপথ শুনেছি, আমি প্রস্তুত হচ্ছি, আমি
সব কিছুর নিজস্ব প্রতিশোধ নেবো
আমি আবার ফিরে আসবো
আমার হাতিয়ারহীন হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে, শক্ত হয়েছে চোয়াল,
মনে মনে বারবার বলেছি, ফিরে আসবো।

চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়—
আমি এখনও প্রস্তুত হতে পারিনি, আমার অনবরত
দেরি হয়ে যাচ্ছে
আমি এখনও সুড়ঙ্গের মধ্যে আধো-আলো-ছায়ার দিকে রয়ে গেছি,
আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়!

শেষ ঘোড়া | অমিতাভ দাশগুপ্ত

তুমি সেই শেষ ঘোড়া
যার ওপর আমার সর্বস্ব বাজি ধরেছি।

একত্রিশ বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে
এ আমার স্পেকুলেশন,
তোমার ডাইনে সুইট কারাব, বাঁয়ে ব্লিডিং হার্ট,
এক কদম পিছনে গ্রিন কার্ড,
নেক-টু-নেক ফুলমালা—
আমার একত্রিশ বছরের সুখদুঃখ
একত্রিশ বছরের চাপা ব্যর্থতাকে অধীর ক'রে তুমি ছুটছ।

হোয়াইট স্ট্যাণ্ডে বারনাকুলার ভেঙে লাফিয়ে উঠি।
কনুইয়ের ধাক্কায় উল্টে যায় জগৎসংসার।
তোমার পাঁজরের পিস্টনে আমার হাঁফ্‌সে ওঠা বুক
তোমার ছুটন্ত ধমনীতে আমার টালমাটাল রক্ত
তোমার প্রতিটি প্যালপে আমার বাদামি উদ্দাম জলোচ্ছ্বাস—
তোমার অসহ তারুণ্য খানিকটা খিমচে নিয়েছে আমার বয়স।

ভরাডুবির সময় তুমি লাল বয়া
থই থই জলের ওপর পেট্রল-জ্বালা আগুনের হারেম-সুন্দরী,
মরিয়াপন্নার ল্যাসো দিয়ে বেঁধে আনা বজ্জাত ঘোড়া
কদমের চকমকিতে ফুটছে লাল নীল ফুল—
ডাইনে হেলো না বাঁয়ে ঝুঁকো না,
ট্র্যাক সামাল রাখো।

পথ ভুল হলেই
ফেন্সের ওপর রাইফেল উঁচিয়ে আছে তোমার মরণ
পথ ভুল হলেই
আস্তিনে লুকোনো বক্র ছুরিতে ওঁৎ পেতে আছে তোমার মরণ
কাঙাল হয়ে দাবি জানাই
সম্রাট হয়ে পদাঘাত করি
উইন চাই, উইন।

তোমার ডাইনে হুইট ফায়ার, বাঁয়ে ব্লিডিং হার্ট,
নেক-টু-নেক ফুলমালা,
মনে রেখো
তুমি সেই শেষ ঘোড়া
যার ওপর আমার সর্বস্ব বাজি ধরেছি।

আমার নিজস্ব রণনীতি | অমিতাভ দাশগুপ্ত

না, আমি তেমন কোনো বিপ্লবী নই।
আমার এখনো শীত করে,
খিদে পায়,
তেমন কিছু দেখলে মাথার ঠিক থাকে না আমার,
আমি এখনও
সর্বোল দ্বন্দ্বযুদ্ধ
মানুষের সমস্ত স্বভাব সমেত
একটা মানুষ।
আমার সতেরো বছরের ভোল্ট্-কেয়ার ছেলেটাকে
বেশ রসিয়ে রসিয়ে মারা হয়েছিল
আমার চোখের উপর।

সে তার খাঁচে বিপ্লবে বিশ্বাস করত,
প্রশ্রয়ঘন-রসিকতায় আমাকে বলত 'রিকব্যাট রেভলুশনারি',
সদরকোতার কুকুরের দিকে
সে ছুঁড়ে দিয়েছিল তার উপড়ে আনা গরম কলজে,
সুখের বাতির মত তাকে তোলা ছিল তার মরণ।

আমারও নিজস্ব একটা রণনীতি আছে।
মাতাল হয়ে কোনোদিন ডুকরে কেঁদে উঠিনি,
'ওফ্, একটা ছেলের মত ছেলে ছিল আমার।'
সুনসান সকালে
মাথার ভেতরটা যখন তকতকে, নিকোনো,
শানাই আমার ঘুঁটিগুলি,
মন্ত্রীকে চেপে ঘোড়ে-টাকে একটু উসকে দিই,
ঘাড়ের ওপর উশখুশ করে বে-আইনি বাতাস,
আমি শিরটান অনুভব করি,
আর একটা দিন বেঁচে থাকার জন্যেও
কি দারুণ লড়ে যেতে হবে আমাকে।

মৃত ছেলের লাশ কাঁধে নিয়ে
তাই আমার যাওয়া হয়নি
আঞ্চলিক শান্তি কমিটির দপ্তরে,
সকাল সাড়ে ন-টায়
আমার অফিসের খোপায়
যথারীতি ভরা হয়েছে জ্যাম-রুটির বাক্স,
নিয়মমাফিক
অশ্লীল হর্ন দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে গেছে
গাড়ীর পরিবহন নামে মুরগীর খাঁচাটি।

বারবার মার খেয়ে পড়ে না যাওয়াটাও
এক ধরনের জয়।
এভাবেই অকিঞ্চনের মুঠোয় চলে আসে
একটির পর একটি শিবির-ঘাঁটি,

শহর খাক হয়ে গেলে
আবার জেগে ওঠে
তরুণ গেরিলা আর অন্ধকারে সবুজ আর এক শহর,
শব ফুলে ফেটে যায়
কলকাতাময় ইন্‌জেনের স্টোরেজ,
অলক্লিয়ারের শব্দে উঠোনে এসে দেখি
আমার ব্যক্তিগত ডাকবাক্স উপচে উঠেছে
অভিনন্দন ও অভয় পদে ঝাঁটা
নানা রঙের হাতচিঠি

যতদূর চোখ চলে,
পরিষ্কার দেখতে পাই
সামরিক বেসামরিক বলে
আর কোনো আলাদা এলাকাই রইল না আমার।

ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ | অমিতাভ দাশগুপ্ত

ওর মা মরেছে আটষট্টির বন্যায়
বাপ এ সনের খরায়,
ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ—
ও যে যমের অরুচি!

চরায়-বস্তায় খই ফুটছে তপ্ত খোলা
পাথর মাটি পাথর,
গোয়ালে গাই বিইয়েছে
তার দুধ বাঁটে নেই একফোঁটা
পুকুর-নদীর জল শুকিয়ে বাষ্প,
কোলে কলসি, কাঁধে কলসি, কাতার কাতার
ছা, বৌ, জোয়ানমদ্দ ভাতার
চলছে চলছে—
এমন মূকাভিনয়
তাল খেজুরের মাথার ওপর খাঁড়ার মত দাঁড়িয়ে দ্যাখে
অনস্যেয় সময়।

ওর মা মরেছে আটঘরির বানায়
বাপ এ সনের খরায়,
ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ—
ও যে ঘরের অরুচি!
দে দে ছে আনা দে মা সিকি ছে আনা
আমি রাজার ভাগিনা—এসেছি সদর থেকে।
গাঁও-বুড়ো থেকে ঘরের ঝিয়ারি,
বাল-বাচ্চাও শুধোয়—
তুমি কোঁচড়ে এনেছো কি?
এনেছি—এনেছি প্রতিশ্রুতি।
আমি এনেছি টি-আর, জি-আর,
সেচ-প্রকল্প, সার, গরু,
আমি ছ' হাজার নলকূপে
জলে নদী ক'রে দেবো মরু।
এ্যাই আমিন, এদিকে এসো,
ওরা যা বলে সবটা টোকো,
খুব ভালো ক'রে মাপো ঝোঁকো
যত দাবি আছে মোটা সরু—
আমি ছ' হাজার নলকূপে
জলে নদী ক'রে দেবো মরু।

ডাঙের ওপর মাই কামড়ে টিংটিঙে প্যাকাটি—
ফটো খিঁচুন প্রেস।
মজা পুকুরে পেট ফুলে ঢোল শ্যামলী, ধবলী—
ফটো খিঁচুন প্রেস।

এমন মাটি-মায়ের আঁচল
গর্ত খোঁদল ফাটল
হাতিফাটার মাঠ
হা হা দিয়ে ভিক্ষে বাঁট
মুখে মুখোশ এঁটে নিস্

হিস্ হিস্ হিস্ হিস্
অগ্নি-জিরেত জ্বালিয়ে খা খা
কাল কেউটের বিষ।

হট্ যা হট্ ডিয়েটা
এই সিরিসিরি মেয়েটা

ওর মা মরেছে আটষট্টির বানায়
বাপ এ সনের খরায়,
ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ—
ও যে যমের অরুচি!

ভাসান, ভাসান সারাবেলা | অমিতাভ দাশগুপ্ত

সাক্ষী থেকো মহানিম, বিরিঞ্চির পাতা
সাক্ষী থেকো গো-শালার উদূখলে দাঁড়ানো যক্ষিণী
কোমল গোলাপ ছাপ টিনের তোরঙ্গ হাতে
তুষের চাদরে মুখ তুষের অনলে বুক ঢেকে
ভাঙা আল-নাবালের পথে
কোনোদিন নেমে গেছি
কোনোদিন ফিরবো না ভেবে।

গাজনের মেলা ভেঙে
পথে দেখা হয়েছিল শ্মশান-চাঁড়াল,
তারই শুদ্ধতায় দাবি—একমাত্র দাবি আছে তার
যে শাশ্বত-নাভিকুণ্ড
ছাই ঘেঁটে আঙার উগ্‌রে আনে নির্ভুল আবেগে,
সে হঠাৎ সুরা-নীল চোখে
বলেছিল, 'কোথা যাও'
সেই প্রশ্ন উত্তরবিহীন
হেঁকে হেঁকে ফিরে আসে বাতাসে পঞ্জরে,
সুরমার স্নিগ্ধ শবে—পাটভাঙা গরদে, তসরে।

যেপথ ফুলে ফুলে ঢাকা কারা গিয়েছে মাড়িয়ে,
সেই পথে চোরা-জ্যোৎস্না আসে,
এসে, কিছুক্ষণ থেমে, হলুদ গাই-এর চূড়া থেকে
পানার শরের মতো খুব চাপা, মন্থর আবেগে
শীর্ণ পায়ে সরে যায়,
পাছে কোনো ত্যক্ত দেবালয়
দক্ষিণা-প্রয়াসী হয়—সরে যায় মন্থর আবেগে।

যেন গ্রাম্য-বালিকার অনায়াস উলু দেয়া,
জলে খই ভাসানোর অবাধ রীতিতে
সরলতা এনেছিল তারা অকপট, লাবণীল,
সহাস্তে দেখিয়েছিল দুধের ঝলক দেয়া আধফোটা কুঁড়ি,
রেশমি কাচের লালনীল চুড়ি, সুতোর আসন,
অর্থাৎ, যা কিছু প্রিয়—এর গোপনতার সভ্যতা।

এখন এ মুখ ভাখো,
চুন-কালি-মাখা দুই গাল
চোয়ালে দাড়ির দাগ—আমি অতি-নাটকীয় ক'রে
জ্বালাতে তোমার চোখ
এ চেহারা ধরিনি ফেরারী
আমার ভুবন ভ'রে
ঘৃতকুমারীর পাতা ভেসে চলে দক্ষিণ বাতাসে
লেবুর সবুজ গন্ধ আসে,
হেমন্ত কম্পিতস্বরে কানে এসে বলে গেলে, 'চমৎকার রাত'
নীরব বকুল-বীথি আজো কেঁপে উঠে ঝাউবনের আড়ালে,
নক্ষত্রের নিবিড় নিশ্বাস
অশথ পাতার পরে আঙুলের মতো খেলা করে,
তবু কোন ব্যাকুলতা
রজনীগন্ধার ডাল তুলে উঠেছে বুকের পাশে,
শন্‌শন্‌ বহে গেছে
ঘর-ভেদী বিভীষণ-হাওয়া—
'তুমি কি প্রস্তুত?'

ভাসান, ভাসান সারাবেলা।
কখন গর্জন-তেল-মাখা মুখে সমস্ত প্রতিমা
সোনার মুকুট খুলে ভেসে যায় গাঙুরের নীরে,
অলক্তে ফোটায় পদ্ম,
সেই পদ্মে মৃত্যুগন্ধ সাপ
প্রবীণ খোলস ভেঙে উঠে আসে, নষ্ট ভক্তি-খড়ে
ঢেউ আনে অতলতা,
বারবার ডুব গলা তোলে ক্লান্ত চোখে
রবীন্দ্রনাথের সেই উপমা-বিখ্যাত রাজহাঁস,
কখন গর্জন-তেল-মাখা মুখে ভেসে গেছে পাথর-প্রতিমা,
জল ঝাড়ি-পাতি চুকে
কি করে বোঝাই তাকে—
ভাসান, ভাসান সারাবেলা।

মনে আছে, কলকাতা | তারাপদ রায়

তোমার কি মনে আছে, কলকাতা,
আমার সেই সবুজ পাসপোর্ট সবুজ পাঞ্জাবি :
মূল শেয়ালদা স্টেশনে
সেদিন সীমান্তের ট্রেন থেকে ভিজতে-ভিজতে নেমে
জীবনে প্রথম জুতো পালিশওয়ালা দেখলাম।

সেই আমার রোমাঞ্চ, আমার স্বপ্নের শহর
জীবনে সেই প্রথম ট্রামগাড়ি সেই প্রথম ফার্স্ট ক্লাস,
ফার্স্ট ক্লাস কলকাতা,
তোমার প্রত্যেক বাড়ির ছাদে একটু ক'রে পোষা মেঘ
প্রত্যেক জানলায় আলো-অন্ধকারের রহস্যময়তা।

আমার সেই সবুজ জামা, জোড়াতালি জুতো
সেই পায়ে পায়ে ঘোরার বিস্ময়
ভিখিরির সঙ্গে পাগল, পাগলের সঙ্গে মাতাল
রামধনুকের মতো দিগন্ত ছোঁয়া শোভাবাজার

চায়ের দোকানের ভিড় থেকে রাস্তায় অর্থহীন জটলা
দুপুরবেলা ঘূর্ণি হাওয়ায় শুকনো পাতা ছড়িয়ে পড়ে নিচে
রৌদ্রে বাঁকানো হাতির দাঁতের মতো ট্রাম-লাইন
কাউকে কোথাও পৌঁছে দেয় না।
মধ্যে-মধ্যে মনে হয়, আমি আর তোমার সীমানার মধ্যে নেই
আজ কোথাও নেই আমার সেই শহর
যেখানে দুই ল্যাম্প-পোস্টের মধ্য দিয়ে লম্বা পেনাল্টি কিকে
কে যেন শূন্যে পাঠিয়ে দেয় চাঁদের ফুটবল
গ্যালারিতে অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন মানুষেরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'গোল গোল'।

এই কুড়ি বছরেও তোমার সঙ্গে আমার কিছুই মিললো না,
আমার ছেঁড়া স্বপ্ন, আমার শত-ছিন্ন কবিতার টুকরো
ময়লা কাগজের ঝোলায় ভবঘুরেরা
কুড়ি বছর ধ'রে প্রতিদিন কুড়িয়ে নিয়েছে
নিক্তিতে ওজন ক'রে বিক্রি হ'য়ে গেছে
আমার স্বপ্নের শব্দগুলি।

একটিও রহস্যের জানালা কোথাও কেউ খুলে দিলো না
কোনো বাড়ির ছাদে মেঘের কাছাকাছি পৌঁছানো গেলো না
শুধু-শুধু আমার বয়স, জুতোর নম্বর বদলিয়ে গেলো।

আমার ডুগডুগি | তারাপদ রায়

আমি মমতা থেকে তুলে এনেছিলাম পরিহাস
আমি বিষাদ থেকে তুলে এনেছিলাম অশ্রু
আমি ঘুম থেকে তুলে এনেছিলাম স্বপ্ন
আমি স্মৃতি থেকে তুলে এনেছিলাম অভিমান
আমি শব্দ থেকে তুলে এনেছিলাম কবিতা
তুমি কোনোদিন কিছুই খেয়াল করোনি

আমি বিষাদসিন্ধুর তীরে দাঁড়িয়ে ডুগডুগি বাজিয়েছিলাম
তুমি সেই বাঁদরনাচের বাজনা শুনতে পাওনি।

উদ্বেগের অনন্ত বাতাসে ঝরা পাতার মতো উড়ে উড়ে পড়েছে
আমার পরিহাসময় অশ্রু, আমার স্বপ্নময় অভিমান।

তুমি লাল মখমলের চটি পায়ে রেশমের চাদর জড়িয়ে
উজ্জ্বল রোদের মধ্যে উদাসীন হেঁটে গেছো
তোমার পায়ের প্রান্তে ঘুরে ঘুরে লুটিয়ে পড়েছে
ঝরা পাতার মতো আমার পরিহাস, আমার কবিতা
তোমার শ্রুতি ছুঁয়ে ভেসে গেছে আমার ডুগডুগির বোল

বছরের পর বছর, দিনের পর দিন
গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, শুধু শীত আর শীতের হাওয়া
ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন, স্বপ্নের মধ্যে অভিমান
শীতল অভিমানে জড়ানো ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঝরা পাতা
এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে রোদের উজ্জ্বলতায়।
তুমি উদাসীন চলে গেছো
কোনোদিন তাকিয়ে দেখোনি,
তুমি কোনোদিন শুনলে না
আমার ডুগডুগি, আমার বাঁদরনাচের বাজনা।

স্বন্দরবন | নবনীতা দেব সেন

ওরা ভাবছে চুলের বনে হাঁক দিয়েছে রুপুলি বাঘ
ওরা ভাবছে রূপ ভেঙেছে, এবার কেবল রূপোরই হাঁক
এবার বুঝি অন্ন খপাক।
ওরা জানে না।
ওরা কি জানে, রূপের তলায়, রূপের নিচে
আরেকটা রূপ লুকিয়ে হাসে, লুকিয়ে নাচে?
সেই রূপটাই জ্যান্ত ভীষণ
হেঁতাল পাতার মধ্যে যেমন
ঝাপ্‌টি মারে বাঘের ডোরা।

চলতে ফিরতে প্রাণের তলায়
আড়াল থেকে আস্‌তো ঝাঁপায়
আছড়ে মারে,
আরেকটা প্রাণ। ঘাড় ভেঙে দেয়।
কী দুর্দান্ত!

বাইন গাছের ডালকে যেমন আস্‌তো কোলে
মৌমাছি চাক, কালবিষ, আর মধু বেবাক্‌—
বিষের জ্বলন সইতে পারলে ধৈর্যি ধরে রইতে পারলে
তবেই না হয় মহাল লয়া? জানলে, তবে
আপনি তোমার মধুর হাঁড়ি ভর্তি হবে।
ওরা কি জানে, মহালভাঙা?
ওরা জানে না।

চুলের বনকে রূপুলি হাঁক
বুকের মধ্যে সোনালি চাক
রূপটা কেবল বাইরে থেকে ঘরকে পালায়।
ভেতরে যায়। রূপ ভাঙে না।
ওরা জানে না।

খাড়ির জলে ভর্তি কামট, দাঁত ধারালো
ও-জলে হাত দিও না, পা দিও না, চান কোরো না
ও-জলে মরণকামড় কামট ভরা—হেঁইঃ সামাল্লা—

কিন্তু তোমায় নৌকো তাতেই বাইতে হবে,
হেঁইও হো:
ভাটার টানে সেই জলেতেই 'আল্লা' বলে
প্রাণের দায়ে বাঁশ দিয়ে গুণ টানতে হবে,
হেঁইও হো:
না জানে তো এসব খবর ওদের এবার জানতে হবে—
হেঁইও হো:।

দেখে নেবেন | তুষার রায়

বিদায় বন্ধুগণ, গনগনে আঁচের মধ্যে
শুয়ে এই শিখার রুমাল নাড়া নিভে গেলে
ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন পাপ ছিল কিনা।

এখন আমার কোন কষ্ট নেই, কেননা আমি
জেনে গিয়েছি দেহ মানে কিছু অনিবার্য পরম্পরা
দেহ কখনো প্রদীপ জ্বলতে ঠাকুরঘর
তবু তোমরা বিশ্বাস করো নি
বারবার বুক চিরে দেখিয়েছি প্রেম, বারবার
পেশী অ্যানাটমী শিরাতন্ত্র দেখাতে মশায়
আমি গেঞ্জি খোলার মতো খুলেছি চামড়া
নিজেই শরীর থেকে টেনে
তারপর হার মেনে বিদায় বন্ধুগণ,
গনগনে আঁচের মধ্যে শুয়ে এই শিখার রুমাল নাড়ছি
নিভে গেলে ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন
পাপ ছিল কিনা।

আধুনিকতার শেষ | তুষার রায়

এ রকমই হবে ভবিষ্যতে নাটক যখন
পাত্র-পাত্রী চুপচাপ যাবে আসবে, কাছে কিংবা দূরে
ভাবনাম্যবিচলিত হাত পা এবং মাথা নাড়বে,
করাত ধরার মতো কর্কশ শব্দ কিংবা সুরে
আবহসংগীত কিংবা নৈঃশব্দকে পাংচার করে যেন
স্পষ্ট কথার মতো কষ্ট দেবে কানে,

এ রকমই হবে নাটক, যখন পাঠককে অস্ত্রোপচারে
উপযোগী করে নেওয়া হবে নাটকের, যাতে কিনা
শিকারের দৃশ্যে বাঘ মারতে পারবে সেও, যাতে পারে
সুখের দিনে হাসতে, বিচারের সময়ে কাঁপতে

এবং অভিকর্ষহীনতায় যাতে কিনা ভাসতে পারে
এবং অক্সিজেন ছাড়াও নিতে পারে নিঃশ্বাস,

আমার বিশ্বাস, এ রকম ও রকম বা সে রকম
যে রকমই হোক না কেন কবিতা অথবা নাটক
যাতে কবি, নাট্যকার কিংবা পাঠক, এই তিনেই
আসল ব্যাপারগুলো শুনে জেনে অথবা চিনেই
আত্মহত্যার দৃশ্যে আত্মহত্যা, খুনের দৃশ্যে খুন
করতে পারবেন ধর্ষণের দৃশ্যে প্রকৃত রেপ
তা হ'লেই দেখবেন চমৎকার প্যাটার্ন বা শেপ
একটা এসে যাচ্ছে আধুনিকতায়।

এখন রাজা | পবিত্র মুখোপাধ্যায়

তিনি চলেছেন
পথের উপর ঝ'রে পড়ছে পালক
মুকুট থেকে খ'সে পড়ছে নাম
তিনি চলেছেন
যে সব অন্ধ একদিন
প্রভুর যাত্রাপথের উপর
ছড়িয়ে দিত ফুল
উত্তরীয় দিয়ে মুছে নিত ধুলোর উদ্ধতা অন্ধতা
যেসব কুমারী একদিন
মাথার রূপবতী চুলে মুছিয়ে দিত
প্রক্ষালিত প্রভুর চরণ
আজ তারা আজ তাদেরই হাতে
পাথর কাঁটার মুকুট
চোখের মণিতে অকারণ ঘৃণা আর হিংস্রতা
তিনি চলেছেন
জনতায় নির্জন একা
ঝ'রে পড়ছে পালক মুকুট থেকে খ'সে পড়ছে বৈদূর্য
চোখের তারা আলোহীন স্তব্ধ মৃত

পিছন ফিরে দেখেন
অপরাহ্ণের আলোয় জ্বলছে
যৌবনের অর্ধসমাপ্ত মিনার স্তম্ভ
পথের উপর ঝরে পড়ছে নানা রঙের আনন্দ
পাথর লেগে রক্ত ঝরছে বিকচোন্মুখ ফুলের বুকে
এখন তিনি
অস্তসূর্যের মুখোমুখি নিতান্ত একা
ছিঁড়ে গেছে রাজকীয় পরিচ্ছদ
খসে গেছে পালক মুকুট থেকে নাম
এখন তিনি উলংগ
এখন তিনি পথের ভিড়ে মুখ লুকোবার ছায়া খুঁজছেন

চোড়ুইভাতির গল্প | পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সন্ধে না হতেই ওরা ফিরে গেছে ; তখনো
বিকেলের ধাই ধাই রোদ ঝিরঝির করে কাঁপছিলো
ঘাসের ডগায়, কাঁপছিলো
গাছের পাতায়, ডোবার জলে : নদীর
বুক নিঙড়ে উঠে আসছিলো
বিষাদজড়িত বাতাস, তখনো
একটা বুকনিঙড়ানো ঠাণ্ডা হাওয়ার ঘূর্ণি
ধানকাটা মাঠের মধ্যে পাক খাচ্ছিলো
উড়ছিলো শুকনো পাতা, ছেঁড়া ঠোঙা
সোনালী রিবণ, ছাই

সন্ধে না হতেই ওরা ফিরে গেছে ; তখনো
শালপাতা, মাটির গ্লাস, মুরগীর পালক, রক্ত
ওলটানো মাটির গ্লাস, মদের বোতল, সিগারেটের
পোড়া টুকরো, প্যাকেট
ওরা রেখে গেছে মাটির কলসি, তাড়ির
উগ্র গন্ধ, মাছি

ন্যাংটো কালো ছেলের দল খুঁজছে উচ্ছিষ্ট
পোড়া সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে টান, ফেলছে
ধুম নৈরাজ্যে
কেউবা তাড়ির খালি কলসি ঢালছে গলায়
ওরা খুঁজছে যদি কিছু পড়ে থাকে, যদি…
একটা উত্তুরে হাওয়ার ঝড় এলো ধেয়ে
হাড়কাঁপানো শীতে কেঁপে উঠলো মাঝমাঠের শূন্যতা
কয়েকটা জলসে বাঁশপাতা উড়ে এলো, কিছু
ছেঁড়া কাগজ
একটা ক্ষুব্ধ কুকুর চীৎকার জোরে উঠলো কেঁদে
নির্জনতা লাফিয়ে পড়লো ডালপালার আড়াল থেকে
ঝুপঝাপ মাটিতে
মাটি থেকে উঠতে লাগলো ধোঁয়া
ঘনীভূত শ্মশান উঠলো জেগে
হাড়পাঁজরা কাঁপিয়ে

আলেকজাণ্ডার বিক্রি করে দাঁতের মাজন | রুদ্রেন্দু সরকার

থাক সমস্ত আকাশ নীল হয়ে,
রামধনুর বর্ণচ্ছটা তোমাদের জন্যে তোলা থাক।
চিন্তা, স্বপ্ন কল্পনায় আমার ভাতের হাঁড়ি বিষ হয়ে গেছে।

আর তুমি রংমশালের আলোয় আমার চোখ ধাঁধিও না।
কত বার আনন্দের আতিশয্যে নুয়ে পড়ে আছে।
কতদিন হলো, বেদুইন তোমার ঘোড়ার খুরের শব্দ
শুনতে পাই না।
জানি না কোথায় দাঁড়িয়ে আছে ভালবাসা পথের বাঁকে।
হ্যাংলা হয়ে পয়সা চাইছে প্রতি জনে জনে।

হে রাজকন্যা তুমি রাজার মেয়ে, হাত তুলছো কেন।
ঝিরিঝিরি মেঘের মত তোমার নরম বুক উঁচু হয়ে থাক।
হিংসে-পাঁকের পৃথিবীটা একবার প্রাণ-ভরে দেখে নাও।

কান পেতে শোন—এখানে দাঁড়কাক প্রতিদিন ডাকে।
সেরিয়া থেকেলা কিবা ক্যাথারিন ওদের কথাই তুমি জানো।
তুমি জানোনা ক্রেতাবিক এ যুগের কারখানার কুলী।
নেপোলিয়ন ট্রাক চালায় খুব জোরে—আর আলেকজাণ্ডার
বিক্রী করে দাঁতের মাজন ট্রেনের প্রতিটি কামরায়।

শপথ | শান্তনু দাশ

ঝরা পাতা উড়ে আসে পাতার মতন
নাকি প্রজাপতি
হারিয়েছে পথ।
হারালেই হ'ল?

শপথতো কিছু ছিল—পরাগের গায়ে
রেণুর নিবিড়ে, পথের আড়ালে কোন পথে
পরাগের গায়ে, কোন মধ্যযামে
খবর দেবার কথা
মনে আছে?

পাপড়িরা ফুল হ'য়ে জেগে আছে শিরায় শিরায়:
পত্র দেবার কথা,
মনে আছে?
নিবিড় সংযমে তুমি সাপুড়ের মতো তুলে নেবে বাঁশি,
মনে আছে?
নরম মোমের মতো পাতার চামর, নীল স্বপ্ন,
মনে আছে?

ঘরে
চল—
আলো গেলে তবু চোখে বিঁধে থাকে ডিম্না-পাহাড়
জেগে থাকে।
অতটা সহজ নয়, প'ড়ে আসা গৈরিক বিকেল:
এইসব ওড়াউড়ি খেলা।

নিরালা পবন আসে হাওয়ায় হাওয়ায়
দিন যায়
সময় আছড়ে তাকে শিলালিপি।

ব'লে—
হারিয়ে যাবার আগে শপথের কথা যা যা ছিল
হারালেই হ'ল।

লাল* মাটি নীল অরণ্য | শান্তি সিংহ

১

লাল মাটি আর শাল পলাশ মহুয়ার নীল অরণ্যের বুকে
　　　　মানুষ আজো প্রাণ খুলে গান গায়
　　　　সর্বস্ব বিলিয়ে তার ভালোবাসার জন্য
　　　　বিপদের দিনে গুলি-খাওয়া বাঘের মতো হাঁকার তায়
　　　　শোকে কাঁদে শিশুর মতো অঝোর ধারায়।
　　　　প্রচণ্ড রোদে মাটি ফাটলেও তাদের পিঠ ফাটে না
　　　　গাঁইতির মুখে তারা আগুনের হল্কা ছুটায়
　　　　আবার বর্ষার তোড়ে পাহাড়ী নদীর মুখে
　　　　কুঁড়েঘর ভাঙলেও তাদের মন ভাঙে না।
　　　　তারা বেঁচে থাকে ঘুঙ্-এর টোকা মাথায়
　　　　ছিনে জোঁকের আশ্লিষ্ট চুম্বন দেহে নিয়ে
　　　　　　শরতের হাসির প্রত্যাশায়—
　　　　যখন শিমুল, মহুয়া আর পুটুসের শোভায়
　　　　　　　　বন আলো হয়ে যাবে।
　　　　এ এক আশ্চর্য জগৎ
　　　এখানে সভ্যতার আলো পৌঁছায় না—
　　　　তবু এদের হৃদয়ে শুভ্রতার আলো থাকে জেগে।

২

　　　　আদিম আরণ্যক স্বভাবের মাঝে
　　　　গুনগুন করে ওঠে ভ্রমর

ডানা নাচিয়ে যায় প্রজাপতি
জ্যোৎস্নারাতের অবিরল ধারায়
অপার্থিব আনন্দের মত্ততায়
কুন্দলায় হরিণীর নীল চোখে চিতার আগুন ওঠে জ্বলে ;
থরথরে কেঁপে ওঠে শাল সেগুন আর অর্জুন
লকলকে ধানের সবুজ সুঘ্রাণ
ওরা তখন জোর জোর নিশ্বাসে পান করে ।
জ্যোৎস্নায় আনন্দ ঝরে পড়ে
দুধেল জ্যোৎস্নায় স্নান করে
আজাবিরা, দালমাচাটি, চাষিবুরুণ
আশ্চর্য মানুষের দল ;

কোয়েল, সুবর্ণরেখা, কংসাবতীর তীরে তীরে
বেজে ওঠে মাদল দ্রিমি দ্রিমি রবে
ধরিত্রীর নাভিমূল থেকে প্রণবমন্ত্রের মতো
সিংবোঙা, চাণ্ডীবোঙা, মারাংবুরুর পুজোয় ।

৩

ধূর্ত চিতা আর হায়েনার মতো
মান্কি-মুণ্ডা, হো-দের ওপর লাফিয়ে পড়ল
দেশী বানিয়া আর বিদেশী ইংরেজের দল
কন্যাসুন্দরীদের কুঁদ-কাটা-নিটোল শরীরের মহুয়া গন্ধে
মত্ত হল হিংস্র দিকু শ্বাপদেরা ।
আদিম রিরংসার তীব্র উত্তেজনায়
নারীদেহে কাটল নখ ও দাঁতের নক্সা—
কাড়া-খুঁটার কাড়ার মতো নিষ্ফল আক্রোশে
মাটি উৎক্ষিপ্ত করে হুঁসল অরণ্য পুরুষ—
চোখ ও নাসারন্ধ্র ফেটে ঝরল কাঁচা রক্ত ।

৪

দেখতে দেখতে রোষে ক্ষোভে ফেটে পড়ল জঙ্গল মহল
জ্বলে উঠল বল্লম আর কাপি

ঝন্‌ঝনিয়ে গেল তীর
ঝাঁকে ঝাঁকে শ্রাবণের জলধারার মতো—
সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়ে ফুঁসে উঠল অরণ্য পুরুষ :
'দেলায়া সিং দিশুম নোলো কো
দেলায়া বিরিদ পে
দেলায়া নবু দিশুম মুক্তা কো
দেলায়া সারাবেন পে
সারকাপি সবে কে : তেসা
দেলায়া বিরিদ পে—'

৫

অপমানিতের ব্যথা লাল হয়ে ফুটে উঠল
বসন্তের শিমুল ফুলের মতো—
ক্ষিপ্র টাঙির মুখে ঘোড়ার মুণ্ড আর
গোরার মাথা আছড়ে তালের মতো পড়ল মাটিতে
কালরজলা তীক্ষ্ণ তীর বুক ফাটিয়ে দিল অনেকের।
কিন্তু গোরা ঘোড়সওয়ারের গুলি
বিদ্ধ করল আদিম শৌর্য ও সরলতাকে :
বৈশাখী ঝড়ে শিমুল তুলোর মতো
ছিন্নবিচ্ছিন্ন হল অরণ্য পুরুষের দেহ
তবু প্রাণ থাকতে কেউই হটল না।
ধীরে ধীরে সব চঞ্চলতা এল নিভে—
সূর্য পশ্চিম অরণ্যের গভীরে হারিয়ে গেল।

আপন স্বভাবে একরোখা, টগবগে-ফুটে-ওঠা মানুষগুলোকে
ইতিহাস বলল : অসভ্য, বর্বর—
তাদের স্বাধীনতার জাগ্রত-স্বপ্নকে আখ্যা দিল
'সাঁওতাল বিদ্রোহ' —'চুয়াড় বিদ্রোহ' বলে।

৬

ধূর্তের ছলনায় ধরা পড়ল অরণ্যপুরুষ
ফাঁদে যেমন নিরুপায় হয় বন্য হাতি

দিনের প্রখর আলোয় পোষ মানলেও
রাতের গভীর আঁধারে
তাদের মনে শঙ্খচূড় ফণা দোলায়।
চাঁদনি রাতের সহজ উজ্জ্বলতায়
যখন দল্‌মা আর অযোধ্যা পাহাড়ের ঢেউ খেলানো সারি
নীল কুয়াশার ওড়না গায়ে নাচে
তখন ওদের মন থেকে সব আবরণ যায় সরে,
ওরা মাদলের তালে তালে গেয়ে ওঠে :
'সেলায়া সিং দিশুম নোলো কো
সেলায়া বিরিদ পে
সেলায়া নবু দিশুম মুণ্ডা কো
সেলায়া পায়াবেন পে
সারকাপি সবে কে : ভেগা
সেলায়া বিরিদ পে—'

মনে রেখ | সব্যসাচী দেব

মনে রেখ, আমরা এসেছিলাম,
হে রূপসী ধরিত্রী, জননীপ্রতিম মৃত্তিকা
তোমাদের ঋণ রক্তে,
যখন সময়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায় লাফিয়ে উঠেছে
মহিমময় অগ্নিশিখা,
সমুদ্র-ঢেউ'এর মাথায় নেচে উঠেছে
স্পন্দিত বিশ্বাস—
আমরা এসেছিলাম ;

মনে রেখ, আমরা এসেছিলাম ;
দিগন্তে নবজাত সূর্যকে দেখে আমাদের বোবা বিস্ময়
গুহার দেওয়ালে ফুটেছিল আঁচড় হয়ে,
দৃষদ্বতী আর সরস্বতীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ থেকে
একদিন বিতাড়িত হয়েছিলাম আমরা,
অরণ্যের সজ্জা সেই থেকে আমাদের সঙ্গী।

মনে রেখ, আমরা এসেছিলাম,
লালমাটির বুকে আমরা গড়েছিলাম আড়াল,
আঠার শ' সাতান্ন'র হাতে আমরা ছুটন্ত ঘোড়সওয়ার,
আমরা এসেছিলাম ভাগনাদিহির মাঠে,
চট্টগ্রামের পাহাড়ে,
বোম্বাই'এর সমুদ্রে আছড়ে পড়েছিল
আমাদের কামানের গোলা।

মনে রেখ, আমরা এসেছিলাম;
তেরশ' পঞ্চাশে ক'লকাতার পথে
আমার মৃতদেহ ঠুকরে খেয়েছে শকুন,
কাকদ্বীপের ফেরারী কৃষাণ আমি,
আমি অহল্যার মৃত সন্তান,
নক্সালবাড়ির প্রান্তরে আমার হাতে উঠে এসেছিল কথাহীন আয়ুধ।

মনে রেখ, আমরা এসেছিলাম,
হে আমার স্বদেশ, আমার স্বকাল ভাবীকাল,
আমার প্রিয় মানুষেরা,
মনে রেখ—

আমাদেরও কঠিন মুঠিতে ধরা ছিল সময়ের সাধ,
কোন দীপ্ত জাগিশজনের কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল,
শরীরে ছিল যুবতীর তপ্ত শরীরের স্বাদ,
মদির কোন মুহূর্তে নক্ষত্রমণ্ডলীর কাছে
আমরা উচ্চারণ করেছিলাম ভালবাসা,
মোহহীন, বোধহীন, বিষণ্ণতাহীন শিশুর নিশ্চিন্ত মুখাবয়বে
গচ্ছিত রেখেছিলাম আমাদের ভবিষ্যৎ;

মনে রেখ, আমরা এসেছিলাম;
আকাশ আর সমুদ্রের মাঝখানে
নেমে আসে কুয়াশা,
তরঙ্গিনী নদীর মাথায় নেচে ওঠে আলোকশিখা,
আর আমাদের অভিজ্ঞান ছুঁয়ে থাকে আগামী পৃথিবী;

মনে রেখ।

চণ্ডালিকা | সব্যসাচী দেব

মা, দিগন্তে তাকিয়ে দেখ
রক্তিম মেঘে সর্বনাশের আভাস,
ঐ সর্বনাশের আগুন পেরিয়ে
আমার দুয়ারে এসে দাঁড়ায়নি কোন আনন্দ,
অঞ্জলি পেতে কেউ বলেনি—'জল দাও'।

সারাজীবন আমাকেই তীব্র পিপাসায়
চিৎকার করতে হয়েছে—জল দাও, জল দাও।

চৈত্রের মধ্যদুপুরে পাখিরাও ডানা গুটিয়ে নেয়,
দূর শহরের রাস্তায় বাবুদের ভিড় নেই,
গাঁয়ের কুকুরগুলো ঢুকে যেতে চায় উঠোনের ছায়ায়,
আমাকে এখন যেতে হবে দূর নদীর চড়ায়,
বালি খুঁড়ে তুলে আনতে হবে ফোঁটা ফোঁটা জল,
তারপর ফিরে আসব খরায় ফাটা মাঠ, শুকনো পুকুর
আর টলটলে জলে ভরা নতুন ইঁদারার পাশ দিয়ে—
বাবুদের ইঁদারা।

তৃষ্ণায় ডুবে যায় আমাদের গোটা গাঁ,
কুকুর আর মানুষের জিভ ঝুলে পড়ে,
আর বাবুদের ইঁদারায় বাবুদের ছেলেদের স্নান;

আমাদের শরীর জ্বলে যায় চৈত্রের খরায়।

মা, আমি এক চণ্ডালিকা;
বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, রাঢ়ের হা-হা করা মাঠ কাটিয়ে,
বিহারের তপ্ত প্রান্তর চিরে আমি চিৎকার করছি
জল দাও।

আর আমার সারা শরীরের রক্ত উঠে আসছে মাথায়।

মা, এককোঁটা জলের দাম আমাদের গোটা জীবন।

কর্ণ | সব্যসাচী দেব

তাহলে সময়, অর্জুন।
দ্বৈরথ সময়,
উত্তর কুরুও জুড়ে সরমাদ্ হত্যারক ছায়া,
বুকের নিভৃত থেকে উঠে আসে অরণ্য-পিপাসা,
সমস্ত শিকড় জুড়ে প্রতিহিংসা ঢালে বিষ ;
এতদিনে, অর্জুন, এতদিনে
মুখোমুখি তোমাতে আমাতে।

তিলে তিলে শোধ করছি অযাচিত জন্মের ঋণ,
আশৈশব আকাঙ্ক্ষার ভেলা বেয়েছি উজানে,
আজ সেই ধ্রুব-লগ্ন ,
দেখ, এই মধ্য দিনে কনিষ্ঠ আঙুলে আমি ধরে রাখি সমস্ত পৃথিবী,
নেই একাঘ্নী আয়ুধ, কবচ-কুণ্ডল ন্যস্ত ছদ্মবেশী ভিক্ষুকের হাতে,
আর নেই, এমনকি জীবনেরও নেশা
বিলিয়ে দিয়েছি তা গত গোধূলিতে ;

অস্তমান সূর্যকে ঢেকে, আমার সামনে এসে
মাতা কুন্তী ভিক্ষা চাইলেন পঞ্চপুত্রের প্রাণ,
তাঁর চোখের মিনতি তোমারই জন্য হে অর্জুন ,
সেই মুহূর্তে জানলাম, যদি জয়ী হই সমস্ত জীবন
আমাকে বহন করতে হবে অভিশাপ—আমার মাতার ,
এইবার লগ্ন এল, তৃতীয় পাণ্ডব। শেষ খেলা ;
বাজি রইল যে কোন জীবন, ধনুর্বাণ হাতে নাও,
এ খেলায় পরিত্রাণ নেই কোনও, কারও নেই তোমার আমার।

২

আমাকে একমুহূর্ত ভিক্ষা দাও, কৌন্তেয় ;
সারা শরীর ভারী হয়ে আসছে পাথরের মত
বড় দীর্ঘকাল রণক্ষেত্রে আছি।
সমবেত জনতার অট্টহাসি, আচার্যের প্রত্যাখ্যান, তোমার বঙ্কিম বিদ্রূপ,
এর মাঝে তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম আমি ক্রীড়াঙ্গনে

জানতাম আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই ভারতভূমিতে তুমি ছাড়া
প্রবল স্পর্ধায় ছুঁড়ে দিয়েছিলাম দ্বন্দ্বের আহ্বান,
কিন্তু বিনা যুদ্ধে তুমি অর্জন করে নিলে শ্রেষ্ঠত্বের বরমালা ;

আরও একবার, কাঙ্ক্ষিতা নারীকেও তুমি জিতে নিয়েছিলে
আমার অবনত দৃষ্টির সামনে থেকে,
অসিতাক্ষী অগ্নিকন্যা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন
সূতপুত্রকে বরণ করার অনিচ্ছায় ;
তবু স্থির করিনি আমার পথ,
বারেবারে আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি সূতপুত্র
বারেবারে আমি ভুলতে চেয়েছি সেই পরিচয় ;

অধিরথ দিয়েছিলেন স্নেহ ; সামান্যা নারী রাধা
আমাকে পূর্ণ করেছিলেন মাতৃত্বের অমৃতে
আর প্রতি মুহূর্তে সেই ভালবাসা আস্বাদন করতে করতে
আমি ভেবেছি, এখানে নয়, আমার স্থান পাণ্ডু-রাজ গৃহে ;

যা কিছু আমার আকাঙ্ক্ষা, তাই আমাকে অর্জন করতে হয়েছে
মিথ্যার আড়ালে। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পেয়েছি শস্ত্রজ্ঞান,
বিদ্রূপের প্রতিবাদে বজ্রমুষ্টি তুলে ছেড়ে আসিনি ক্রীড়াভূমি,
দুর্যোধনের অনুগ্রহ বরণ করে, আত্মবঞ্চনার মোহে নিজেকে ভুলিয়ে
বসেছি ছদ্ম-ক্ষত্রিয়ের সিংহাসনে।
আর বিনিময়ে বিলিয়ে দিয়েছি আমার স্বাধীনতা।

বিশাল সভাগৃহে দুঃশাসনের লোলুপ আঙুল
যখন ছিঁড়ে নিচ্ছিল দ্রৌপদীর লজ্জা
ক্ষণিকের জন্য আমার তূণীর থেকে তীর উঠে এসেছিল হাতে
আমার কাঙ্ক্ষিতার অপমানে—
পরক্ষণেই করতালিতে ব্যস্ত হয়েছে দু'হাত,
কেননা দুর্যোধন আমার উপকারী বান্ধব, আমার প্রভু।
প্রতিমুহূর্তে দুর্যোধনের ভ্রূকুটি স্থির করে দিচ্ছিল আমার কর্তব্য
আর প্রতিমুহূর্তে নিজের অক্ষম ভীরুতাকে ঢেকে রাখার জন্য
উচ্চরবে প্রচার করেছি আমার শৌর্যের অহংকার।

তারপর এল এই মহালয়। প্রত্যাবর্তনের কোনও পথ নেই;
দুই পক্ষ ভারত সমরে, একদিকে আমার অনুজাতা, অন্যপক্ষে
আমার দাতার শতপুত্র। মাঝখানে আমি সূতপুত্র,
রাধার সন্তান, কেউ নই যুযুধান শিবিরের, অন্নের দায়ও
তবু টান দেয় স্বেচ্ছাবৃত শৃঙ্খলের পাকে।

রণক্ষেত্র থেকে দূরে, ডাঙা ছাড়িয়ে, শুধু দীর্ঘশ্বাস
ফেলে যায় এক নারী, যার নাম রাধা, যার স্বামী সামান্যই রথের সারথি।
মাঝে মাঝে সেই দীর্ঘশ্বাস আমাকে ছুঁয়েছে; ভেবেছি তা বুঝি
উত্তরের হিমেল বাতাস। কানে ভেসে এসেছে মৃদু কান্নার শব্দ
ভেবেছি তা বুঝি দূর দক্ষিণ সমুদ্রের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস।

আর প্রতি সন্ধ্যায়
সূর্যবন্দনার ছলে নামিয়ে রাখতে চেয়েছি
আমার অপরাধের ভার,
চারপাশে গাঢ় হয়ে নেমেছে
শ্মশানের ছায়া;

ঝিঁঝিনি তবুও সেখানে স্বদেশ।

৩

কেউ নেই আত্মীয়-বান্ধব, তাদের ফিরিয়েছি নিজে
পরিবর্তে চেয়েছি কৌরব-সম্মান,
যে ছিল স্বজন, রূঢ় অস্বীকারে বিমুখ করেছি তাকে
ভুলেছি স্বস্থান;
আমি ভুলেছিলাম, তাই এই মুহূর্তে আমাকেও ত্যাগ করল
আমার অভ্যস্ত বিদ্যা, আজন্ম-লালিত অস্ত্রজ্ঞান;

অর্জুন, মেদিনী নয়, রথচক্র গ্রাস করছে আমারই সে দ্বিধা।

৪

বড় তৃষ্ণা ওষ্ঠ জ্বালিয়ে নেমে যাচ্ছে বুকের ভেতর
সামনে কে তুমি?
অর্জুন।

একটু সরে দাঁড়াও, আমাকে দেখতে দাও
বিদায় বেলার সূর্য।
আর কার মুখ ঝুঁকে পড়ছে চোখের ওপর!

আমাকে মার্জনা করবেন, পিতা অধিরথ;
আর অর্জুন, আমার তূণীর থেকে তুলে নাও একটি তীর
ধনুকে রোপণ কর তা, দূর গঙ্গাতীরে নিস্তব্ধ কুটিরে
একাকিনী রাধার কাছে পৌঁছে দাও আমার প্রণাম।

আর হে মৃত্তিকা, জীবনে এই প্রথম মাথা রাখলাম
তোমার কোলে; গ্রহণ কর আমাকে।

কৃষ্ণা | সব্যসাচী দেব

আমার কোন শোক নেই, আমার কোন বিষাদ নেই।
হে কুরুবৃদ্ধগণ, আপনাদের নীরবতায় আমার কোন ক্ষোভ নেই

পিতামহ ভীষ্ম, ক্ষমা করবেন,
আপনাকে প্রণতি জানাবার স্থিরতা আজ নেই।
আর কর্ণ, তোমার জন্য ঘৃণাও বড় বেশী মনে হয়।

আর হে আমার পঞ্চস্বামী, আর্যাবর্ত বিজয়ী বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন,
শক্তিমান ভীম, নকুল, সহদেব আর আপনি ধর্মপুত্র—
আপনারা আমার কৃতজ্ঞ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আমি সর্বজ্ঞা নই: যজ্ঞভূমের অগ্নি থেকে
আমার জন্ম, ধর্মাধর্মের ক্ষুরধার পথ আমার অজানিত;
আর্যপুত্র, আপনার বিচার তাই আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।
আপনার কোন বিচলন নেই, আপনার ধর্ম আপনাকে
রক্ষা করেছে বিকার থেকে—কৃতজ্ঞতা জানান সেই ধর্মকে।
ভীমসেন, তোমাকে আমি ভালবাসা দিই নি কখনও,
তাই তা ফিরেও চাইনি।

শুধু তোমাকে আমার জিজ্ঞাসা ছিল ফাল্গুনী,
ঊর্ধ্বচারী মধ্যন্দের ছায়াহীন চোখের থেকেও দুর্লক্ষ্য কি
দুর্যোধনের বুক ; বল সত্য করে, প্রেম নয়,
শুধু পৌরুষের আস্ফালনই ছিল পাঞ্চালী বিজয়ের পটভূমি ?

কিন্তু মিথ্যা প্রশ্ন ; আমি জানি তোমার কোন
উত্তর নেই, যেমন নেই কোন ভালবাসা।

তোমার শুধু আশা আছে ; কৈশোর থেকে তুমি
জেনে এসেছ বীরভোগ্যা পৃথিবী আর রূপমুগ্ধা নারী ;
জেনেছ একদিন ধার্তরাষ্ট্রের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে
কৌরব-উত্তরাধিকার ; জেনে এসেছ যেখানে যা কিছু সর্বোত্তম
সেখানেই পৌঁছতে হবে তোমাকে। শুধু এই কুমারী-লক্ষ্যের
দিকেই তোমার দৃষ্টি, ধনঞ্জয়। তাই অনায়াসে তুমি সরে যাও
এক নারী থেকে অন্য রমণীতে ; তোমার পূর্বপুরুষেরা যেমন একদা
এক তৃণপ্রান্তরকে নিঃশেষ করে চলে যেতেন বনান্তরে।

এই দ্যূত সভায় দাঁড়িয়ে আমাকে জানতে হল
নারী শুধু কয়েক প্রহরের বিলাস-সঙ্গিনী ;
মণিময় হার, শত সহস্র তরুণী দাসী, দাক্ষ মাতঙ্গ,
গন্ধর্বপ্রেরিত অশ্বযূথ আর আমি পাণ্ডুপুত্রবধূ—
এক পংক্তিতে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই অপেক্ষায়।

পিতৃগৃহে যেমন দেখেছিলাম, আহিরিনীরা দূর গ্রাম থেকে
নিয়ে আসে তাদের পসরা—আর তার ওপর ঝুঁকে পড়ে
লুব্ধ ক্রেতার দল—আমাদের ব্যবহার করার জন্য
তেমনই উন্মুখ হয়ে আছে, যারা আমার পতির আত্মীয় ;

আর আমাকে, আমাদের বিলিয়ে দিচ্ছেন যাঁরা,
তাঁরা আমার পঞ্চস্বামী—বিবাহের মঙ্গলসূত্র হাতে বেঁধে যাঁরা
একদিন আমার ওপর নিরঙ্কুশ করেছিলেন তাঁদের অধিকার।

না, শুধু এই রত্নমণ্ডিত সভাগৃহেই নয়—
আরও আগে আমাকে জানতে হয়েছিল
আমার কোন বাসনা নেই, নেই কোন নিজস্ব ইচ্ছা ;

অর্জুন, প্রথম দেখার মুহূর্তে আমার হৃদয় দিয়েছিলাম তোমাকে ;
অথচ আমার শরীরকে প্রথম আলিঙ্গন করলেন
ঐ মহাভাগ, যাঁর খ্যাতি ধর্মপুত্র বলে।

ইন্দ্রপ্রস্থ'র সৌধশিখরে যখন আছড়ে পড়ত
নববর্ষার জলধারা, যখন আমার কামনা ছুঁতে চাইত তোমাকে,
আমার অনুৎসুক দেহকে তখন আকর্ষণ করত অন্য কেউ,
যে আমার স্বামী। বসন্তরজনীতে কিংশুকের প্রথম উল্লাস-মুহূর্তে
তোমার ব্যাকুল বাহু টেনে নিত, আমাকে নয় অন্য কোন যুবতীকে।
বারে বারে আমাকে সন্তানবতী করেছে পুরুষ, কিন্তু
তারা প্রত্যেকেই আমার আকাঙ্ক্ষিত নয়।

কোন প্রার্থনা নেই আমার : কুরুবৃদ্ধরা বিলাপ করুন
জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, প্রহর গুনুন কোন পুণ্যালয়ে
ধর্মরাজ্য নেমে আসবে মাটিতে ; ভীম, অনুগ্রহ করে স্তব্ধ হও,
নকুল, সহদেব, বিচ্যুত হয়োনা অগ্রজের প্রতি অটল বিশ্বাসে ;
আর অর্জুন, অন্তঃপুরে যাও, সেখানে তোমার জন্য
স্নিগ্ধ শরীর সাজিয়ে রেখেছে তোমার কোন প্রেয়সী।

শোক নয়, লজ্জা নয় ; এই রাজগৃহে দাঁড়িয়ে
আমি জানলাম, প্রেম নয়, শ্রদ্ধা নয়, অধিকার নয়,
নারী শুধু প্রয়োজনের। জানলাম, এখানে কোন
ভেদ নেই ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির, শক্তিমান ভীম, প্রেমিক অর্জুন
আর লোলুপ ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনদের মধ্যে।

প্রতিকার চাইছি না।
যা শুধু বিলাসের, সেই বস্ত্র ছিনিয়ে নেয় যদি
কোন দুঃশাসন—নিক। আমি কাঁদছি না।
চারপাশে ভাসানের ভিড়ায় পশুদের উদ্দাম নাচের ভঙ্গি
আমি দেখছি না।
চারপাশে ক্লীবদের অক্ষম বিলাপ
আমি শুনছি না।

শক্তিবান নেই।
আমি ফিরিয়ে আনছি আমার জন্মের স্মৃতি, যজ্ঞের আগুন।

দ্রৌপদী নই, নই পাঞ্চালী, নই ভরতকুলবধূ,
আমি কৃষ্ণা, যজ্ঞাগ্নি সম্ভূতা, শুধু নারী এক।

বাবুদের বাগানে | অজিত বাইরী

সাধ ক'রে কি যাই, যাই পেটের টানে .
পেট কি কিছুর নিষেধ মানে ?
বাবুদের বাগানে যাই গো দিদি, বাবুদের বাগানে
ছিঁড়ে যদি খায় খাক্ দশলক্ষ শকুনে।

এমনিতে জোটে না যা রক্ত তুলে মুখে,
এইটুকু দেহ দিলে সব মেলে—পেটের ভাত, ঢাকাই পরনে
বাবুদের বাগানে যাই গো দিদি, বাবুদের বাগানে।

কি হবে আমার সতীত্ব আগলে, দেহ
বেচলে যদি পেটের খিদে মেটে ? ললাটে
জুটুক নিন্দে, মুখে পড়ুক চুনকালি,
পেটের আগুন নেভে বাবুদের বাগানে।

চাতালে চাঁদের আলো, কত রাতে অস্ত গেল—
এ-শরীরের স্তন চুষে কামুক ঠোঁটে।
সবাই সাধু হয়ে, স্বামী হয়ে সংসারী ;
আমারই আঁচলে কলঙ্কের দাগ জোটে।

বাবুদের বাগানে যাইগো দিদি, বাবুদের বাগানে
বড়ো তারা মদ পেলে, তারও বেশী পেলে আমাকে।
পেট কি কিছুর নিষেধ মানে ?
সাধ ক'রে কি যাই, যাই ব্যাকুলে পেটের টানে।

খাজনা | অজিত বাইরী

—দলিলে সব লিখা আছে, দেখে দেন গো বাবু
খাজনা মুকুব হবে কিনা!

—কোচড়ে কি এনেছিস? —খুদ নিই না,
তা ব'লে তো এমনি এমনিও হয় না।

—বড় গরীব গো বাবু, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়
তোমরা বাবু লোক, বড় লোক, দেখে দেন গো বাবু,
দেখে দেন
খাজনা মুকুব হবে কিনা?—জলে নামি গো বাবু
কলমি তুলি, গায়ে ছেলে ছুলে ওঠে সাপ—
কোমরে জড়ায় চ্যামনা।

—খুদ নিই না; কিন্তু দিবি, কিছু ভেট তো দিবি।

—ঘরেতে আছে একখানি ঘড়া, ছেঁড়া কাঁথা, আধ ফালি
কাপড়—যা আছে পরনে।
কিছু দিবার নাই গো বাবু।

—তুই, তুই-ই তো আছিস,
মহাজনের মত তোর এই দেহের জমিন—
তাও দিবি না?

পরিশিষ্টে সংযোজিত কবিতার সূচীপত্র

অজিত বাইরী

বাবুদের বাগানে ৩৭৮

বাজনা ৩৭৯

অমিয় চক্রবর্তী

বৃষ্টি ... ২৮২

সংগতি ... ২৮৩

অমিতাভ দাশগুপ্ত

শেষ ঘোড়া ... ৩৫০

আমার নিজস্ব রণনীতি ... ৩৫১

ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছিঃ ... ৩৫৩

ভাসান, ভাসান সারাবেলা ... ৩৫৯

অরুণ মিত্র

বদলটা অন্ধকারে হয় ... ২৭১

অশোকবিজয় রাহা

মায়াতরু ... ২৩৬

কবিতা সিংহ

এই গৃহে অগ্নি এসেছেন ... ৩৩০

ঈশ্বরকে ইভ ... ৩৩১

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

প্রদর্শনী ... ৩২২

অবিকল আমি ... ৩২৪

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

রাজধানী ... ২৭৩

রবীন্দ্র ঠাকুর ... ২৭৫

তারু দাম প্রতিমায় রং দেয় অভিজাত পাল ... ২৭৭

তারাপদ রায়

মনে আছে, কলকাতা ... ৩৫৭
আমার ভুসভুসি ... ৩৫৮

তুষার রায়

দেখে নেবেন ... ৩৬১
আধুনিকতার শেষ ... ৩৬১

দিনেশ দাস

কাস্তে ... ২৭৯
ব্যাঘ্র-দিন ... ২৮০
দোলনা ... ২৮১

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

কাজের লোক ... ২৩৭

নবনীতা দেবসেন

সুন্দরবন ... ৩৫৯

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কলকাতার যীশু ... ৩১৪
অমলকান্তি ... ৩১৫
কলঘরে চিলের কান্না ... ৩১৬
উলঙ্গ রাজা ... ৩১৮

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

এখন রাজা ... ৩৬২
চড়ুইভাতির গল্প ... ৩৬৩

পরমানন্দ সরস্বতী

আলোর গান ... ২৮১
আমার চাই ফুলের আগুন ... ২৮৪

পূর্ণেন্দু পত্রী

কয়েকটি জরুরী ঘোষণা ... ৩৩৪

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হঠাৎ যদি ... ২৬৬

নিরর্থক ... ২৬৮

জীবনানন্দ ... ২৬৯

হারিয়ে ... ২৭০

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

প্রভাতে ... ২৩৪

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জননী জন্মভূমিশ্চ ... ৩০৪

এসো, আমরা প্রেমের গান গাই ... ৩০৫

বেহুলা-নাচানো স্বর্গ ... ৩০৭

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মেঘ বৃষ্টি ঝড় ... ৩০৮

জননী যন্ত্রণা ... ৩১১

বাংলা, হায় বাংলা ... ৩১২

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

প্রভাত ... ২২০

মণীন্দ্র রায়

মুখ দেখি কাঁসের আলোতে ... ২৮৬

নক্সীকাঁথার কাহিনী ... ২৮৮

মণীশ ঘটক

পরমা ... ২৫৮

যুবনাশ্ব না? ... ২৬০

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মেঘনাদবধ কাব্য (অংশ) ... ২২১

বঙ্গভূমির প্রতি ... ২৩৬

আত্ম-বিলাপ ... ২৩৯

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

কাজলা-দিদি ... ২৩০

মাধবিকা ... ২৪৩

অন্ধ বধূ ... ২৪৪

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

কাকাতুয়া ... ২৩০

রাম বসু

পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে ... ৩২০

রুদ্রেন্দু সরকার

আলেকজান্ডার বিক্রী করে দাঁতের মাজন ... ৩৬৪

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

ঈশ্বরী পাটনী ... ২১৮

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ-ভৈরবী ... ৩৩৫

জরাসন্ধ ... ৩৩৬

চতুরঙ্গ ... ৩৩৬

একটি পরমাদ ... ৩৩৭

একা গেলো .. ৩৩৭

শঙ্খ ঘোষ

বলো তারে, 'শান্তি শান্তি' ... ৩২৫

বাবুমশাই ... ৩২৭

যমুনাবতী ... ৩২৮

শান্তনু দাস

শপথ ... ৩৬৫

শান্তি সিংহ

লাল মাটি নীল অরণ্য ... ৩৬৬

সন্তোষকুমার ঘোষ

নিরাকাশ ... ৩০৩

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কোন্ দেশে ২৩১

দূরের পাল্লা ২৪৭

সব্যসাচী দেব

মনে রেখ ... ৩৬৯

চণ্ডালিকা ... ৩৭১

কর্ণ ... ৩৭২

কৃষ্ণা ... ৩৭৫

সুকুমার রায়

আবোল-তাবোল ... ২৩৩

একুশে আইন ... ২৩৪

গোঁফ চুরি ... ২৩৫

কুমড়ো পটাশ ... ২৫৩

ভয় পেয়ো না ... ২৫৪

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

শাশ্বতী ... ২৫৫

উটপাখী ... ২৫৭

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মিছিলের মুখ ... ২৮৯

কেন এল না ... ২৯১

শুধু তারা নয় ... ২৯৩

এখন ভাবনা ... ২৯৫

মেজাজ ... ২৯৬

যেতে যেতে ... ৩০০

হরপ্রসাদ মিত্র

ঝাউয়ের শব্দ ... ২৮৫